প্রিয় প্রেয়সী নারী

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

প্রিয় প্রেয়সী নারী

প্রিয় প্রেয়সী নারী

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

ইসলামী টাওয়ার [দোকান নং ২০]
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল : ০১৯১৩ ৫০৮৭৪৩

প্রিয় প্রেয়সী নারী

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

প্রকাশক : নবপ্রকাশ
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০১৭

প্রচ্ছদ : সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

নবপ্রকাশ
ইসলামী টাওয়ার [দোকান নং ২০]
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল : ০১৯৭৪ ৮৮৮ ৪৪১

মূল্য : ২২০ [দুই শত বিশ] টাকা মাত্র

PRIYO PREYOSHI NARI
by Salahuddin Jahangir

Price : 220.00 BDT US$ 8.00 only
noboprokash.com | noboprokash@gmail.com | fb/noboprokash
e-store: rokomari.com/noboprokash

ISBN 978-984-92655-4-2

উৎসর্গ

আমাতুল্লাহ [নাজনীন আক্তার হ্যাপী]-কে।

একসময়কার আলোচিত মডেল-অভিনেত্রী এ নারী ইসলামের আলোয় নিজেকে বিভাসিত করে যে উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন, এমন উদাহরণ এ সময়কার পৃথিবীতে খুব কম নারীই সৃষ্টি করতে পারেন।

আমাতুল্লাহ'র আগামী জীবন হোক শত-সহস্র মুসলিম নারীর জন্য অত্যুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা।

ভূমিকা

ইসলাম নারীকে কী দিয়েছে? এমন প্রশ্ন বেকার তাদের জন্য, যারা সর্বদা ইসলাম মান্য করে চলতে পছন্দ করেন। তারা কখনো এমন প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টাই করেন না। আর যারা ইসলাম বলতেই বোরকা-হিজাবকে পিঞ্জিরাবদ্ধতা আখ্যায়িত করে, ইসলামমান্য নারীকে খাঁচায় বন্দি পাখি মনে করে, তারাও কখনো ইসলামে নারীকে প্রদত্ত অধিকার-ভালোবাসার কথা শুনতে নারাজ।

কিন্তু কথাগুলো শুনতে হবে, শোনাতে হবে। বিশেষত আধুনিক এই সময়ে, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান যখন মানুষের চারপাশ ঘিরে আছে, আধুনিকতার দোহাই দিয়ে যখন নারীকে নিয়ে আসা হচ্ছে পথের ধুলোয়, তখন নারীকে ইসলাম কী দিয়েছে– এ প্রশ্নের জবাব সবারই জানা থাকা প্রয়োজন।

মনে রাখতে হবে, প্রতিরোধ কখনো প্রতিপক্ষের আক্রমণকে সমূলে উৎপাটন করতে পারে না। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে হলে প্রয়োজন হবে প্রতিঘাতের। তাকে তার দুর্বলতা দিয়ে আঘাত করতে হবে। তার দুর্বল জায়গা চিহ্নিত করে প্রশ্ন করতে হবে– আধুনিকতা নারীকে কী দিয়েছে? বর্তমান এ আধুনিক সভ্যতা নারীকে কতোটা সম্মান দিয়েছে?

এমন প্রশ্নের জবাব দিতে অপারগ বর্তমান পশ্চিমা নারীমুক্তির সভ্যতা। কারণ তারা নারীকে কেবল পণ্যই বানিয়েছে। নারীকে তারা কখনো নারী হিসেবে উপস্থাপন করতে পারেনি। নারীকে একটি সেক্সটয় ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেনি। সভ্যতা আর আধুনিকতার সকল উপকরণ দিয়ে তারা নারীকে তৈরি করেছে কেবল কীভাবে তাকে আরও ভোগ্য করে তোলা যায়, কীভাবে ভোগের জন্য আরও কমনীয় করা যায়। নারীত্বের অমরাবতী বিশেষণে কখনো তাকে ভাবতে পারেনি আধুনিকতার ধ্বজাধারী পশ্চিমা দুনিয়া।

নারী ছোট পোশাক পরে বাইরে বেরুলে সেটাকেই আমরা নারীমুক্তি বলবো? নারী পুরুষের সঙ্গে একই টেবিলে বসে কাজ করলে সেটাকেই আমরা নারী অধিকার বলে প্রসন্ন হবো? নারীকে প্রকাণ্ড প্রসাধন মাখিয়ে দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করলে তবেই কি সে পুরুষের সমান অধিকারী হয়েছে বলে ধরে নেবো?

এ এক অদ্ভুত স্লোগান কাঁধে নিয়ে ঘুরছি আমরা। নারীর নারীত্বের অধিকারের কথা বলে তাকে পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করছি পুরুষের ভোগ্যপণ্য হিসেবে। তাকে পণ্য বানিয়ে তুলে দেয়া হচ্ছে আধুনিক দাসবাজারে। দাসবাজারের নিলামে দরদাম হচ্ছে তার রূপ, শরীর, ত্বকের কমনীয়তা। মিডিয়া, শোবিজ, মডেলিং, পণ্যবাজার, বিউটি ইন্ড্রাস্ট্রি, সোস্যাল নেটওয়ার্ক, প্রতিযোগিতাময় পৃথিবী প্রতিদিন নারীকে ঠেলে দিচ্ছে পুরুষের কামনাতাড়িত চোখের সামনে। আধুনিক পৃথিবীতে এ এক নব্য দাসপ্রথা।

বাস্তবতা কি এর থেকে ভিন্ন? এ গ্রন্থে আমরা এমন সত্য বাস্ত বতাকেই তুলের ধরার চেষ্টা করেছি বারবার। এ গ্রন্থ সমাজের প্রত্যেক নারীকে একজন সত্যিকারের নারী হিসেবে সজ্জিত করার প্রেয়সী প্রয়াস। ইসলামের ঐশ্বরিক নির্দেশনায় নারীকে ভূষিত করা হয়েছে তার কাঙ্ক্ষিত উচ্চাসনে। তাকে দেখানো হয়েছে সত্যিকারের নারী অধিকারের সুরম্য রাজপথ।

এ গ্রন্থ কেবল একমুখী কোনো আলোচনা নয়, বর্তমান পৃথিবী এবং আমাদের সমাজে নারীর প্রতি অবিচার ও অসম্মানের নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে পৃথক পৃথক নিবন্ধে। নারী, তার সমাজ, তার সংসার, তার ব্যক্তিত্ব এবং পুরো পৃথিবীর নারী উৎপীড়নের বহুবিধ অজানা উপাখ্যান উন্মোচন করা হয়েছে দরদি কলমে।

গ্রন্থপাঠে মনোযোগী হতে প্রতিটি অনুচ্ছেদের শুরুতে একেকজন নারীর নাম ধরে সম্বোধন করা হয়েছে। নতুন একটি অনুচ্ছেদে সম্বোধন করা হয়েছে নতুন একজন নারীকে। যাতে করে প্রতিজন নারীই মনে করেন– এ গ্রন্থের প্রতিটি পাঠ তাকে উদ্দেশ্য করেই গ্রন্থিত হয়েছে। নারীকে সম্মান জানানোর এ আমাদের এক ক্ষুদ্র প্রয়াসমাত্র।

সর্বোপরি এ গ্রন্থ কেবল নারীর জন্যই রচনা করা হয়নি, এ গ্রন্থ একজন পুরুষের জন্যও নারীকে নতুন করে আবিষ্কারের এক মহত্তম চাবিকাঠি। একজন পিতা, স্বামী, ভাই কিংবা বন্ধু হিসেবে প্রতিজন পুরুষের উচিত তার কন্যা, স্ত্রী, বোন, বান্ধবীর জাগতিক পৃথিবীকে ঐশী আলোয় আলেকিত করা। তেমনি পরকালীন পৃথিবীতেও তাকে উপহার দেয়া চিরকালীন জান্নাতুল ফেরদাউস। এ দায়িত্ব নারীর চেয়ে পুরুষেরই বেশি। তাই এ গ্রন্থ একজন পুরুষের জন্যও অবশ্যপাঠ্য।

সবশেষে বলবো, আধুনিক এই সময়ে এ গ্রন্থ আধুনিকা নারীদের সমাজ-সংসারের কথা ভেবেই গ্রন্থিত হয়েছে। সভ্যতার সকল অসভ্যতার প্রবল ঘূর্ণিপাকে এ গ্রন্থ প্রতিজন নারীর জন্য সুরক্ষার অভয়াশ্রয় হোক– আল্লাহর কাছে এ প্রার্থনা রইলো!

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

সূচি

[ভূমিকার পর]

প্রিয় প্রেয়সী, তোমাকে

প্রিয় প্রেয়সী–

মনে পড়ে? তুমি যেদিন প্রথম হেসেছিলে, সেদিন আকাশে রঙধনু ছিলো না। তবু কী অপরূপ রঙে রেঙেছিলো ধরণির আকাশ। বিকেলের 'কনে দেখা আলো'র অবয়ব যেনো সেদিন ম্লান হয়ে গিয়েছিলো নিমিষেই। তোমার মনে আছে সেসব কথা? ভুলেই গেছো হয়তো।

প্রিয় লজ্জাবতী–

চলো, কিছুক্ষণ গল্প করি।

আমি তোমাকে কি কখনো ফকির লালন সাঁইয়ের কাহিনি বলেছিলাম? বলিনি হয়তো। তুমি কি জানো, বসন্ত রোগে মৃতপ্রায় লালনকে যে মুসলিম মহিলা মায়ের ভালোবাসায় বুকে টেনে নিয়েছিলেন, সেই মহীয়সী নারীর নাম ছিলো রাবেয়া। লালন সুস্থ হয়ে বৈরাগ্য গ্রহণে ব্রতী হওয়ার পর সেই নারীর সঙ্গে আর কোনোদিন দেখা হয়নি এ জীবনে।

তুমি কি জানো, আকাশের নক্ষত্রেরা তাদের অবস্থান পাল্টায় ঋতুতে ঋতুতে?

তুমি কি জানো, উত্তর মেরু অঞ্চলে ছয় মাস থাকে দিন আর ছয় মাস থাকে রাত?

তুমি কি জানো, অস্ট্রেলিয়ার কোনো এক মরুভূমিতে এক ধরনের পাথর আছে, সেগুলো সময় সময় হেঁটে বেড়ায়। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায়।

তুমি কি জানো...।

আমার ইচ্ছে হয়, আমি সব বলি তোমার কাছে। পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞানের গুপ্তধন মেলে ধরি তোমার অবাক চোখের ঝিলিক দিয়ে ওঠা তারার ভেতর। কী আগ্রহ ভরেই না তুমি শোনো সেইসব কথা। আমি অবাক হয়ে তোমার আগ্রহভরা চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি। কী গভীর কালো টলটলে জলের মতো চোখের ভাষা তোমার। আমি পড়ি আর জ্ঞানী হই।

তুমি কোনোদিন জানতেও পারবে না, তুমি ঘুমিয়ে গেলে আমি তোমার ঘুমন্ত মুখের দিকে ধ্যানী সন্ন্যাসীর মতো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। মনে হয়, দু'হাতের আঁজলা ভরে তোমার মুখ তুলে ধরে স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করা যায়। মনে হয়, এর চেয়ে বিশুদ্ধ প্রার্থনা এই জীবনে আর করিনি আমি।

প্রিয় তিলোত্তমা–

তুমি কি জানো, তিলোত্তমা শব্দের অর্থ কী? সত্যি বলতে আমিও জানি না। তবুও কেন যেনো তোমাকে তিলোত্তমা নামে ডাকতে ভালো লাগে। কেন? কারণ তোমার ঠোঁটের পশ্চিম কোণে একটা কালো তিল সগর্বে ঘোষণা করছে তোমার নামের মহিমা। আমি কতো অকারণে তোমার ঠোঁটের সেই একাকী তিলটা ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছি, তুমি দাওনি। বলেছো, কালো জিনিসের আবার কিসের এতো কদর?

প্রিয় মনমোহিনী–

তুমি কি জানো, একটা কালো মেয়েকে দেখে রবি ঠাকুর কী লিখেছিলেন?

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক
মেঘলা দিনে দেখেছিলেম মাঠে, কালো মেঘের কালো হরিণ-চোখ।
ঘোমটা মাথায় ছিল না তার মোটে, মুক্তবেণী পিঠের 'পরে লোটে
কালো? তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

দেখেছো, রবীন্দ্রনাথের কালোবন্দনা? আর তুমি কিনা বলো, কালো জিনিসের কদর কী?

প্রিয়তমেষু–

তোমার কি পারস্যের কবি হাফিজের ওই ঘটনাটা জানা আছে? সিরাজনগরের এক তরুণীর গালের কালো তিলের জন্য তিনি বিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন বোখারা-সমরকন্দ নগরী। তিনি লিখেছিলেন–

'আগার আঁ তুর্কে শিরাজি, বাদাশ্‌ত আরাদ দিলে মারা
বখালে হিন্দুয়েশ বখশাম সমরকন্দ অ বুখারা রা'

'সেই শিরাজি তরুণী নিতো যদি মোর এ দিল-হিয়ারে
তার গালের এক তিলেই বিকিয়ে দিতাম সমরকন্দ ও বুখারারে'

তৈমুর লঙ তখন সমরকন্দের বাদশাহ। তিনি ডেকে পাঠালেন হাফিজকে। রেগে গিয়ে কবিকে বললেন, 'তুমি কেমন মানুষ বলো তো? লক্ষ-হাজার দিনার খরচ করে আমার গড়া দুটো শহরকে তুমি এক শিরাজি তরুণীর তুচ্ছ তিলের বিনিময়ে বিলিয়ে দিতে চাও?'

হাফিজ হেসে বলেছিলেন, 'জাহাঁপনা! এরকম অপচয়কারী বলেই তো আজ আমার এই দুরবস্থা।'

বাদশাহ্ তার জবাবে খুশি হয়ে বেশ কিছু উপঢৌকন দিয়ে দিয়েছিলেন।

কালোর সৌন্দর্য নিয়ে সেই গানটা শুনেছো কখনো?

ভালো লাগে কালো চোখ
কালো চুল কালো তিল,
কালো মেঘের আড়ে হাসে রঙধনু ঝিলমিল
কালো কয়লার মাঝে হীরের টুকরো থাকে
খুঁজে পেতে লাগে গো সময় ॥

এই দেখো, তোমার এক কালো তিল নিয়েই কতো কথা বলে ফেললাম। তোমাকে নিয়ে যখন ভাবতে বসি, তখন এমনই হয়। কী যে হয়েছে আমার!

প্রিয়মুখ–

যখন একা ছিলাম তখন ভাবতাম, কে আসবে এ জীবনে? কেমন হবে সে? কী কথা বলবো তার সঙ্গে? আজ যখন তুমি পাশে ঘুমিয়ে থাকো, নিপাট নির্ভরতায় আমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকো, তখন অনেক কিছুই বলতে ইচ্ছে করে তোমাকে। কিন্তু পারি না। পাওয়ার আনন্দ কি মানুষকে এভাবেই বাকরুদ্ধ করে দেয়?

দারুণ ভূতের ভয় তোমার। ভূতের কথা বললেই তুমি শিউরে ওঠো। আমি তাই অনেক সময় ইচ্ছে করেই তোমাকে ভূতের গল্প শোনাতে যাই। তুমি কান চেপে ধরে বালিশে মুখ লুকাও।

রাতে অনেক সময় তুমি স্বপ্নে হাবিজাবি দেখো। তোমার চোখের পাতা কাঁপতে থাকে। আমি আলতো করে তোমার মাথায় হাত রাখি। তুমি ঘুমের

মধ্যেই পোষা বিড়ালের মতো গুটিসুটি মেরে আমার বুকে এসে আশ্রয় নাও। বিপুল নির্ভরতায় আবার ঘুমিয়ে পড়ো। আমি তোমাকে জড়িয়ে ধরে অভয়াশ্রয়ের অহংকার অনুভব করি। এর নামই কি ভালোবাসার নির্ভরতা? সমর্পিত প্রেমের নির্ভয়তা? হয়তো-বা, আমি জানি না।

প্রিয় কবিতা–

মানুষের জীবনে বেদনা আসে। বেদনা আসে বলেই মানুষ সুখের জন্য এতো লালায়িত। কবিরা কী বলে, জানো? দুঃখই নাকি তাদের কবিতার কাঁচামাল। দুঃখ ছাড়া নাকি কবিতা লেখা যায় না। এজন্যই নাকি তারা ইচ্ছে করে দুঃখ পায়, বেদনা সয়। কী অবাক কাণ্ড!

সামান্য কবিতার জন্য আমি আমার জীবনের সুখ বিকিয়ে দেবো কেন? জীবনের অনন্ত সুখের জন্য কেন অযথাই দুঃখ-বেদনা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জীবন রক্তাক্ত করবো? আমাদের জীবনের যতোটুকু সুখ আছে ততোটুকু সুখ দিয়েই পার করে দেয়া যায় একেকটা দীর্ঘ জীবন। যতোটুকু কষ্ট আছে সেগুলোকে খুব সহজেই বিদীর্ণ করা যায় ভালোবাসার প্রবল করাঘাতে।

যদি তুমি থাকো পাশে। তুমি পাশে আছো বলেই প্রতিটি দীর্ঘ প্রতীক্ষাকে লঙ্ঘন করে কেবল তোমার কাছেই ফিরে আসি। বারবার লাব্বাইক বলি জীবনের অনন্ত সরোবরের কাছে।

তুমি না থাকলে কে আর কড়া নাড়বে বলো, সুখের দরোজায়?

প্রিয় নয়নতারা–

আজ তোমাকে আমি শোনাবো সেইসব কথা, সেইসব দুঃখ-যাতনা, সেইসব লব্ধ অভিজ্ঞতা, যা বছরের পর বছর ধরে আমি সযতনে তোমার জন্য মনের অন্দরমহলে তুলে রেখেছি। যে কথার প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি অক্ষরে মিশে আছে হৃদয়ের গুচ্ছ গুচ্ছ ভালোবাসা। অন্তরের দরদ দিয়ে লিখছি প্রতিটি পঙ্‌ক্তি।

যা লিখেছি, আমি বলছি না এ সূচিবদ্ধ গ্রন্থের প্রতিটি কথা তোমার জন্য মসিহা। এ গ্রন্থের সব বিষয়ের সঙ্গে তোমার মতের মিল হবে, আমার সকল মতকে তুমি বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেবে, এমন ধারণাও আমি করি না। তবে এ গ্রন্থের প্রতিটি শব্দই তোমাকে চিন্তার নতুন এক দিগন্তের সন্ধান দেবে। তোমাকে জানাবে তোমার অধিকার ও ভালোবাসার গণ্ডি, তোমার সুরক্ষা ও

নিরাপত্তার সহজ-সরল পথ, তোমাকে জানাবে তোমার অপরিমেয় সম্মান ও অপরাজিতা শ্রদ্ধার কথা, যা তুমি কোনোদিন শুনতে পাওনি কোথাও।

কারণ, এ গ্রন্থের প্রতিটি লফজ তোমাকে ভালোবেসে লেখা।

প্রিয় ঈশিতা–

কেন আমি তোমাকে লিখতে যাচ্ছি এসব কথা, জানো? সময়ের কালক্রম বড় অদ্ভুত এবং ভয়ঙ্কর। এক ভয়াবহ অনিষ্ট সময়ের ভেতর দিয়ে আমরা পার করছি আমাদের যাপিত জীবন। এই নষ্ট সময়ের বাঁকে বাঁকে ওত পেতে আছে স্খলন আর ধ্বংসের মহামারি। যদি তুমি একবার ভুল পদক্ষেপ ফেলো, তলিয়ে যাবে অন্ধকারের অতল অমানিশায়।

আজ বড় বেদনা নিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকাই, যেদিকেই তাকাই দেখতে পাই কেবল মানুষের স্খলনের মানচিত্র। মানুষের ভেতরকার সকল মানুষের যেনো মৃত্যু হয়েছে। মানুষের মুখের আদলে দেখা মানুষের অবয়বে দেখি মুখোশপরা অমানুষের প্রতিচ্ছবি। একজন সত্যিকারের মানুষ খুঁজে পাওয়া আজ এক টুকরো পরশপাথর খোঁজার চেয়েও দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। এই ক্লান্ত সময়ে তাই তোমাকে সুরক্ষার জন্য বুক পেতে দাঁড়িয়ে গেলাম।

প্রিয় ইভা–

যতোক্ষণ এ দেহে প্রাণ আছে, হৃদয়ে আছে ভালোবাসার সিম্ফনি, যতোক্ষণ সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলার শক্তি আছে– ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমার সুরক্ষার সকল আয়োজন করে যাবো নিরলসভাবে। সময় কিংবা দুঃসময়ের একটা বিন্দু পর্যন্ত তোমাকে ছুঁতে দেবো না। কালের সকল ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে তোমাকে রাখবো নিরাপদ, নিঃশঙ্ক। এ আমার ওয়াদা।

এ ওয়াদা কেবল আমার নয়, এ ওয়াদা সেই সকল নওজোয়ান মুসলিমের, যারা একদিন আরবের মরু বালিয়াড়িতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো ইনসানিয়্যাতের সুরম্য প্রাসাদ। যে প্রাসাদে নারীকে বসানো হয়েছিলো ভালোবাসার সর্বোচ্চ সিংহাসনে। এ ওয়াদা সেই বীরদের, যারা একদিন দামেস্ক থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে সিন্ধু চলে এসেছিলো শুধু একজন মুসলিম মেয়ের আর্তনাদ শুনে। এ ওয়াদা সেই সমস্ত আত্মত্যাগে মাতোয়ারা হৃদয়ের, যারা তাদের মা-বোনদের ইজ্জত-আব্রুর হেফাজতের জন্য ইসলামের বিজয় নিশানকে বানিয়েছিলো তাদের বোরকার হিজাব।

প্রিয় আফরোজা–

আজ এসব কথাই তোমাকে বলবো। হয়তো বিরক্ত হবে, হয়তো অনেক কথায় রেগে উঠবে, অনেক কথা মেনে নিতে অস্বীকার করবে; আবার অনেক কথা শুনে তোমার চোখ ভরে যাবে ভালোবাসার অশ্রুজলে। এবং কথাগুলো তোমাকে শুনতে হবে।

প্রিয় রাবেয়া–

আর কোনো কথা নয়, এবার তোমাকে নিয়ে যাবো সরাসরি এ বইয়ের মূল রচনায়। পড়ো, পড়তে থাকো। ইকরা বিইসমি রাব্বিকা...!

আমি অপেক্ষায় রইলাম, পড়ে আমাকে জানাবে তোমার পাঠ প্রতিক্রিয়া। একজন নারী হিসেবে তোমার পাঠ প্রতিক্রিয়া আমার কাছে অসম্ভব মূল্যবান। একজন পুরুষ আর যা-ই হোক, একজন নারীর মনোজাগতিক বিষয়ের অনেক কিছুই জানতে পারে না। তোমার পাঠ প্রতিক্রিয়া আমাকে কিছুটা হলেও সে বিষয়ে জ্ঞাত করবে।

আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে তাঁর রহমতের চাদর দিয়ে ঢেকে নিন।

প্রিয় প্রেয়সী নারী

নারী, তোমায় দিলাম

প্রিয় আয়েশা–

নারী অধিকার বা নারী স্বাধীনতা নিয়ে অনেকেই তো অনেক কথা বলে থাকে। আজ ইচ্ছে হলো বিষয়টি নিয়ে তোমার সঙ্গে খানিকটা আলাপ করি। জানি না বিষয়টি তুমি কতোটা বুঝবে, তবে চেষ্টা করবো খুব সহজভাবে সহজ করে আলাপ করার। যদিও বাঙালি মেয়েরা এসব ভারিক্কি কথাবার্তা খুব একটা আমলে নেয় না, তবু কথাগুলো তোমার শোনা দরকার। শপথ করে বলছি, আমি খুব সহজ করে বলবো। বিরক্ত হবে না, এমন আশ্বাস দিচ্ছি। তুমি তো জানোই, গল্প বলতে আমার জুড়ি নেই।

ধরো, আমি শহর কিংবা গ্রামে, চলতি পথে, হাট-বাজারে যেখানেই থাকি– চেষ্টা করি সমাজের নারীদের অবস্থানটাকে একটু পরখ করতে। আমাদের শিক্ষিত সমাজে নারীমুক্তি, নারী স্বাধীনতা, নারী অধিকার নিয়ে যেসব আপ্তবাক্য দেদার ব্যবহৃত হয়, আমি সেগুলোকে সমাজের প্রেক্ষাপটে মেলাতে চেষ্টা করি। দুটোর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা চালাই। আমি এমনকি আমার পরিবারেও বিষয়টা খেয়াল করি। আমার মা, বোন, স্ত্রীর কার্যকলাপ, পরিবারে তাদের গুরুত্ব বা মর্যাদা কীভাবে নিরূপণ হচ্ছে, তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে কতোটা সচেতন, আমাদের সমাজ কীভাবে তাদের গ্রহণ করছে কিংবা একটি মেয়েই বা সমাজের সঙ্গে কীভাবে নিজেকে সামগ্রিকভাবে উপস্থাপন

করছে– এগুলো অন্য দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করি। নিরীক্ষাধর্মী নিরীক্ষণ বলা যায়।

একেক ক্ষেত্রে আমার নিরীক্ষণ একেক রকম। একটা মিশ্র ফলাফল বলতে পারো। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিবারে নারীদের অধিকার অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুসংহত। আবার অনেক ক্ষেত্রেই তাদের জন্য যতোটুকু অধিকার প্রয়োজন, আমার মনে হয় তারা সে অধিকারটুকু পাচ্ছে না বা পরিবার থেকে দেয়া হচ্ছে না। এখানে সামাজিক অনুশাসন, কালক্রমের প্রথা-কুসংস্কারসহ নানা ধরনের বিষয় কাজ করে।

প্রিয় তামান্না–

তোমাকে আমার দাদির কথাই বলতে পারি। ছোটবেলায় আমাদের যৌথ পরিবারে চাচাতো ভাইবোনেরা একসঙ্গে খেতে বসতাম। আমাদের ছিলো বিশাল পরিবার। সব মিলিয়ে প্রায় বাইশ-তেইশ সদস্যের ঢাউস আকারের সংসার। দাদা-দাদি, বাবারা পাঁচ ভাই ও মা-চাচিরা পাঁচজন এবং আমরা চাচাতো ভাইবোন ছিলাম গোটা দশ-বারো। তাছাড়া খেতের কাজ করার জন্য দু-একজন রাখাল থাকতো সবসময় বাড়িতে। তো, এই নিয়ে ছিলো আমাদের একান্নবর্তী পরিবার।

আচ্ছা, যে কথাটা তোমাকে বলতে চাচ্ছি। আমরা চাচাতো ভাইবোনেরা যখন খেতে বসতাম, তখন খাওয়ার সময় বোনদেরকে কখনো ভাতের পাতিলের প্রথম ভাত দেয়া হতো না। প্রথম এক থালা ভাত যেকোনো চাচা বা চাচাতো ভাইকে দেয়া হতো। বাড়ির যেকোনো পুরুষমানুষকে পাতিলের প্রথম ভাত দেয়া নাকি একধরনের সংস্কার। এই প্রথম ভাতকে আঞ্চলিক ভাষায় 'আগভাত' বলা হয়। এই আগভাত কোনো মেয়ের পাতে দিলে সংসারে 'অমঙ্গল' হয়! ওই মেয়েও নাকি লক্ষ্মীছাড়া হয়ে যায়।

আমাদের পরিবারে এই সংস্কার চলেছে দাদির রাজত্ব থাকাকালীন। বাইশ-তেইশ সদস্যের একান্নবর্তী পরিবারে যতোদিন দাদি সংসারের কর্ত্রী ছিলেন, ততোদিন এর ব্যত্যয় হয়নি।

দাদি বৃদ্ধ হওয়ার পর অবশ্য এই নিয়ম আর থাকেনি। বোনরা এখন চুলার পাড় থেকেই 'আগভাত' খেয়ে নেয়। কেউ তাদের মানাও করে না, তারাই বা কার কথা মানবে এখন! সবাই শিক্ষিত-সচেতন, কোনটা সংস্কার আর কোনটা কুসংস্কার, তা তারা বেশ ভালোই বোঝে।

প্রিয় সাদিয়া–

বুঝতেই পারছো, দাদির এই কার্যকলাপটা কিন্তু একধরনের নারী নির্যাতনের মধ্যে পড়তো। এটা পরিবারে মেয়েদের প্রতি একধরনের মানসিক নির্যাতন। ছোট থেকেই তার মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া হয় যে– তুমি আর তোমার ভাইটি মর্যাদায় সমান নও। তোমার চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে তোমার ভাইয়ের অধিকার অগ্রগণ্য। হোক সে তোমার ছোট কিংবা বড়।

যদিও এটা একটা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়, তবুও আমার ধারণা, এ ধরনের আরও নানা কুসংস্কার বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলেই প্রসিদ্ধ। কিন্তু আশার বিষয় হচ্ছে, এই রেওয়াজ আর সংস্কার কিন্তু এখন আর আমাদের সমাজে ততোটা শক্তিশালী নয়। ধর্মের নামে অধর্ম এবং সংস্কারের নামে কুসংস্কার আমাদের সমাজ থেকে অনেকটাই ক্ষয়ে গেছে আমাদের ধর্ম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান এবং সঠিক আধুনিক শিক্ষার ফলে।

প্রিয় সাফফানা–

এবার চলো তোমাকে সমাজের অন্যান্য আরও কিছু চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার কথা শোনাই, তাহলেই তুমি বুঝতে পারবে আমাদের সমাজে নারীকে কীভাবে সম্মান করা হয় এবং অনেক ভদ্রসমাজে কীভাবে নারীকে অমর্যাদার জাঁতাকলে পিষ্ট করা হয়।

এ কথা কিন্তু আমি-তুমি কেউই অস্বীকার করতে পারবো না যে– আমাদের সমাজের কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীর প্রতি এ ধরনের কুসংস্কারমূলক বৈষম্য এবং অনাচার শেষ হলেও অনেক ক্ষেত্রে এখনো নারীর ইসলামসম্মত যে অধিকার, তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যেমন নারী নির্যাতনের ব্যাপারটি। আমাদের সমাজে যে নারী নির্যাতন হয় না, এটা

বলা যাবে না। শিক্ষিত কিংবা ধার্মিক সমাজে যতোটা হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি হয় অশিক্ষিত ও অধার্মিক পরিবারে।

শিক্ষিত পরিবারের সরেজমিন করার আগে ধার্মিক পরিবারে নারীর প্রতি সহমর্মিতার কিছুটা প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা যাক। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলি, আমি যখন গ্রামের একটি হেফজখানায় পড়তাম তখন প্রতিদিন দেখতাম, আমাদের মাদরাসার বড়হুজুর তার বাসার একগাদা কাপড় এনে পুকুরে ধুতে বসতেন, ছাত্রদের সামনেই। এ নিয়ে তাকে কোনোদিন সংকোচ বা লজ্জায় পড়তে দেখিনি। কখনো আমরা স্বপ্রণোদিত হয়ে হুজুরের বাড়ির অন্দরমহলের কাপড় ধুয়ে দিতাম। তবে প্রায়দিন তিনি নিজেই করতেন ধোয়ার কাজটা।

এ দৃশ্য আমি কেবল একজন হুজুরের বেলায় দেখিনি, অনেক হুজুরের বেলায়ই এটা সত্য। আমার এ কথার সঙ্গে নিশ্চয় তুমি দ্বিমত করবে না!

প্রিয় নাবিলা–

বিষয়টি তুমি জানো কি না জানি না, তবে আমাদের এলাকায় কিন্তু এ কথা বেশ প্রসিদ্ধ যে, মওলানারা বউদের একটু বেশিই ভালোবাসে! সত্য-মিথ্যার হাকিকত তো আল্লাহ মালুম, তবে মেয়ে পাত্রস্থ করার ব্যাপারে অনেক পরিবারই 'মওলানা' পাত্রকে অগ্রাধিকার দেয় বলে শুনেছি। এ ব্যাপারে আমার চেয়ে তুমিই হয়তো ভালো বলতে পারবে।

প্রিয় আফরিন–

আবারও আমার ঘরের কথা বলি তোমাকে। অনেক আগেই আমি আমার আব্বাকে বলেছি, ঘরে যখন ঢুকবেন তখন অবশ্যই ঘরওয়ালিকে সালাম দিয়ে ঢুকবেন। এতে উভয়ের মধ্যে 'মহব্বত' বাড়বে। আমার আব্বা কিন্তু এখন সবসময় ঘরে সালাম দিয়ে ঢোকেন।

এখানে একটা বিষয় খেয়াল করো– সালাম আমরা কাকে দিই? আমাদের চেয়ে বয়সে বড়, সম্মানে বড়, পদে বড়, মর্যাদায় যে বড় তাকেই আমরা সালাম দিই। এখন একজন স্বামী যখন তার স্ত্রীকে ঘরে

ঢোকার আগে সালাম দিলো, এটা তো নারীকে সম্মানই করা হলো, তাই না? কাজটা হয়তো অত্যন্ত ক্ষুদ্র কিন্তু এখানে যে সম্মানটা দেয়া হলো, সেটা কিন্তু ক্ষুদ্র নয়। নারীকে সম্মান করেই তাকে সালাম জানানো হচ্ছে।

আমার আব্বা আলেম নন, সাধারণ ইসলামমান্য একজন নামাজগুজার ব্যক্তি। গৃহকর্তার সাধারণ গেরস্থালি কাজ করার পাশাপাশি তিনিও সুযোগ পেলে আমার মায়ের তরকারি কুটে দেন, টিউবওয়েল থেকে পানি এনে দেন, মশারি টাঙিয়ে দেন, পড়ে থাকলে কাপড়টাও ধুয়ে দেন। এতে আব্বার কিন্তু মোটেও সম্মানহানি হচ্ছে না। বরং তিনি যে আমার মায়ের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি পূর্ণ সজাগ, সে বিষয়টিই প্রমাণ করছেন। এটা কি নারী অধিকারের মধ্যে পড়ে না? নাকি নারীকে গার্মেন্টসে কাজে পাঠালেই তার অধিকার সদর্পে আগুয়ান হয়?

প্রিয় রাফিয়া–

বিষয়টি তুমি একটু খেয়াল করে দেখো– এই যে খুব সামান্য সম্মান দিয়ে নারীর মর্যাদা ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হলো আমাদের সমাজে, এগুলো হয়তো রাজপথে নারী অধিকারের উত্তপ্ত দাবি-দাওয়ার আওতায় পড়ে না, কিন্তু একটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আমরা নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর সমঅধিকার, নারীর স্বাধীনতা দিয়ে নারীকে অনেক কিছু বানিয়ে ফেললাম, কিন্তু তার ঘরে যদি এমন সহমর্মিতার পরিবেশ না থাকে, একটু সহানুভূতির পরশ না থাকে, তাহলে ওই ক্ষমতায়ন আর সমঅধিকার দিয়ে নারী কী করবে? তাকে তো দিন শেষে কোনো একজন স্বামীর সঙ্গেই থাকতে হবে। স্বামীহীন ক্ষমতায়ন বা স্বাধীনতা যদি কেউ চায়, তবে সেটা আসলে নারীমুক্তি নাকি অন্য কিছুর স্বাধীনতা, সেটাও আমাদের বুঝতে হবে।

প্রিয় নাতাশা–

আমাদের সুশীল সমাজের দিকে তাকাও, দেখবে– আজকে যেসব শিক্ষিত পুরুষ, সমাজের আধুনিক প্রগতিবাদী পুরুষ নারীর ক্ষমতায়নের

কথা বলছেন, তাদের ঘরে খোঁজ নিলে হয়তো দেখা যাবে তার বউটি গত এক মাসে তার মুখ থেকে ভালোবাসার একটি কথাও শুনতে পায়নি। তাকে আহ্লাদিত করার মতো ভালোবাসাই সে দিতে পারেনি। যে সময়টাতে সে তার স্বামীকে কাছে পেতে চেয়েছে, সে সময়টাতে স্বামী বন্ধুর রাত্রিকালীন পার্টি, নারীমুক্তির সভা-সমাবেশ, অফিশিয়াল কাজে ঘর থেকে বাইরে সময় যাপন করেছে। ঘরে নিজের একান্ত নারীকে সম্মান দেয়ার, ভালোবাসার সময়ই তার হয়নি। তাহলে নারীকে আপনি কোথায় সমঅধিকার দিলেন?

একজন স্ত্রী নিপুণ হাতে সারাটা দিন আপনার সংসার গুছিয়ে রাখছে, আপনার সন্তান লালনপালনে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হচ্ছে, আপনার মা-বাবার দেখভাল করছে, রান্নাবান্নার আয়োজন করছে; আপনি তাকে কিন্তু ভালোবাসতে পারছেন না। আপনি সমঅধিকার ফলাচ্ছেন রাজপথে, সভা-সেমিনারে। তাহলে লাভটা কী হলো?

শুধু পুরুষ প্রগতির কথাই বলছি কেন, এমন উদাহরণ দেয়া যাবে অনেক নারীনেত্রীর বেলায়ও, যারা নারীবাদী আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। পত্রিকায় নারী নির্যাতন, নারী অধিকার বিষয়ে প্রায়দিনই তাদের আলোচনা, বক্তব্য, বিবৃতি প্রকাশিত হয়। কেউ যদি একবার তাদের ঘরের খবর নিতে পারেন তাহলে দেখবেন– ছেলে হয়তো ড্রাগ অ্যাডিক্টেড, মেয়ে বহুপুরুষে আসক্ত, স্বামী প্রায় রাতেই ঘরে ফেরে না এবং বাড়িতে তার কাজের মেয়ে প্রতিদিনই নানাভাবে নির্যাতিত হয়। পত্রিকায় বেশ কয়েকবারই এমন খবর বেরিয়েছে।

প্রিয় ফারহানা–

একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে তাকালে এখানে আরেকটি বিষয় খুব সহজেই তোমার চোখে পড়বে। তুমি ভালোভাবেই বুঝতে পারবে– নারীর অধিকার দেয়ার জন্য আসলে লাখ টাকা খরচ করে সভা-সেমিনার, কোটি টাকার এনজিও, শত কোটি টাকার সরকারি বরাদ্দের তেমন একটা প্রয়োজন নেই। মসজিদের ইমাম সাহেব যদি একদিন জুমার খুতবায় বলে দেন– আজ থেকে সবাই ঘরে ঢোকার সময় স্ত্রীকে সালাম দিয়ে ঘরে ঢুকবেন; আমার মনে হয় লাখ টাকার শেরাটনীয় সেমিনারের

চেয়ে তা অনেক বেশি কার্যকর হবে। একবার যদি সবাইকে বুঝিয়ে দেন স্ত্রীর সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলার ফজিলত, তাকে দশ টাকার কাচের চুড়ি কিনে দেয়ার মাহাত্ম্য– এতে প্রতি পরিবারে সামাজিক সহমর্মিতার যে সৌধ গড়ে উঠবে, তারপর আর সরকারি-বেসরকারিভাবে সভা-সেমিনার, উন্নয়ন প্রকল্প, এনজিও, ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার শ্রাদ্ধ করার কোনো মানে হয় না। ইমাম সাহেবের সামান্য উপদেশেই আমাদের সমাজের প্রতিটি পরিবারে গড়ে উঠতে পারে দাম্পত্য ভালোবাসার অনির্বাণ প্রেমময় পরিবেশ।

প্রিয় পারুল–

এ ব্যাপারে তোমাকে আমার নিজের একটা মজার অভিজ্ঞতার কথা বলি। একবার আমি আমাদের গ্রামের মসজিদে জুমার খুতবায় স্ত্রীকে আগে সালাম দেয়ার ব্যাপারে কিছু কথা বলেছিলাম। গ্রামের মসজিদে সবাই দাদা-চাচা কিংবা ভাই-বেরাদর, কিছুটা সংকোচ ছিলো। তবুও বয়ানে স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রতি সহানুভূতি বৃদ্ধির জন্য সালামের গুরুত্ব খোলাখুলিভাবেই আলোচনা করলাম।

নামাজের পর আমি বাড়ি এসে চাচির সঙ্গে কথা বলছিলাম। এমন সময় চাচা এসে বেশ শব্দ করে চাচিকে আসসালামু আলায়কুম বললেন। চাচি কিছুটা অপ্রস্তুত, কিছুটা অবাক! আমি চাচিকে মসজিদে বয়ান করা 'সালামে'র প্রেক্ষাপট বললাম। চাচি শুনে চাচার দিকে তাকিয়ে মুখ ভেংচিয়ে বললেন– ইশ্, এই বয়সে আবার নকশা!

আমি বুঝলাম, এই মুখ ভেংচানোর আড়ালে চাচি কতোটা খুশি লুকিয়ে রেখেছেন। সে খুশি সবার সামনে বলতে নেই, প্রকাশ করতে নেই। হাসির অন্তরালে বুঝে নিতে হয়। তুমি কি বুঝতে পারছো আমি কী বলতে চেয়েছি?

প্রিয় তাবাসসুম–

এবার তুমি একটু চিন্তা করে দেখো– তসলিমা নাসরিন নামের একজন নারীলেখক যদি বলেন, নারীর কোনো ঘর নেই, তাহলে আমরা

চিন্তা করে হয়রান হই। আরে, তাই তো! একজন নারী বাল্যকালে তার বাবার কাছে থাকে, যৌবনে স্বামীর ঘরে, বয়স হলে সন্তানের বাড়িতে। তাহলে তার নিজের ঘর কোনটা?

তুমি হয়তো ভাবছো, বাস্তবিকই তো এটা একটা চিন্তার বিষয় বটে! তোমাকে আশ্বস্ত করার জন্য বলছি– তসলিমা ম্যাডাম কি একবারও ভেবেছেন কেন নারীকে সবসময় এতো আদরে প্রতিপালন করতে হয়? এখানে সমস্যাটা সমাজব্যবস্থার নয়, সমস্যাটা প্রাকৃতিক। প্রকৃতি নারীকে শারীরিকভাবে দৃষ্টি আকর্ষক একটি অবয়ব দিয়েছে। হরিণের শত্রু যেমন তার রূপময় বহিরাবরণ, তার শরীরের মৃগয়াচর্ম, তেমনি নারীর শত্রু তার শারীরিক আকর্ষণীয় অবয়ব। এটা ভদ্রতার মুখোশ পরে কিংবা অতি আধুনিক হয়ে অগ্রাহ্য করার মতো বোকা কথা আমরা বলতে পারবো না। আপনি সাইনবোর্ড-প্ল্যাকার্ডে যতোই লিখুন না কেন– 'আমাকে বলো না কাপড় সামলাতে, পুরুষকে বলো তার দৃষ্টি সংযত করতে' এতে কাজ হবে না, ম্যাডাম। আদমের পুত্রদ্বয় হাবিল-কাবিল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত হয়নি। ভবিষ্যতে মানুষ যদি মহাকাশের স্পেসশিপেও বসবাস শুরু করে তখনো হবে না; এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন।

সুতরাং যার বহিরাবরণ, শারীরিক গঠন, প্রকাশের ভঙ্গিমা তার শত্রু, তাকে তো তার বহিরাবরণ কিছুটা লুকিয়েই রাখতে হয়। নইলে হায়েনার আক্রমণ হবে। আর আক্রমণ হলে তাকে কে বাঁচাবে? তার পরিবার, তার নিকটজন বাবা-স্বামী-ছেলে। এটা অবরোধবাসিনী হওয়া নয়, নারীর নিরাপত্তার সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য নিরাপদ বলয়। এটা ঐতিহাসিকভাবে এবং প্রাকৃতিকভাবেই সুসংহত।

প্রিয় সুমাইয়া–

শুধু এ কারণেই পুরুষকে পরিবারের প্রধান হতে হয়েছে এবং নারীকে করা হয়েছে তার সহধর্মিণী। পুরুষকে পরিবারের প্রধান হতে হয়েছে সঙ্গত কারণেই। যিনি শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হবেন, তিনিই পরিবার কিংবা সমাজের প্রধান হবেন, এটা একটি

প্রাকৃতিক বিষয়। পশু-পাখির দিকে খেয়াল করে দেখো– সিংহের যে পাল থাকে, সেখানে কিন্তু পালের প্রধান থাকে একটি সিংহ, সিংহী নয়। একই ছবি দেখবে বাঘ, মহিষ, হাতি, বানর, পাখি– সব পশু-পাখির পালের বেলায়ই। পালের প্রধানের দায়িত্ব সাধারণত একজন পুরুষের ওপরই থাকে। তাহলে প্রাকৃতিক বিষয়টি নিয়ে প্রকৃতি যে সাধারণ নিয়ম করে দিয়েছে, আমরা যদি আধুনিকতার দোহাই দিয়ে সেই নিয়মের ব্যত্যয় করি, তবে তো প্রাকৃতিক বিপর্যয় অনিবার্য। যেমন বিপর্যয় শুরু হয়েছে পশ্চিমে।

প্রিয় মৌমিতা–

পশ্চিমা দেশগুলোর এমন বিপর্যস্ততা শুনলে তুমি অবাক হবে এবং তাদের জন্য একপ্রকার করুণাই অনুভব করবে বৈকি। পাশ্চাত্যের তরুণ-তরুণীরা নিজেদের নিয়ে এতোটাই ব্যস্ত যে, তারা সন্তান জন্মদানের মতো স্বর্গসুখসম কাজটিও করতে আগ্রহী নয়। সন্তান জন্মদানে অনিচ্ছুক লিভিং টুগেদার তরুণ-তরুণী, গে আর লেসবিয়ান সমস্যায় তারা এতোটাই বিপর্যস্ত যে, সন্তান জন্মদানের জন্য অনেক দেশে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

কিন্তু তুমি নিজেই বিচার করো– তাদের সন্তান হবে কীভাবে? তারা তো সেই সিস্টেমের দিকেই যাচ্ছে না। ভোগবাদ ও বস্তুবাদ তাদের সাধারণ বিচারবুদ্ধিকেও ধ্বংস করে দিয়েছে, তাদের মানবিক ভালোবাসার ক্ষমতাকেও নষ্ট করে দিয়েছে। তাদের কাছে শুধু শারীরিক চাহিদাটাই মুখ্য, কোনো ধরনের বিয়ে বা দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কের ব্যাপারে তারা আগ্রহী নয়। যার সঙ্গে ভালো লাগে তার সঙ্গে কিছুদিন এক ছাদের নিচে থাকছে। ভালো লাগছে না, আবার নতুন আরেকজনের সঙ্গে ঘুমুচ্ছে। ফলে তারা সন্তান জন্ম দেবে কীভাবে? তারা সন্তানকে ভালোবাসার মতো কোনো বাঁধনেই জড়াচ্ছে না। তাছাড়া সমলিঙ্গের সঙ্গীর সঙ্গে বসবাসের বিষয়টিও তোমাকে মাথায় রাখতে হবে। পশ্চিমা দেশগুলোতে বর্তমানে গে বা লেসবিয়ান সংস্কৃতি যেনো নতুন একটা ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাবা যায় কেমন কদর্যতা তাদের যাপিত জীবনে?

প্রিয় উম্মে আয়মান–

এবার বুঝলে, নারীমুক্তি তাদের এই মুক্তিই দিয়েছে। পশ্চিমের বিভিন্ন দেশ এই বীভৎস যৌনাচার রুখতে বেশি করে তাদের দেশে মুসলিম প্রবাসীদের নাগরিকত্ব দেয়া শুরু করেছে। কারণ তারা জানে, সন্তান জন্মদানের ব্যাপারে মুসলিমরা বরাবরই দিলখোলা। তাদের ধর্মেও বেশি বেশি সন্তান নেয়ার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এ কারণে পশ্চিমে মুসলিম প্রবাসীদের নাগরিকত্ব প্রদান বেশ জোরেশোরেই শুরু হয়েছে। কারণ, তাদের দেশে যে হারে মানুষ মৃত্যুবরণ করছে সে হারে সন্তান জন্ম নিচ্ছে না।

সুইজারল্যান্ডের কথা শুনলে তুমি আরও অবাক হয়ে যাবে। সে দেশের স্কুলগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছাত্রের অভাবে ধুঁকছে। কারণ, স্কুলে ভর্তি হওয়ার মতো ছাত্র আসছে না স্কুলগুলোতে। আসবে কীভাবে? তারা তো সন্তানই নিচ্ছে না। সন্তান না হলে স্কুলে ছাত্র আসবে কোত্থেকে? তারা জীবনটাকে কেবলই ভোগের বস্তু বানিয়ে নিয়েছে। বস্তুবাদসর্বস্ব সভ্যতা তাদের ভেতর থেকে নিংড়ে নিয়েছে ভালোবাসার বন্ধন। সন্তান পালনের মতো উটকো ঝামেলায় কে জড়াতে যায়?

প্রিয় নার্গিস–

একটি কথা তোমাকে একটু অন্যভাবে বলি। এই যে নারী অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর স্বাবলম্বী হওয়া এবং সর্বোপরি নারীর স্বাধীনতা– এর সবই কিন্তু উদ্গাত হয়েছে নারী-পুরুষের যৌনতাবিষয়ক ব্যাপার-স্যাপার থেকে। মানবসভ্যতার সূচনালগ্নে আদমপুত্র হাবিল-কাবিলের বিবাদের কথা তুমি-আমি সবাই জানি। কেন সংঘটিত হয়েছিলো সে বিবাদ? যৌনলিপ্সা থেকেই তো, তাই না?

এখানে অনেকে নারীকে দোষ দিয়ে পুরুষ প্রজাতিকে ধোয়া তুলসী পাতা বানানোর অপলাপ করেন। আদমতনয়া আকলিমাকে নষ্টের গোড়া বলে একধরনের আত্মতৃপ্তি পেতে চান। আবার অনেকে মা হাওয়াকে বেহেশত থেকে নির্বাসনের কারণ বলে বেশ আনন্দ পান। আসলে এর

সবই ভুল ধারণা এবং অযাচিত বিষোদ্গার। দুটি ঘটনাতেই নারী ও পুরুষের ভুল সমান। কাউকে একতরফাভাবে দোষী করার সুযোগ নেই।

যা হোক, যৌনতা বিষয়টি যতোদিন মানুষের রক্তধারায় থাকবে, ততোদিন নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ থাকবে, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে নারী নির্যাতনকে হ্রাস করা অসম্ভব নয়। এ জন্য আসলে নারীমুক্তি বা নারীর স্বাধিকার আন্দোলন তেমন কোনো ফজিলতের কথা নয়। নারী-পুরুষ উভয়কে সহমর্মী হতে হবে। বিশেষ করে, পুরুষের দায়িত্বটাই এ পর্যায়ে বেশি ও ভারী।

প্রিয় মেহজাবিন–

কিছুদিন আগে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে একটি প্রতিবেদন দেখলাম। আমেরিকার লাসভেগাসের বারবনিতারা (পতিতা) তাদের ওপর যৌনতার নামে কোনো ধরনের অত্যাচার চালানো যাবে না– এমন দাবি নিয়ে আন্দোলন করছে। লাসভেগাসে যেসব যৌনকর্মী আছে, তাদের খদ্দেররা যেনো যৌনকর্মের সময় তাদের ওপর কোনো ধরনের শারীরিক নির্যাতন না চালায়– সে ব্যাপারে অধিকার আদায়ের জন্যই তারা পথে নেমেছে।

তাহলে এবার বুঝো ব্যাপারটা! পৃথিবীর সবচেয়ে উন্মুক্ত এবং মুক্ত শহর হিসেবে পরিচিত লাসভেগাসের মতো স্থানেই যদি বারবনিতারা নির্যাতনের শিকার হয়, নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, তাহলে অন্য শহরের নিষিদ্ধ বারবনিতাদের অবস্থা কেমন হবে? আর পথমেয়েদেরই যদি এই দাবি নিয়ে রাস্তায় নামতে হয়, তাহলে মুফতে ভোগ করা গার্লফ্রেন্ড আর বান্ধবীদের কী অবস্থা সেই সমাজে? আশা করি, একজন সচেতন পাঠক হিসেবে বিষয়টি তুমি বুঝতে সক্ষম হয়েছো।

আসলে নগ্নতা বা জরায়ুর স্বাধীনতার উৎসমূল থেকে উদ্গত যে নারীমুক্তি বা ফেমিনিজম, সেটা আদতে বেশ্যাবৃত্তি আর উদার যৌনতাকে উর্বর করা ছাড়া আর কোনো ফায়দাই দেয় না।

আমি কি কথাগুলো সহজভাবে তোমাকে বোঝাতে পারলাম, প্রিয় আফসানা?

বিচ্ছেদ নয়
প্রেমে সাজুক ধরণি

প্রিয় ফাতেমা–

একবার ফেসবুকে আমি আমার বন্ধুদের সম্বোধন করে একটা স্ট্যাটাস লিখেছিলাম। স্ট্যাটাসের বিষয়বস্তু ছিলো– বিয়ে। হুম, বিয়ে। শুনে কি একটু অস্বস্তিতে পড়লে? না, কোনো অস্বস্তি নয়। বিয়ে ব্যাপারটিকে আমরা যতোটা অস্বস্তির বা শরমিন্দার বিষয় মনে করি, বিষয়টি আসলে ততোটা অস্বস্তির হওয়া উচিত ছিলো না কোনো কালেই। বরং আমাদের উচিত ছিলো, বিয়ে বিষয়ে সমাজে সাধারণ এবং সিম্পল রীতি-নীতি চালু করা। যাতে বিয়েটা কখনোই যেনো একটা মচ্ছবের মহোৎসবে পরিণত না হয়।

একটা বিষয় খেয়াল করে দেখো, সমাজে ব্যভিচার যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, এর একটা বড় কারণ কিন্তু ছেলেমেয়েদের সঠিক বয়সে বিয়ে না করার কুফল। প্রেমের নামে ছেলেমেয়েরা যেভাবে নির্লজ্জের মতো যেখানে-সেখানে অসভ্যতা করে বেড়াচ্ছে, এর মূল কারণটাই হলো প্রাপ্ত বয়সে বিয়ে করতে অনীহা কিংবা অপারগতা।

এ বিষয়টিকেই সবার সামনে তুলে ধরতে স্ট্যাটাসে কিছু কথা লিখেছিলাম। পাঠকমাত্রই বিষয়টি দারুণ আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করে এবং নিজেদের ব্যাপারে আরও সতর্কতা অবলম্বনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

প্রিয় খাওলা–

এখানে সে স্ট্যাটাসটিই তোমার সামনে তুলে ধরছি। এটি তোমার জন্যও উত্তম একটি সবক হবে আশা করি।

বন্ধুদের উদ্দেশে বলেছিলাম–

ধরুন–

একমনে ল্যাপটপে কাজ করছেন, অথবা শুয়ে শুয়ে বই পড়ছেন, অথবা বসে বসে মোবাইল টিপছেন; হঠাৎ আপনার মনে হলো কেউ আপনার দিকে তাকিয়ে আছে। আপনি চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন, একটি মেয়ে বালিশে মাথা রেখে আপনার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার দৃষ্টিতে কোনো কৌতূহল নেই, কোনো মুগ্ধতা নেই, কোনো দুঃখবোধও নেই; শুধু নিষ্পলক আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

আপনি ভ্রু কুঁচকে মেয়েটির দিকে তাকাতেই সে মুখ ভেংচি দিয়ে চোখ নামিয়ে অন্যদিকে পাশ ফিরে শুলো। আপনি কিছুটা অবাক হয়ে মনে মনে একটু মুচকি হাসলেন। আপনার কি মনে হচ্ছে, আপনি আবার নতুন করে এই মেয়েটির প্রেমে পড়ছেন?

ধরুন–

রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছে। ঘুম থেকে জেগে দেখলেন, আপনার বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে একটি মেয়ে। নিপাট শঙ্কাহীন জবুথবু ঘুম। তার এলো চুলে মুখের অর্ধেকটা ঢাকা, চুল ছড়িয়ে আছে আপনার বুকে, বালিশজুড়ে। মেয়েটির পিঠের নিচে আপনার হাত, অনেকক্ষণ একভাবে থাকার কারণে হাত ব্যথা করছে। কিন্তু আপনি হাত সরিয়ে নিতে পারছেন না। হাত সরাতে গেলেই মেয়েটির ঘুম ভেঙে যেতে পারে। আপনি মেয়েটির ঘুম ভাঙাতে চাচ্ছেন না। মনে হচ্ছে, তার ঘুম ভেঙে গেলেই হারিয়ে যাবে কিছু হীরণ্ময় মুহূর্ত।

আপনি মেয়েটির মুখ থেকে চুলগুলো সরিয়ে তার মুখের দিকে তাকালেন। তার গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। শিশুর মতো নিরুপদ্রব ঘুমন্ত মুখ। তার মুখটা দেখে আপনার বুকের মধ্যে কেমন হাহাকার জন্ম নিলো– আহা! এমন একটা মুখ বুকে নিয়ে আরও হাজারটা জীবন বেঁচে থাকা যায়!

ধরুন–

থাক, আর ধরাধরি করে লাভ নেই। যে দৃশ্যকল্প দুটো এখানে আঁকা হলো, এটা পড়ে আপনার কেমন লাগলো? ভালো লাগার কথা।

বিবাহিতদের চেয়ে অবিবাহিতদের বেশি ইন্টারেস্টেড হওয়ার কথা এবং এটা তাদের জন্যই লেখা।

প্রিয় মাইশা–

এরপর লিখেছিলাম–

বিয়েপূর্ব প্রেম জিনিসটা তো এখন খুবই সস্তা! এতোই সস্তা যে, প্রেমিক জানে তার প্রেমিকার আরও দু-চারটে 'পরপুরুষ' আছে, আবার প্রেমিকাও জানে তার প্রেমিকের দু-চারটে 'পরনারী' ডালভাত। কী কুৎসিত মেন্টালিটি আমাদের! পশুবৃত্তি বলে যে কথাটা আমরা শুনি, এটা তো তার চেয়েও জঘন্যতম আচরণ। অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে, একটা প্রেম না করলে তার বন্ধুসমাজে সামাজিক স্ট্যাটাস থাকে না। এবং সেটা স্কুল থেকেই করতে হয়! কী বিশ্রী অবস্থা! কতোটা নীচ আমাদের মানসিকতা!

কথাবার্তা বলার আগে একটা নীতিকথা জেনে নিই, 'যে সমাজে বিয়ে যতো ব্যয়বহুল হয়, সে সমাজে ধর্ষণ-ব্যভিচার ততো বেশি সহজ ও সস্তা হয়ে যায়!'

প্রিয় শাহানা–

বন্ধুদের সতর্ক করে বলেছিলাম–

আমাদের সমাজে বিয়ে নিয়ে বড় দুশ্চিন্তা। ছেলে ও মেয়ে উভয়ের। তাদের পরিবার তো আছেই। আমার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়, পরিচিতজন অনেককে দেখি– তাদেরকে বিয়ের কথা বললেই তারা নাভিমূল থেকে দীর্ঘশ্বাস উগরে দিয়ে বলেন, বিয়ের জন্য এই পরিমাণ মান্থলি ইনকাম লাগবে, ক্যারিয়ার বিল্ডআপ করতে হবে, বাড়িতে এমন ঘর লাগবে, সমাজে স্টাবলিস্ট হতে হবে... নানা ধরনের অযাচিত কথাবার্তা। অথচ তার বয়স ত্রিশের ওপরে চলে যাচ্ছে সেদিকে তার কোনো খেয়ালই নেই।

ত্রিশ পেরোচ্ছে যে যুবকের বয়স, সে কোন সোনার হরিণের আশায় বিয়ের জন্য এখনো নিজেকে প্রস্তুত করতে পারছে না? একটা দিন যাচ্ছে মানে আপনি নিজেকে একটা দিনের জন্য ঠকাচ্ছেন। আপনি টাকা-

পয়সা, নিজের ক্যারিয়ার, স্টাবলিশমেন্ট নিয়ে যে টেনশন একা বহন করছেন, সে টেনশনের ভাগী হওয়ার জন্য আরেকজন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। অথচ আপনি 'বিয়ে' নামক অদেখা ভয়ানক ক্যাপসুল গিলে তার কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করছেন।

সেটাই কি ভালো না, এই টেনশন ও যুদ্ধটা দুজন মিলে একসঙ্গে লড়াটা? যে যুদ্ধে একা একা লড়তে লড়তে আপনি ক্লান্ত, সেখানে আরেকজন যোদ্ধা যদি আপনি আপনার পাশে পান, তাহলে নিশ্চিতভাবেই আপনি বিজয়ের দিকে আরো কয়েক কদম নিমেষেই এগিয়ে গেলেন। বিয়ে আপনাকে শারীরিকভাবে তো বটেই, মানসিকভাবেও জীবনযুদ্ধে লড়ার জন্য আরও তাজাদম করে দেবে। প্রতিটা বাধা তখন বুক চিতিয়ে লড়ে যেতে পারবেন।

প্রিয় আতিকা–

সবাইকে বিয়ের অনাড়ম্বরতা বোঝাতে একটি হাদিসও উদ্ধৃত করি–

একটা হাদিসের ঘটনা বলি। এক সাহাবি তার বন্ধু আরেক সাহাবিকে বললেন– 'অমুকের মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাই। প্রস্তাবটা তুমি তার কাছে নিয়ে যাও। সাহাবি বন্ধুর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে মেয়ের বাপের বাড়ি গেলেন। মেয়ের বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। মেয়ের বাবা পাত্রের ব্যাপারে শুনে বললেন– 'না, তাকে আমার পছন্দ নয়। তবে তুমি যদি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাও, তাহলে তোমার কাছে মেয়েকে বিয়ে দিতে প্রস্তুত।'

প্রস্তাব নিয়ে যাওয়া সাহাবি কিছুক্ষণ ভেবে বললেন– 'আমি রাজি।' কনের বাবা কনের কাছে গিয়ে তার হ্যাঁ-সূচক মতামত নিয়ে সেখানেই দুজন সাক্ষীর সামনে তাদের বিয়ে পড়িয়ে দিলেন। সাহাবি ফিরে এসে বন্ধুকে এ ঘটনা জানালে বন্ধু সহাস্যে তাকে মোবারকবাদ জানালেন তাদের শাদি মোবারকের।'

প্রিয় শাকিরা–

সবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলাম–

এই হচ্ছে বিয়ে। আর আমাদের সমাজে বিয়ে মানে জমিদারের মচ্ছব যেনো। হাজারো ঢাকঢোল পেটাতে হয়। কয়েক দিন নবাবের

খরচের মতো দেদার খরুচে বাহুল্য। স্ত্রীকে এটা দিতে হবে, আত্মীয়স্বজনকে এটা খাওয়াতে হবে, অমুক শপিং করতে হবে, এতোজনকে দাওয়াত করতে হবে, গায়েহলুদ, বৌভাত, ওলিমা, বিবাহোত্তর সংবর্ধনাসহ আরও অসংখ্য কাজকারবার। এসবের বেড়াজালে আটকে একটা ছেলের বা মেয়ের সুন্দর একটা অনাগত জীবনের পথ শুধু শুধু দীর্ঘায়িত করার কোনো মানেই হয় না!

আপনার কি মনে হচ্ছে না, আপনি বিয়েকে ব্যয়বহুল এবং বয়সবহুল করছেন বলেই সমাজে ব্যভিচার ও অনৈতিক যৌনাচারের প্রসার ঘটছে?

প্রিয় তাইয়েবা–

নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে বলেছিলাম–

গ্রামের অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিতদের মধ্যে বিয়ে নিয়ে দুর্ভাবনার ট্যান্ডেন্সি কম। আমার চেয়ে বয়সে আট-দশ বছরের ছোট পাড়াতো কিছু ভাই-ভাতিজা এমন আছে, যারা এরই মধ্যে দুটো করে বিয়ে করে ফেলেছে। কী করবে, এক বিয়ে টেকেনি; মাস না ঘুরতেই আরেক বউ ঘরে তুলে এনেছে। কার এমন দায় পড়েছে এতো সমাজ, এতো লোকলজ্জার ফালতু সেন্টিমেন্ট আঁকড়ে ধরে নিজেকে ঠকানোর?

এক অর্থে ওরাই ঠিক আছে। বিয়ে নিয়ে ওদের যেমন এতো লোকলজ্জা নেই, তেমনি গরু-ঘোড়া মেরে মচ্ছব করারও প্রয়োজন হয় না।

প্রিয় সাকিনা–

সবশেষে উপসংহার টেনেছিলাম–

ছেলেদের জন্য বিয়ের পারফেক্ট বয়স, আমার মতে ২৫।

এর থেকে যতো দেরি হবে ততোই নিজেকে হারিয়ে ফেলবেন। জীবনের স্বাভাবিক গতি থমকে যাবে। কোনো কাজেই নিজেকে পারফেক্ট লাগবে না। ক্যারিয়ার, ইনকাম, স্ট্যাটাস ফালতু জিনিস। আপনার স্ত্রীর রিজিকের ভাগ্য আল্লাহ লিখে রেখেছেন। তার রিজিকের চিন্তা আপনাকে না করলেও হবে। ওটা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিন। যে আল্লাহ আপনাকে

ছাড়াই এ মুহূর্তে আপনার স্ত্রীকে খাওয়াতে-পরাতে পারছেন, বিয়ের পর কি তিনি আপনার স্ত্রীর ওপর থেকে তার রিজিকের দরজা বন্ধ করে দেবেন? বরং হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী– বিয়ে করলে স্বামীর রিজিক বাড়ে বৈ কমে না।

এতো ভাবাভাবি না করে আপনার কাজ হলো, ঝটপট একটা বিয়ে করে ফেলা। কোনোরকম বাহুল্য ছাড়া। এরপর মন দিয়ে ভালোবাসাবাসি। একজনের দিকে আরেকজনের অপলক তাকিয়ে থাকা। রাতদুপুরে ঘুম থেকে জেগে বুকের মধ্যে ফুটফুটে একটা মুখ আবিষ্কার করে সারারাত জেগে থাকা। জীবনের এমন অপার্থিব সুখকে অনাহূত কারণে দূরে সরিয়ে রাখার কোনো মানেই হয় না।

প্রিয় নিশাত–

এই ছিলো সেই ফেসবুক স্ট্যাটাসের আদ্যোপান্ত। ফেসবুক বন্ধুদের বিয়ের ব্যাপারে গুরুত্ব বোঝাতে এভাবেই লিখেছিলাম। জানি না এ লেখা কতোটা প্রভাব ফেলেছিলো তাদের ওপর, তবে অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে আমাকে জানিয়েছেন তাদের ভালোলাগা। তারাও চেষ্টা করবে নিজেদের জীবনে এর প্রতিফলন ঘটাতে। এমন লেখা আরও বেশি বেশি লেখারও অনুরোধ করেন অনেকে।

প্রিয় মোমিনা–

এবার তোমাকে বলি আরেকটি অম্ল-মধুর অভিজ্ঞতার কথা। আমাদের বাড়ির কাছে 'দারুল ইফতা ওয়াল বুহুসুল ইসলামিয়া' নামে একটি উচ্চতর ইসলামি আইন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের সঙ্গে আমি স্বেচ্ছাকালীন খানিকটা সময় কাটাই। প্রচলিত অর্থে কোনো শিক্ষকতা নয়, ছাত্রদের সামনে বসে দুনিয়ার তাবৎ জ্ঞান বিতরণ করি আরকি। সপ্তাহে দুদিন-একদিন ওখানে যাই, নিজের জ্ঞান-অজ্ঞতা তাদের সামনে প্রকাশ করে দিয়ে আসি।

প্রতিষ্ঠানের পরিচালক আমার অতীব ঘনিষ্ঠজন। আমার জানাশোনা পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষদের যে ছোট্ট তালিকা, তার মধ্যে

প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মুফতি আতিকুর রহমান সগর্বে স্থান করে আছে বহুদিন থেকে। সে স্থান থেকে তার নড়াচড়ার নাম নেই। নিজের সাচ্চা আদমির গোল্ডেন জিপিএ ফাইভ বজায় রেখে চলেছে নিরলসভাবে।

যাকগে, কথা আতিককে নিয়ে নয়। কথা বলবো দারুল ইফতার ছাত্রদের নিয়ে। কোটাভিত্তিক ভর্তির সুবাদে ছাত্রসংখ্যা সাকুল্যে ১৫ জন। ঢাকা শহরের চাণক্য টাইপের ছাত্র নয়, বেশ সাদাসিধে সারল্যেভরা চেহারার ছাত্র সবাই। চোখ-মুখে কৌতূহলের বিস্ময় লেগেই থাকে তাদের।

প্রিয় নয়না–

তো, কিছুদিন আগের কথা। একদিন ছাত্রদের নিয়ে কথা বলছিলাম। কথা প্রসঙ্গে বিয়ের কথা উঠে এলো। আমি যেহেতু পূর্ণকালীন শিক্ষক নই, এ কারণে ছাত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক অনেকটাই বড় ভাইসুলভ। তারা কৌতূহল নিয়ে যখন জানতে পারলো যে আমি বেশ আগেই বিয়ে করেছি, এটা তাদের বিশ্বাস করাতে কষ্ট হলো। এবার আমি তাদের নিয়ে পড়লাম– আপনারা কে কে বিয়ে করেছেন?

কেউ রা করে না। মুখ লুকিয়ে হাসে। যারা করেছে তারাও শরমিন্দা, যারা করেনি তারাও জানাতে নিমরাজি। যাক, অনেক দেনদরবার করে জানা গেলো– গোটা তিনেক ছাত্র ইতোমধ্যে বিয়েকর্ম সম্পাদন করেছে। তাদের জন্য বরাবরই আমার পক্ষ থেকে সাধুবাদ রইলো। যারা করেনি, তাদের জন্য অম্ল-মধুর সদুপদেশ বর্ষণ করলাম।

ক্লাসের এক ছেলে ফস করে বলে উঠলো– বিয়ে না করলেও একজন বিয়ে করবো করবো করছে। তার জন্য মাসয়ালা কী? তার কথায় ক্লাসের সবাই হেসে উঠলো।

যে ছেলের ব্যাপারে বলা হলো, সে ক্লাসের সবার চেয়ে সরল এবং সদাহাস্য। তার এমন সদিচ্ছার কথা শুনে আগ্রহভরে তাকে সাহস দিলাম, শুভকাজে দেরি করার ভয়াবহ পরিণাম কতোটা অশুভ হতে পারে, সেটা তাকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিলাম। বিয়ের জন্য কিছু টোটকা টিপসও দিলাম।

সম্ভবত কাজ হলো!

প্রিয় আতিয়া–

এ ঘটনার পর দু-তিন সপ্তাহ কেটে গেছে। মাদরাসা ছুটি হয়ে যাবে, আমি বাড়ি থেকে ছুটির আগে শেষ ক্লাস করতে গেছি। ক্লাসে কথাবার্তা শুরু করলাম। সবার মধ্যেই বেশ একটা খুশি খুশি আমেজ। ক্লাসে সেই সরল সদাহাস্য ছাত্রটিকেও দেখলাম। তার মুখের হাসি অন্য সবার চেয়ে বেশি বিস্তৃত। অথচ গত দুই সপ্তাহ অজ্ঞাত কারণে তাকে ক্লাসে দেখিনি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম– কী ব্যাপার, সবাই দেখি বেশ খুশি!

–জি, আবদুল্লাহ (ছদ্মনাম, সদাহাস্য ছাত্রটি) ভাই শুভকাজ সেরে এসেছেন।

–আচ্ছা আচ্ছা... তাই নাকি? কবে হলো শুভকাজ?

সরল আবদুল্লাহর হাসিতে মোটেও সংকোচ দেখলাম না। বললো– এই তো গত সপ্তাহে।

–বেশ... তা কেমন চলছে সংসারজীবন?

–জি, আলহামদুলিল্লাহ!

–ধুর মিয়া, আলহামদুলিল্লাহ দিয়ে কি সংসার বোঝা যায় নাকি?

সবাই হাসছে। আবদুল্লাহও হাসছে। সে সম্ভবত কিছু একটা বলতে চাচ্ছে, কিন্তু কিছুটা সংকোচ এখনো কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

আমি অভয় দিয়ে বললাম– তারপর, ভালোবাসা কেমন চলছে? ভয়-ডর দূর হয়েছে?

–জি, হুজুর...! একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম, হুজুর।

–জি, বলেন!

–আমি যদি এখন এ কথার ওপর কসম খাই যে– আপনার কথায় উদ্বুদ্ধ হয়েই আমি বিয়ে করার সাহস পেয়েছি, তাহলে আমি ওয়াদা ভঙ্গকারী হবো না, আমি 'হানেস' হবো না। আপনি সেদিন বলেছিলেন– আপনি যে মেয়েকে বিয়ে করবেন, তাকে আল্লাহ তাআলা এখন এই পৃথিবীর কোথাও না কোথাও রিজিক দিয়ে খাওয়াচ্ছেন, পরাচ্ছেন। আপনি বিয়ে করলে আল্লাহ তার রিজিক বন্ধ করে দেবেন না। বরং

হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী আপনার এবং তার রিজিক আল্লাহ বাড়িয়ে দেবেন...! সুতরাং চাকরি করি না, বউকে খাওয়াবো কী, কামাই-রোজগার নাই... এমন কথা বলাটা আল্লাহর ওপর অবিশ্বাসেরই নামান্তর...! সেদিন আপনার এই কথা শোনার পর আমি বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতে আর দেরি করি নাই।

–আরিব্বাপরে! এ তো দেখি জিন্দা পীরের কারামতি!

প্রিয় মহুয়া–

এরপর সে যে কথাগুলো বললো তা পৃথিবীর সব অবিবাহিত মুসলিম ছেলে ও মেয়ের জন্য অবশ্যমান্য। এমন কথা সবসময় তুমি শুনতে পাবে না। শোনো, সে কী বলেছিলো–

–হুজুর! আরেকটি কথা আপনি বলেছিলেন– বিয়ের আগের নামাজ আর বিয়ের পরের নামাজের মধ্যে বিশাল তফাত। বিয়ের পরে ঈমান পরিপূর্ণ করে, স্ত্রীকে ভালোবেসে দুই রাকাত নামাজ পড়ে দেখবেন এর মতো তৃপ্তিদায়ক নামাজ জীবনে আর পড়েননি। ওই নামাজের মতো কবুল নামাজ আর কোনোদিন আদায় করেননি।

আমি বিয়ের পর নামাজ পড়ে দেখেছি, আপনার কথা একশো ভাগ সত্য। এমন মুখলিস নামাজ, তাকওয়াওয়ালা নামাজ আমি আমার জীবনে পড়িনি কখনো। জীবনে কতো মসজিদে নামাজ পড়েছি, কতো আলেমের সঙ্গে নামাজ পড়েছি কিন্তু রাতের বেলা বউয়ের সঙ্গে ওই দুই রাকাত তাহাজ্জুদ নামাজের মতো তৃপ্তি কোনোদিন পাইনি। আপনার কথা...।

প্রিয় মুমতাহিনা–

সে সম্ভবত আরও কিছু বলতে চাইছিলো, কিন্তু সদাহাস্য সরল এই ছেলের এমন সত্য স্বীকারোক্তি শোনার পর আমার চোখ জলে ভরে গেলো। আমি জলদি ক্লাস শেষ করে বাইরে চলে এলাম।

জীবনে নিজে কোনো পুণ্য করতে পেরেছি কি না জানি না, তবে একজনের নামাজে অন্তত তৃপ্তির খোঁজ দিতে পেরেছি। কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে আর কিছু না হোক, এই অসিলা নিয়ে তো দাঁড়াতে পারবো...!

প্রিয় সানজিদা–

এবার তোমাকে একটি বেদনার কথা বলি। একজন নারী হিসেবে তুমি ভালো করেই জানো একজন মেয়ের জন্য তার স্বামী-সংসার কতোটা ভালোবাসার, কতোটা সাধনার ধন। কিন্তু আমাদের সমাজের কিছু মানুষ এমন আছে যারা এই সংসারকে, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনকে সবার সামনে অত্যন্ত কদর্যভাবে উপস্থাপন করে। সংসারজীবনকে তারা মনে করে যেনো একটা কারাগারের মতো।

আরেকটি বিষয় খেয়াল করো, বর্তমানে আমাদের সমাজে যেসব জোক (কৌতুক, চুটকি) চালু আছে, এর বড় একটা অংশ স্ত্রী-সংক্রান্ত। যেমন স্ত্রীর জ্বালায় স্বামীর জীবন অতিষ্ঠ, স্ত্রী শ্বশুরবাড়ি গেলে স্বামী হাঁপ ছেড়ে বাঁচে, স্ত্রীর অত্যাচারে জীবন জেলখানা, স্ত্রী দজ্জাল, স্ত্রী পুলিশের বাপ–মরে গেলে বেঁচে যাই, বিবাহিতের জীবন মানে নিহতের জীবন, স্ত্রী মানেই অঢেল খরচ, স্ত্রী এমন একটা প্রাণিবিশেষ যে কেবল খাই খাই করে, বিয়ে করা জীবনের শ্রেষ্ঠতম ভুল ইত্যাদি ইত্যাদি নেগেটিভ কৌতুক। বিশেষ করে, দৈনিক সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন বা ফেসবুক-অনলাইনেও যেসব চলতি জোকস আছে, সেগুলোর অধিকাংশ স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর নাজেহাল হওয়ার হাস্যরসাত্মক বয়ান সমৃদ্ধ।

প্রিয় স্বপ্না–

কিছু সময়ের জন্য তোমার দৃষ্টি একটু অন্যদিকে ফিরিয়ে নিচ্ছি। কিছুদিন আগে একটা নিউজ পড়েছিলাম– গত এক বছরে চট্টগ্রামে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছে ১০ হাজার স্বামী-স্ত্রীর! সংবাদটির ভয়াবহতা আন্দাজ করার জন্য বলছি– আমার যতোটুকু ধারণা, চট্টগ্রামে গত এক বছরে ১০ হাজার বিয়েও হয়নি সম্ভবত। এটা আমার নিছক ধারণা। তবে সত্যতা এর চেয়ে খুব বেশি দূরে নয়। খোলা চোখে যে কেউ চিন্তা করলে এটা অনুধাবন করতে পারবে।

তাহলে একবার ভাবো, চট্টগ্রামের অবস্থাই যদি এমন হয়, তাহলে ঢাকার অবস্থা আরও কতো ভয়াবহ!

প্রিয় শিখা–

আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসো। কৌতুক বিষয়ে আমার প্রশ্ন হলো– স্ত্রীকে নিয়ে এমন এতো নেগেটিভ কৌতুকের কারণ কী? সমাজে এর বাস্তবতা কতোটুকু? মানুষের জীবনে স্ত্রী কি আসলেই এতোটা সমস্যা তৈরি করা ব্যক্তি? তুমি আমার সামনেই আছো। তোমার কাছেই জানতে চাই, বলো তো– তোমার মা-বাবা, ভাই-ভাবি, বোন-দুলাভাই, চাচা-চাচি... কার সংসারে তুমি এমন সিচুয়েশন দেখেছো, যার ফলে তুমি বলতে পারো– স্বামীর জীবন তো শ্যাষ!

আমি জানি, তোমার জবাবটা বরং উল্টোই হবে। স্ত্রীর জ্বালায় অতিষ্ঠ হওয়ার নজির আমাকে খুব বেশি দেখাতে পারবে না। স্ত্রীর জ্বালায় স্বামীর জীবন শেষ হওয়ার পরিবর্তে আমি বরং স্বামীর অত্যাচারে স্ত্রীর জীবন সঙিন হওয়ার নজিরই বেশি দেখাতে পারবো।

তাহলে এই পত্রিকা আর মিডিয়াওয়ালারা এসব কৌতুক কই থেকে আমদানি করে? আর বাংলাদেশে এগুলো প্রচারের মাহাত্ম্য কী? কেন স্ত্রীকে একজন প্রকট উটকো ঝামেলাপূর্ণ বস্তু হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে? কই, স্বামীকে তো কখনো এমন বিরূপভাবে উপস্থাপন করা হয় না! তাকে তো স্ত্রীর জীবন অতিষ্ঠের কারণ বলা হয় না। স্বামী কি ধোয়া তুলসী পাতা? সংসারের যাবতীয় অশান্তির একচ্ছত্র উৎস কেবলই নারী? স্ত্রী? বউ?

প্রিয় মুসলিমা–

একজন নারী হিসেবে তুমি বেশ ভালো করেই জানো, বাঙালি মুসলিম হওয়ার কারণে পারিবারিক বন্ধনটা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব নপুংসক পত্রিকা স্ত্রীকে এমন জলজ্যান্ত দস্যিনী বানিয়ে আমাদের দাম্পত্য জীবনটাকে কলুষিত করা ছাড়া আর কোনো ফায়দাজনক কাজই করে না।

টিভিতে বা ইন্টারনেটে ইদানীং ফান শো বা কমেডি শো নামে একধরনের অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। বিশেষ করে, ভারতের হিন্দি বা বাংলা চ্যানেলগুলোতে এ ধরনের অনুষ্ঠান বেশ ঘটা করে প্রচারিত হচ্ছে। সেসব অনুষ্ঠানের কাজ হচ্ছে লোকজনকে নানা কথা বলে

হাসানো। এ ধরনের অনুষ্ঠানে যারা উপস্থাপক বা আমন্ত্রিত অতিথি থাকেন, তারা আরেক কাঠি সরেস পাবলিক। হাজারো ইনিয়ে-বিনিয়ে তারা স্ত্রীর দোষ বা বিবাহিত জীবনের সঙিন অবস্থার কথা বলে লোক হাসানোর চেষ্টা করেন।

এ ধরনের জোকস বারবার পড়লে বা শুনলে অবশ্যই একজন মানুষের মনে এগুলোর প্রভাব পড়তে বাধ্য। স্বামী যদি পড়ে, তাহলে সে ধীরে ধীরে মনে করতে থাকবে– আসলেই তো, আমার বউ তো বিরাট দজ্জাল! আবার স্ত্রী যদি পড়ে, তাহলে সে মনে করবে– আমাকে তো আরও কঠোর হতে হবে স্বামীর ব্যাপারে!

ব্যস! সংসারে আগুন জ্বলতে আর লাগে কী! অশান্তির আগুন এভাবেই সঙ্গোপনে প্রবেশ করতে থাকে আমাদের সংসারে। আমরা বুঝতেও পারি না। পরবর্তী সময়ে আরও নানা কারণ মিলে একটা সময় দুজনের মধ্যেই জন্ম নেয় অবিশ্বাস, সন্দেহ, ক্ষোভ, ঘৃণা। এসব পত্রিকা আর আমুদে লোকজন নিজেরাও হয়তো জানে না, তারা এসব কৌতুকের মাধ্যমে কীভাবে সাজানো সংসার ভাঙার মহড়া শুরু করেছে। এসব কৌতুক বা জোকস খুব সঙ্গোপনে মানুষের মনে মনস্তাত্ত্বিক অবচেতন বোধ তৈরি করে দেয়, যা একসময় ভয়াবহ মানসিক সমস্যায় পরিণত হতে বাধ্য করে এবং এ সমস্যার কারণে সংসারে অশান্তিও অনিবার্য।

প্রিয় রেবেকা–

ইসলামের বিধি-পরিসীমা নিশ্চয় তোমার জানা আছে– ইসলামে বিয়ে যতোটা সহজ করেছে, তালাককে ততোধিক কঠিন ও ঘৃণ্য করেছে। আমাদের সমাজে ঘটেছে এর উল্টোটা– বিয়ে হয়ে গেছে বিরাট যজ্ঞের কাজ আর তালাক হয়েছে মামুলি ব্যাপার। এবং আমাদের মিডিয়াও সর্বোত প্রচেষ্টায় তালাক জিনিসটাকে সিম্পল একটা কাজ বানিয়ে ফেলছে। মাইক লাগিয়ে দুনিয়াবাসীকে জানান দিচ্ছে– অমুক হলিউড, বলিউড, বাঙালি তারকা ডিভোর্স সেরে ফেলেছেন। বেশ বগল বাজানো সংবাদ! এমন ঘৃণিত কাজও যে আহ্লাদে বলা যায়, মিডিয়ার জন্ম না হলে পৃথিবীবাসীর কাছে তা অজানা থেকে যেতো।

অথচ তালাককে যদি সমাজে অত্যধিক ঘৃণিত কাজ বলে সার্বিকভাবে প্রচার করা হতো, তাহলে আমাদের সাজানো সংসারগুলো এতো সহজে ভাঙতো না। হ্যাঁ, একটা সময় আসে যখন তালাক ছাড়া উপায় থাকে না। তখন তালাক বা ডিভোর্সই একমাত্র সমাধান। কিন্তু সেই ডিভোর্স বা তালাককে যদি আমরা ঠুনকো কারণে হাত ধরে ডেকে নিয়ে আসি, তাহলে সেটাকে নিশ্চয় বুদ্ধিমানের কাজ বলা যাবে না। যে সংসার খুব সাধারণ, খুব সিম্পল জিনিস দিয়ে সাজিয়ে তোলা যায়, সেই সংসারকে এসব জোকস আর কৌতুক দিয়ে কাচের মতো ভঙ্গুর করবেন না। জীবনটা অনেক সুন্দর, এটাকে সুন্দর করার চেষ্টা করুন। কদর্যতা আর কলুষ দিয়ে এ জীবনকে কলুষিত করলে আল্লাহর কাছেও অপরাধী হয়ে থাকবেন।

প্রিয় মাবরুরা–

দুনিয়াবাসী যে যা-ই বলুক, সংসারজীবন আল্লাহ তাআলার এক অপূর্ব দান। দাম্পত্য জীবন নারী-পুরুষের জন্য ভালোবাসার এক অনিঃশেষ ফল্গুধারা। এখানে ঝড়-বাদল, ঘাত-প্রতিঘাত আসবেই। কিন্তু তাই বলে ভেঙে পড়লে চলবে না, হেরে গেলে চলবে না। নিজের ভালোবাসা দিয়েই আবার উঠে দাঁড়াতে হবে। শত কোটি টাকা আর সম্পদ দিয়ে যে কাজ করা সম্ভব নয়, ভালোবাসার সামান্য পরশ দিয়েই সে সুখ কেনা যায় খুব সহজে।

এখানে আমি তোমাকে তেমনই ছোট্ট দুটি ভালোবাসার টিপস শিখিয়ে দিচ্ছি। দিন শেষে তোমার মনেও খেলা করুক জান্নাতি হাসি, এ তো আমার পরম চাওয়া।

সংসার আনন্দমুখর করতে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই অবশ্যপালনীয় তিনটি কথা–

এক.

কম্প্রোমাইজ করতে শেখা। দুজন দুজনকে ছাড় দেয়ার মানসিকতা রাখা। একজনের মতামত ও সিদ্ধান্ত অপরজনের কাছে খারাপ লাগলেও সেটা হাসিমুখে সাদরে গ্রহণ করা।

ধরো, দুজনের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়েছে বা কোনো বিষয় নিয়ে একজন আরেকজনের ওপর রাগ করে আছো, দুজনই বেশ মুখ ভার করে আছো। তখন, একটু নত হও। নিজের ভেতরের ইগোকে একটুখানি বিনীত করো। ভালোবাসার মানুষটার সামনে গিয়ে বলো, স্যরি।

বুঝলাম ভুলটা তারই হয়েছে, দোষটা সে-ই করেছে, তবু সংসারের বৃহত্তর স্বার্থে নিজেকে তার সামনে গিয়ে নতজানু করো। দেখবে, সকল সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। সংসার আবার হেসে উঠেছে ঝলমল করে।

এর নামই কম্প্রোমাইজ। শুধু নিজের মতটাকেই প্রাধান্য দিয়ো না, অপরজন কী বলতে চাচ্ছে, কী করতে চাচ্ছে– সেটাকেও মাঝে মাঝে অগ্রাধিকার দাও। হোক তাতে বাহ্যিক কিছুটা ক্ষতি, কিন্তু এর মাঝেই নিহিত আছে সুখের দৃঢ়তর বন্ধন। একজনের প্রতি অন্যজনের সম্মান প্রদর্শনের শ্রদ্ধাবোধ।

প্রিয় হালিমা–

এ কথা কিন্তু তোমাকেই বলছি, এমন না। বলছি তোমার স্বামীকেও। তুমিও যদি কখনো এমন করো, তাহলে তাকেও শিখিয়ে দিয়ো এই বিদ্যা। সে যেনো তোমার ওপর মাঝেমধ্যে প্রয়োগ করে এমন কবিরাজি দাওয়াই।

দুই.

স্ত্রীকে সম্মান করা। তার কাজের স্বীকৃত দেয়া। স্বামীকে সম্মানের জন্য কোনো স্ত্রীকে বলে দিতে হয় না, বাঙালি মেয়েদের এটা ডিফল্ট গুণ। তবে স্ত্রীকে সম্মান না করার ব্যাপারে বাঙালি পুরুষমাত্রই আনাড়ি। খুব সাধারণ কথা ও কাজ দিয়ে স্ত্রীকে বোঝানো যায় যে– আমি তোমাকে সম্মান করলাম। এ সম্মানটা তোমার প্রাপ্য।

ধরো, স্ত্রী সুন্দর একটা কাঁথা সেলাই করলো। স্বামীকে যখন এটা দেখাবে, স্বামী যেনো বলে উঠে– ওয়াও, কীভাবে সেলাই করলে এতো সুন্দর করে? এটা তো তোমার চেহারার মতোই সুন্দর হয়েছে!

ধরো, স্ত্রী নতুন একটা আইটেম রান্না করেছে। রান্না তেমন আহামরি কিছু হয়নি। তার পরও স্বামীকে এক্সাইটেড হতে হবে– উমম, এ তো দেখি মান্না-সালওয়া। তোমার হাতের রান্না তো দেখি ফখরুদ্দীন বাবুর্চিকেও হার মানাবে!

ধরো, স্ত্রী নিয়মিত খুব ছোট্ট একটা আমল করে। প্রতিদিন তিন তসবিহ আদায় করে অথবা ঘুমানোর সময় অজু করে ঘুমায়। স্বামীর উচিত স্ত্রীর এমন ছোট্ট আমলকেও বড়ভাবে অ্যাপ্রিশিয়েট করা। স্ত্রীকে এই ছোট্ট আমলের জন্যও বড় করে উৎসাহ দেয়া– আচ্ছা, এ তো দেখি আমার রাবেয়া বসরি! এ আমল তো সাধারণত অনেকেই করে না। আল্লাহ তোমার আমলে বরকত দান করুন!

এ কাজগুলো কিন্তু খুবই সামান্য। কিন্তু এর দ্বারা স্বামী স্ত্রীকে যে সম্মান দিলো, স্ত্রীর কাছে এর মূল্য অনেক, মহা মূল্যবান।

প্রিয় উম্মে হানি–

সম্মান জিনিসটা এমন যে, তুমি যদি কাউকে সম্মান করো তবে তার প্রতিদানে অবশ্যই সম্মান পাবে। আজ যদি তুমি তোমার স্বামীকে ছোট্ট একটি কথা দিয়ে সম্মান জানাতে পারো, ছোট্ট একটা কাজ দিয়ে তাকে শ্রদ্ধা দেখাতে পারো, তাহলে বিশ্বাস রাখো, এর প্রতিদানে তুমি তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি সম্মান পাবে, সীমাহীন ভালোবাসা পাবে।

প্রিয় জয়া–

সবশেষে তোমাকে একটি ছোট্ট কাজের কথা বলি। কাজটি খুবই ছোট এবং একেবারেই সিম্পল, কিন্তু এর কার্যকারিতা দারুণ এবং সুদূরপ্রসারী। তুমি নিজে পরখ করে দেখো, ফল পাবে হাতেনাতে।

তিন.

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মাঝে বিপুলহারে সালাম বিনিময়ের অভ্যাস করা। ঘরে ঢুকতে, বের হতে, দেখা হলে, একটু পর আবার দেখা হলে, ফোনে কথা বলার শুরু ও শেষে এবং অকারণে একজন

আরেকজনকে সালাম দেয়াটা দাম্পত্যজীবন প্রেমময় করতে দারুণ কার্যকর। হাদিস দ্বারা প্রমাণিত!

বিশ্বাস না হলে আজ থেকেই শুরু করে দেখতে পারো। আমার কথা একেবারে বিফলে যাবে না।

প্রিয় ফাকিহা–

তোমাকে একটা প্রশ্ন করি– আমরা সবার সামনে প্রাণ খুলে হাসতে পারি, কিন্তু সবার সামনে মন খুলে কাঁদতে পারি না কেন? কান্না এলে আমরা চোখের জল লুকাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। এদিকে ওদিক তাকিয়ে দেখি– কেউ দেখে ফেললো না তো! কান্না লুকাতে হাসির আশ্রয় নেই। কী অবিচারসুলভ কাজ! হাসি হলো কান্নার চরমতম শত্রু, দু'জন দুই মেরুর বাসিন্দা। অথচ হাসি দিয়েই তুমি কান্নাকে আড়াল করতে চাচ্ছো?

কেন আমরা এমন করি? হাসি এবং কান্না, দুটোই আবেগনির্ভর জিনিস, মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। আবার হাসি এবং কান্না দুটোই কিন্তু প্রবল প্রতিক্রিয়াশীল। কাউকে হো হো করে হাসতে দেখলে আমাদের মধ্যেও হাসির প্রভাব বিস্তার হয়। ঠোঁট আপনাআপনি দু'দিকে উপরে উঠে যায়। কান্নাও কিন্তু একই প্রভাবীয় বস্তু। কোনো মৃতবাড়িতে যাও, সেখানে মৃতের আত্মীয়-স্বজনের বুকফাটা কান্না দেখে তোমার চোখেও জল চলে আসবে। ঠোঁটের অবস্থান পরিবর্তন হয়ে যাবে।

তাহলে? তুমি হয়তো যুক্তি দেবে– কান্নাটা হলো মানুষের দুর্বলতা, মানুষ তার দুর্বলতা দেখাতে চায় না। সবাই নিজের দুর্বলতা লুকিয়ে রাখতে চায়। দুর্বলতা মানুষকে দেখিয়ে বেড়ানো কোনো কাজের কথা না।

প্রিয় আজিজা–

তুমি ভালো করেই জানো, আমাদের সমাজে স্ত্রীকে ভালোবাসাটাও এক ধরনের দুর্বলতা হিসেবে দেখা হয়। কেউ যদি স্ত্রীর প্রতি খানিকটা বেশি ভালোবাসা প্রকাশ করে, বা স্ত্রীকে বেশি সময় দেয়, স্ত্রীর কথামতো নানা বদভ্যাস ছেড়ে দিতে চায়; বন্ধু-বান্ধব পাড়া-প্রতিবেশী বলতে থাকে– ওর কি পুরুষত্ব বলতে কিছু আছে নাকি? ও তো একটা বউন্যাওটা, বউয়ের কথায় উঠে বসে! পুরুষমানুষ বউয়ের প্রতি এতো দুর্বল থাকলে দুনিয়া চলে?

কী আজব আমাদের চিন্তা! বউয়ের কথা শুনলে পুরুষত্ব কীভাবে স্খলিত হয়, এটা নিয়ে মেডিকেল থিসিস হওয়ার দাবি রাখে।

এমন অনেক ছেলের কথা জানি, যারা শুধু পরিবারের সামনে লজ্জার কারণে স্ত্রীকে প্রাণ খুলে ভালোবাসতে পারে না। স্ত্রীর সঙ্গে হেসে কথা বলা, একটু খুনসুটি-দুষ্টুমি করা, কখনো সখনো ঝগড়া করা, রাগ-অভিমান করা; পরিবারের বাবা-মা বা ভাই-বোন কেউ দেখলে কী বলবে? সবাই ভাববে– ছেলেটা কেমন! বউয়ের সঙ্গে ব্যাটাছেলের এতো কিসের মাখামাখি?

প্রিয় নুরান্বিতা–

আমাদের সমাজের অধিকাংশ পুরুষের বউমান্য নীতি হলো– বউ হচ্ছে নারীজাতি। তাদেরকে সবসময় আঙুলের ইশারার ওপর রাখতে হবে। ঘাড়ের উপর সবসময় পৌরুষের গম্ভীর নজরদারি ঝুলিয়ে রাখতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু আমি বলি কি, কাউকে যদি শাস্তিই দিতে চাও, কাউকে যদি অঙ্গুলি হেলনে চালাতেই চাও তবে তাকে দুর্ধর্ষভাবে ভালোবাসো। ভালোবাসার চাইতে বড় শাস্তি আর হতে পারে না। একবার বউকে দুর্দমনীয়ভাবে ভালোবেসে তোমার প্রেমে পড়তে বাধ্য করো। দেখবে, তোমার অঙ্গুলিও হেলানো লাগবে না, তোমার প্রেমের কারণে সে সারাক্ষণ জ্বরগ্রস্ত রোগীর মতো ছটফট করতে থাকবে– কখন তাকে তুমি কিছু বলবে! তোমার একটি কথা মান্য করার জন্য সে অধীর হয়ে অপেক্ষা করবে– লোকটা আমাকে আরও দুটো কথা বলে না কেন?

বউকে ভালোবাসাটা দুর্বলতা নয়, দুর্বলতা হচ্ছে– তুমি যদি বউয়ের প্রেমে পড়তে না পারো। তুমি না পারলে তোমার প্রেমে পড়তে বউয়ের বয়েই গেছে: তোমার কি কখনো মনে হয়নি, বউকে যে তুমি আমাদের রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মতো ভালোবাসতে পারোনি, এটা তোমারই সবচে বড় দুর্বলতা?

হে স্বামীপ্রবর! বিষয়টি আরেকবার ভেবে দেখার অনুরোধ রইলো।

নারীপণ্য
আমায় তুমি ধন্য করো

প্রিয় খাদিজা–

পত্রপত্রিকা, টিভি, ইন্টারনেট, পোস্টার-বিলবোর্ডে বা আরও বিভিন্ন মাধ্যমে তো প্রতিদিনই তুমি কতো শত বিজ্ঞাপন দেখে থাকো, তাই না! নানা পণ্যের নানা কোম্পানির নানাধর্মী বিজ্ঞাপন। এসব বিজ্ঞাপনে খেয়াল করলে তুমি একটা কমন জিনিস দেখতে পাবে, সেটা হলো– অধিকাংশ বিজ্ঞাপনেই তোমার মতো কোনো না কোনো সুন্দরী নারীর বিলক্ষণ উপস্থিতি। তুমি চাও বা না চাও, তোমাকে নারীর এমন 'গৌরবোজ্জ্বল' উপস্থিতি দেখতেই হবে।

তুমি হয়তো নারীর এই উপস্থিতি বিষয়ে কখনো ভিন্নভাবে চিন্তা করোনি। একটা বিজ্ঞাপন একবার দেখেছো, তারপর সেটাকে ভুলে গেছো। কিন্তু একবার যদি বিজ্ঞাপনের অন্তরালে লুক্কায়িত কুৎসিত দিকটা দেখতে, তাহলে প্রতিটা বিজ্ঞাপন তোমার কাছে মনে হতো নারীর জন্য উপস্থাপিত একেকটা আধুনিক পতিতালয়।

তুমি হয়তো আমার কথায় আঁতকে উঠেছো। আমার দিকে হয়তো ভ্রু কুঁচকে তাকাচ্ছো। মনে মনে ভাবছো– লোকটা নারীদের ব্যাপারে কী বিশ্রী মনোভাব পোষণ করে!

একটু থামো! চলো, আমরা কিছু বাস্তবতা দিয়ে আগে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করি। তারপর না হয় ভ্রু কুঁচকানো বা ভাবাভাবির বিষয়ে কথা বলা যাবে।

প্রিয় শামছুন্নাহার–

সেদিন পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দেখলাম। কোনো একটি অখ্যাত রিয়েল এস্টেট কোম্পানির বিজ্ঞাপন। তারা তাদের বিভিন্ন ফ্ল্যাটের সঙ্গে একটি সুলভ অফার দিয়েছে– ১টি ফ্ল্যাট কিনলে উমরা ফ্রি। ২টি কিনলে হজ+উমরা ফ্রি। বেশ ভালো কথা। কিন্তু এই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক কী? তোমার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, পত্রিকার প্রায় সিকি পৃষ্ঠাজুড়ে এই বিজ্ঞাপনে বাংলাদেশের একজন নামকরা নারীমডেল কোমর দুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হজ-উমরার সঙ্গে একজন নারীর কোমর দোলানোর কী সম্পর্ক– তা বোঝা গেলো না। তবে বিজ্ঞাপনে যে নারীর উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনীয় উপাদান– এটা আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক ভালোভাবে আয়ত্ত করেছে। তাই নয় কি?

প্রিয় শিরীন–

বিজ্ঞাপন নিয়ে খুব প্রচলিত একটি উক্তি হলো– অন্ধকারে কোনো সুন্দরীর দিকে তাকিয়ে হাসা আর বিজ্ঞাপন ছাড়া কোনো পণ্যের বিপণন করা একই কথা। আশ্চর্যজনকভাবে বর্তমান সময়ের অধিকাংশ বিজ্ঞাপনের মূল পুঁজি কিন্তু সুন্দরী নারী। নারীকে সুন্দর ও সুশ্রী হতে হবে। কালো মেয়ে কিংবা নারীর অন্তর্নিহিত গুণের কোনো দাম নেই। এই ধারণা নারীমনে বপন করার গুরুদায়িত্ব 'ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি' টাইপের রং ফরসাকারী ক্রিম কোম্পানিরা নিজ দায়িত্বে বুঝে নিয়েছে।

প্রতিদিন ব্যবহারে গায়ের রং দ্বিগুণ ফরসা হয়– এই ধরনের সস্তা কথা মিডিয়ার বদৌলতে আমরা এখন হরহামেশাই শুনছি। যদিও এর সপক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে কি না সেটা জানা যায়নি। সুন্দরী না হলে কোথাও তোমার স্থান নেই– এই ধরনের অপমানসূচক বাক্যাবলি একজন নারীর জন্য কি নারী স্বাধীনতার কোনো ফায়দা দেয়, নাকি নারীকে অপমান করা হয়? অথচ রং ফরসাকারী ক্রিম, লোশন, ফেসওয়াশের বিজ্ঞাপনে আমাদের সেটাই দেখানো হয়। যেভাবেই পারো, তোমাকে সুন্দর হতে হবে। তোমার গায়ের রং গৌরবর্ণ না হলে এখনকার হ্যান্ডসাম যুবকরা তোমার দিকে ফিরেও তাকাবে না।

প্রিয় যুঁথি–

একজন নারীর জন্য এগুলো কতোটা অপমানজনক কথা, সেটা কি তুমি কখনো ভেবে দেখেছো? হয়তো এভাবে কখনো ভাবোনি। কিন্তু আজকে থেকে ভাবতে শেখো। এবং এটাও বিশ্বাস করতে শেখো– যে নারীকে আজ তুমি বিজ্ঞাপনের মডেল হিসেবে দেখছো, সে নারীও জানে না যে তাকে একটা চকচকে পণ্য হিসেবেই টিভিপর্দায় হড়হড়িয়ে বিক্রি করা হচ্ছে। এর মধ্যে ভদ্রতা বা আভিজাত্যের কোনো বালাই নেই।

প্রিয় জান্নাত–

একটা বিজ্ঞাপনের দিকে তাকাও, যেকোনো একটা বিজ্ঞাপন। ধরো একটা শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপন। দেখবে, চুলের শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপনেও এক লাস্যময়ী 'তরুণী' লোভনীয় ও আবেদনময়ী পোজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সমুদ্রসৈকতের বিশাল খোলা প্রান্তরে বাথটাবে শুয়ে নারী শরীরে সৌন্দর্য বর্ধনকারী (!) সাবান মাখছে! সাবান কি নারী একাই ব্যবহার করে? আজ পর্যন্ত কোনো সাবানের বিজ্ঞাপনে পুরুষের রূপসৌকর্যের ফিরিস্তি শোনোনি তুমি। তবে কি সাবানে পুরুষের ত্বক মোলায়েম হয় না? সাবান কি তবে কেবল নারীর জন্যই উৎপাদন করা হয়? পুরুষ, পৃথিবীর অর্ধেক এ জনগোষ্ঠীর ত্বকের ব্যাপারে কি কোনো সাবানই উৎপাদন করা হয় না? সকল সৌন্দর্য কেবল নারীরই প্রয়োজন? নাকি বিজ্ঞাপনে প্রদর্শনের জন্যই কেবল নারীর প্রয়োজন?

চৌরাস্তার মোড়ে বিশাল বিলবোর্ডে বেশ মোহনীয় ভঙ্গিতে ট্যালকম পাউডারের বিজ্ঞাপনেও নারীকেই প্রদর্শন করা হয়। অথচ ট্যালকম পাউডারে নারীর কী বিশেষত্ব আছে? গরমে-ঘামে জেরবার হয় পুরুষ, নারীর চেয়ে পুরুষেরই তো ট্যালকম পাউডার বেশি জরুরি। কিন্তু বিজ্ঞাপনের বিশাল চৌকাঠে পুরুষের উপস্থিতি নাস্তি! উদ্বাহু হয়ে চোখে মদিরা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কোনো এক চামেলি ললনা।

বৃষ্টিতে উদ্ভট নাচ-গানের মাধ্যমে আমজনতাকে সিম কেনার কথাও ওই নারীকেই বলতে হয়! মোটরগাড়ির টায়ার, শেভিং ক্রিম, ব্যাংক-বিমা, হাসপাতাল, ফার্নিচার, মোবাইল, গাড়ি-বাড়ি, রিয়েল এস্টেটসহ এমন হেন কোনো বিজ্ঞাপন নেই, যেখানে নারীকে উদগ্র পোশাক পরিয়ে

উপস্থাপন করা হয় না। কী কারণে? কারণ, নারী মানেই লোভনীয় বস্তু। নারীসমেত চটকদার বিজ্ঞাপন দেখলে যে কেউ হুমড়ি খেয়ে পড়বে। পণ্যটা দর্শনীয় নয়, দর্শনীয় জিনিসটা হলো মোহময়ী নারী। এটা দিয়েই দর্শককে গ্রাহকে পরিণত করা হয়। নারী এখানে চটকদার টোপ। পুরুষকে গিলতেই হবে।

প্রিয় শায়লা–

জানি, কথাগুলো শুনতে তোমার কিছুটা খারাপ লাগছে। কিন্তু তুমিই বলো, আমি কি এক বর্ণ মিথ্যা বলছি? চিন্তা করে দেখো, সমাজের ভদ্রশ্রেণিরাই কিন্তু এসব বিজ্ঞাপন বানাচ্ছে। আবার তারাই কিন্তু নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে দেদার গলাবাজি করছে। আবার নারীকে পুরুষের লালসার ভোগ্যপণ্যও তারাই বানাচ্ছে। দোষটা কাকে দেবে? এমন কমনীয় নারী মডেলের উদ্ভিন্ন দেহ দেখে যে ছেলেটা গার্লস স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে এলাকার ঐশ্বরিয়া রাইকে উদ্দেশ করে শিস দিচ্ছে, তাকে? নাকি এই নারীবিক্রেতা ভদ্রসমাজকে? নাকি ওই উদ্ভিন্ন যৌবন বিকানো নারীমডেলকে?

দোষ আসলে তুমি কাউকেই দিতে পারবে না। অপরাধীর কাঠগড়ায় যদি কাউকে দাঁড় করাতেই হয়, তবে সে হলো অভিশপ্ত পুঁজিবাদ, আমাদের এই বস্তুবাদ এবং আধুনিক হওয়ার আমাদের প্রাণান্ত প্রচেষ্টাকে।

প্রিয় মাহমুদা–

আমার এক রসিক বন্ধুর কথাটা মনে পড়লো। বঙ্গবন্ধু (চীন মৈত্রী) সম্মেলনকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত গাড়িমেলার কথা বলছি। একদিন দেখি, আমার সে রসিক বন্ধু গাড়িমেলায় যাওয়ার জন্য বেশ হাঁসফাঁস করছে। আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম– 'তুই আবার গাড়ি কিনবি নাকি? টিউশনি করে জীবন চালিয়ে আবার গাড়িও কিনবি?'

সে অনেকটা দাপটের সঙ্গেই বললো– 'আমি কি আর গাড়ি কিনতে যাচ্ছি নাকি!'

আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম– 'তাহলে কিসের জন্য গাড়িমেলায় যাবি?'

সে সহজভঙ্গিতে উত্তর দিলো– 'আরে বোকা, গাড়িমেলায় কেউ গাড়ি কিনতে যায় না। সবাই যায় গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মডেলগুলো দেখতে।'

শুনতে খারাপ লাগলেও বাস্তবতা সম্ভবত এর চেয়ে ভিন্ন নয়।

প্রিয় ফারজানা–

এ কথা তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে যে– পুঁজিবাদী আধুনিক সভ্যতা হচ্ছে বাজারকেন্দ্রিক সভ্যতা। এই সভ্যতায় নারী 'পণ্য' হিসেবে গণ্য। বিজ্ঞাপনে নারীকে ব্যবহার করে সর্বোচ্চ মুনাফা আদায়ের চেষ্টা করে পুঁজিবাদকেন্দ্রিক সমাজ। একজন ব্যবসায়ীর কাছে তার পণ্যের মুনাফাটাই মুখ্য। সেটার কাটতির জন্য বিজ্ঞাপনে নারী কিংবা ঘোড়া, চিত্রতারকা নাকি নীলাকাশ– সেটা কোনো বিষয় নয়। যেটা দিয়ে মুনাফা বেশি হবে, সেটাকেই ব্যবহার করতে হবে। সেটা যদি রূপবতী নারীর নশ্বর দেহ প্রদর্শনে হয়, হতে দাও। কোনো বাছ-বিচারের বালাই নেই।

এক্ষেত্রে নারীদের অকৃত্রিম সহযোগিতার কথা স্মরণ করার মতো। আগে শুধু নারীদের দেহকে ভোগ করা হতো আর কায়িক শ্রম বলতে সন্তান পালন ও রান্নাবান্নাকেই বোঝানো হতো। কিন্তু পুঁজিকেন্দ্রিক বর্তমান সমাজ সবকিছু থেকে মুনাফা আদায়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে সংসার সামলানোর পাশাপাশি দক্ষতা অনুযায়ী কাজ করতে হচ্ছে নারীদের। সুন্দরী মহিলাদের দেহকে পুঁজি করে বিশ্ববাজারে তাদের ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। আধুনিক শ্রমবাজারে যে নারীই প্রবেশ করছে তাকে একধরনের প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হচ্ছে। সুন্দরী মেয়ে মানেই চাকরির নিয়োগে ষোলকলা পূর্ণ। এটা আগে-পাছে ৮০% সত্য।

প্রিয় জুঁই–

তোমরা যাদের নারীমুক্তির রোলমডেল মনে করো, তোমাদের সেই রোলমডেলরা নারীকে নিয়ে কী করছে জানো? তারা একজন নারীকে কীভাবে পুরুষের সামনে আরো উপভোগ্য ভোগ্যপণ্য হিসেবে উপস্থাপন করা যায়, সেই চেষ্টায় মত্ত। কানিজ আলমাস খান, ফারজানা শাকিল, রহিমা সুলতানাদের বড় আহ্লাদ নিয়ে উপস্থাপন করে আমাদের মিডিয়া।

নারীকে স্বাবলম্বী করতে এরা নাকি প্রায় দেবদূত হয়ে এসেছে এ দেশে। অথচ এরা কী করছে?

এরা প্রতিদিন হাজার হাজার নারীকে মেনিকিউর, পেডিকিউর, ভ্রু প্লাক, স্পা, ফেসিয়ালসহ আরো নানা অব্যর্থ পন্থায় সুন্দরী বানিয়ে দিচ্ছে। এককথায় অপরূপা। এখন নারী এই অপরূপ রূপ-লাবণ্য কাকে দেখাবে? পুরুষ ছাড়া নারীর রূপের কদর করার ভিন্ন কোনো প্রাণী এই গ্রহে আছে বলে জানা নেই। পুরুষের সামনে নারীকে রূপের পুতুল বানিয়ে দিচ্ছেন এই বিউটিশিয়ানরা, যাতে পুরুষ এই নারীর চেহারা-শরীর দেখে মোহিত হতে পারে, তৃপ্ত হতে পারে। তাহলে কানিজ আলমাসরা কি সারাদিন নারীকে পুরুষের ভোগের পণ্যই বানাচ্ছেন না? নারীর স্বাবলম্বী হওয়া মানে কি সেজেগুজে নিজেকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে উপস্থাপন করা?

প্রিয় তানহা–

তুমি শুনে অবাক হবে কি না জানি না, তবে আমি যখনই দেখি তখনই অবাক হই। দেখি– মিডিয়ার সুন্দরী, অফিসের চাকরিজীবী, কলেজ-ভার্সিটির শিক্ষার্থী, এমনকি হাইস্কুল-প্রাইমারি স্কুলের মেয়েরাও এখন বিউটি পারলারে আসক্ত হয়ে গেছে। পথে-ঘাটে, বাজারে-বাসায়, মোড়ে মোড়ে গজিয়ে উঠেছে হাজারো বিউটি পারলার। এখন গ্রামের হাট-বাজারেও একাধিক পারলার পাওয়া মোটেও আহামরি কিছু নয়। তারা কেবল নারীকে সুন্দর বানায়। সুন্দরী বানায়। সুন্দর বানিয়ে পুরুষের লোভারণ্যে ছেড়ে দেয়। পুরুষকে বন্য করে একজন নারী কীভাবে নারীমুক্তির রোলমডেল হতে পারে, সেটা একটা গবেষণার বিষয় বটে।

তোমারও উচিত এ গবেষণায় আত্মনিয়োগ করা। কেননা তোমার চারপাশে একবার চোখ মেলে তাকালেই তুমি তাদেরকেই দেখতে পাবে, যারা সৌন্দর্য বলতেই মনে করে মেকআপ, বিউটি পারলার, হাজারো প্রসাধনী। পুরুষের চোখে নিজেদের কায়িক সৌন্দর্য দেখাতে যারা হন্যে হয়ে থাকে। যারা মনে করে, কেউ তাকে দেখে সেক্সি বা হট বললেই তার সৌন্দর্য জাতে উঠে গেলো। মূলত সে পুরুষের চোখে নিজেকে

বিক্রি করার কিছু সস্তা কসরত করছে মাত্র। সুতরাং, এমন মেয়েদের নিজস্ব সৌন্দর্য কী জিনিস– সেটা বোঝাতে তোমারও গবেষণায় নামাটা অতীব জরুরি বৈকি!

প্রিয় ফাহিমা–

এ তো গেলো সমাজের লৌকিক মানুষের কথা। এবার দেখো নারীকে ভোগ্যপণ্য বানাতে আমাদের পত্রিকাগুলো কেমন হাতেম তায়ির মতো উদারহস্ত। বাংলাদেশের প্রায় সব কটি জাতীয় দৈনিকের সঙ্গে প্রতিদিনই নানা ধরনের সাপ্লিমেন্ট (বাড়তি ফিচার পাতা) পাই। কোনোটা হাসির, কোনোটা বুদ্ধির, কোনোটা বাচ্চাদের, কোনোটা ফ্যাশনের। তুমি খেয়াল করেছো কি না জানি না, ফ্যাশনবিষয়ক যে সাপ্লিমেন্টটি প্রতি সপ্তাহে মূল কাগজের সঙ্গে দেয়া হয়, সেটা কিন্তু দিন দিন কেবল সমৃদ্ধই হয়। এছাড়া এর প্রতিটি পৃষ্ঠাই (এগুলো সাধারণত ৮ থেকে ১৬ পৃষ্ঠা, মাঝে মাঝে ২৪ পৃষ্ঠাও হয়) রঙিন হয়ে থাকে। এটা সব পত্রিকার বেলায়। এমনকি টাকার অভাবে দাম বাড়ানো অধুনালুপ্ত 'আমার দেশ' পত্রিকাও অন্য সব সাপ্লিমেন্ট বন্ধ করলেও ফ্যাশনবিষয়ক সাপ্লিমেন্ট 'আমার জীবন' কখনো বন্ধ করেনি।

কী থাকে এই ১৬ পৃষ্ঠাজুড়ে? নারীর রূপচর্চা, নারী কী খাবে, কখন ঘুমাবে, কখন ঘুম থেকে উঠলে ত্বকে বয়সের দাগ পড়বে না, গরমে কোন পোশাক পরবে, শীতে কোন রঙের মাফলার বা চাদর পরবে, কী খেলে পুরুষের চোখে চিরযৌবনা মনে হবে, কীভাবে হাঁটলে তাকে দেখেই পুরুষ কাত হয়ে যাবে– এই ধরনের হাস্যকর এবং অযৌক্তিক বিষয়-আশয় লেখা থাকে সেগুলোতে। কী বলবে এটাকে? নারী স্বাধীনতা নাকি নারীকে ভোগ্যপণ্য বানানোর সস্তা কাঁচামাল?

প্রিয় তাসনিম–

এবার তোমাকে কিছু ভয়াবহ সত্য শোনাবো। এমন সত্য, যা শুনলে তুমি শিউরে উঠবে এবং খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে– মিডিয়া কী জিনিস এবং মিডিয়ায় যেসব নারী মডেল, অভিনেত্রী বা অন্য রোলে কাজ করে, তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা কতো ভয়াবহ।

শুরুতে একটি তথ্য জানাচ্ছি তোমাকে। একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদনে প্রকাশ, বিশ্বজুড়ে উঠতি মডেলদের প্রতি ৪ জনের মধ্যে ১ জন ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে মডেল হিসেবে জায়গা পেলেও বাকি ৩ জন 'সেক্স ওয়ার্কার' হয়ে যায়। শুনতে বিদঘুটে লাগলেও এটা খুবই বিশ্বাসযোগ্য একটি পরিসংখ্যান। বাকি ৩ জন সেক্স ওয়ার্কার হয় এটা জানা গেলো, কিন্তু যে একজন মডেল হিসেবে মিডিয়ায় জায়গা পেলো সে কী হলো? তিনজন যদি হয় স্বঘোষিত, তবে বাকি একজন অবশ্যই অঘোষিত।

মিডিয়া কীভাবে আমাদের মেয়েদের বিপথে পরিচালিত করে, সে ব্যাপারে কিছুক্ষণ পরই তোমার সঙ্গে আমি আলোচনা করবো। তার আগে জেনে রাখা প্রয়োজন বলে মনে করছি– খ্যাতি বা বিখ্যাত হওয়ার বাসনা প্রত্যেক মানুষের মনেই চুপটি করে বসে থাকে। একবার যদি সেই বাসনাকে তুমি পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসো, তাহলে সে আলোকে আবার পর্দার অন্তরালে নেয়াটা প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার। এর প্রমাণ তুমি আমাদের মিডিয়া বা শোবিজের মেয়েদের দেখলেই বুঝতে পারবে। তারা একবার যদি তারকাখ্যাতি পেয়ে যায়, তাহলে তারা আর পেছনে ফিরে আসতে পারে না। রঙিন দুনিয়ার তীব্র আলো তাদের মরীচিকার মতো আকর্ষণ করতে থাকে। একবার যে যায় সে আর ফিরে আসতে পারে না।

প্রিয় অবন্তিকা–

যে কথা বলছিলাম। মডেল বা তারকা হওয়ার খ্যাতির জন্য লালায়িত ছেলেমেয়ে বাংলাদেশেও অপর্যাপ্ত নয়। যে হারে টিভি চ্যানেল আর মডেল বানানোর হিড়িক পড়েছে, তাতে ক'জন বাঁচতে পারে বিত্তশালী ভোগী পুরুষদের ছড়ানো মায়াবী জাল থেকে? একবার যে এই জালে আটকা পড়েছে, তার জন্য আর জালের বাইরে বেরোনো সম্ভব হয় না। শুধু তা-ই নয়, অনেক মেয়েকে নিজের জীবন দিয়ে এই ভুলের মাশুল গুনতে হয়। তোমাকে একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

সুমাইয়া আজগর রাহা নামের কোনো মডেলকে চেনো তুমি? আচ্ছা, যদি না চিনে থাকো তবে তোমার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি– ২০১৩

সালে বাংলাদেশে রাহা নামের লাক্স সুন্দরী এই মডেল-অভিনেত্রী মাত্র একুশ বছর বয়সে আত্মহত্যা করে মারা যান। কী কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছেন, সে বিষয়ে মিডিয়া মুখ খোলেনি। তবে দুয়েকটি বেরসিক মিডিয়া যা বলেছে তার সারমর্ম হলো, কোনো এক তারকার সঙ্গে পরকীয়া এবং এ-সংক্রান্ত বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদের কারণেই পরে তিনি আত্মহত্যা করেন।

মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে তার মা-বাবা মিডিয়াকে অনেক কিছুই অকপটে বলেছেন মেয়ের অনিয়ন্ত্রিত চলাফেরা নিয়ে। কিন্তু অধিকাংশ মিডিয়াই সেগুলো চেপে গেছে। কারণ, এসব ছাপলে তো মিডিয়ারই ক্ষতি। তারাই তো মডেলদের মডেল বানায়। এখন সেই মডেলের বিশ্রী জীবনাচার যদি পাঠকের সামনে প্রচার করা হয়, তাহলে ভবিষ্যতে ব্যবসা তো লাটে উঠবে!

প্রিয় জাকিয়া–

নিজের হৃদয়টা উদার করে ভাবো একবার, রাহা নামের এই মেয়েটি যদি মডেলিংয়ে না আসতো, তবে কি তাকে এভাবে অকালেই চলে যেতে হতো? সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে তার মা জানিয়েছিলেন, তাদের পরিবারে নামাজ-রোজার বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়। রাহা নিজেও প্রায় নিয়মিত নামাজ পড়তেন।

মিডিয়া হয়তো আরও বহুদিন রাজত্ব করবে এই মায়াময় পৃথিবীতে। সে নিয়ে আমাদের আপত্তি করে লাভ নেই। তোমাকে আমাকে যেটা চিন্তিত করবে, সেটা হলো– মিডিয়ার নগ্ন থাবা এখন কেবল শহুরে ধর্মহীন পরিবারেই সীমাবদ্ধ নেই, তার কুৎসিত থাবা পড়ছে গ্রাম-শহরের ধার্মিক পরিবারগুলোতেও। কারণ, টিভি ও ডিশ কালচার এখন অনেক ধার্মিক পরিবারেও ঢুকে পড়েছে। আর সেই সঙ্গে তরুণ-তরুণীদের মন-মগজে ঢুকে পড়েছে মিডিয়ায় দেখানো তারকাদের আকর্ষণীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু এর আড়ালে তারকাদের যে কদাকার জীবনাচার প্রতিনিয়ত সমাজকে কলুষিত করছে, সে দৃশ্য কখনোই আমাদের মিডিয়ায় দেখানো হচ্ছে না। একেকজন মডেলের আলোকিত মুখচ্ছবির জীবনের আড়ালে কতো কালো অধ্যায় লুকানো থাকে, সে খবর মধ্যবিত্ত পরিবারের

একটি মেয়ে কোনোদিনই জানতে পারে না। সে শুধু স্বপ্ন দেখে– তাকেও হতে হবে মেহ্‌জাবিন, শখ বা পরীমনি।

প্রিয় মারওয়া–

সঙ্গত কারণেই তোমাকে আরও জানাচ্ছি, আত্মহত্যা করা মডেল-অভিনেত্রী সুমাইয়া আজগর রাহা ২০০৭ সালের লাক্স-চ্যানেল আই সুন্দরী প্রতিযোগিতার সেরা দশের একজন। লাক্স-চ্যানেল আই সুন্দরী প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে মডেল উৎপাদনের সবচেয়ে উর্বর জায়গা। নারীকে পণ্য বানানোরও সবচেয়ে বড় প্ল্যাটফর্ম।

এ ধরনের সুন্দরী প্রতিযোগিতার মূল মঞ্চে যাওয়ার আগে 'গ্রুমিং' বলে একটা স্টেপ থাকে, যেখানে নিজেকে পুরুষমানুষের সামনে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের নানা কলা-কৌশল শেখানো হয়। হাসির মাপ কতোটুকু হবে, আবার পার্টিতে যে হাসি হবে বসের সামনে সে হাসি নয়, অন্য হাসি দিতে হবে। কখন দাঁত বের করে হাসতে হবে, কখন দাঁতকে কিঞ্চিৎ উন্মোচন করতে হবে– এসব ভালো করে রপ্ত করতে হয়। রাস্তায় হাঁটলে পায়ের পাতা কীভাবে ফেলতে হবে, র‍্যাম্পে হাঁটলে কীভাবে পায়ের গোড়ালি ঘোরাতে হবে, কতো ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এক পায়ের পর আরেক পা ফেললে শরীরের বিশেষ বিশেষ ভাঁজগুলো পরিস্ফুটিত হবে, আবার মেয়েদের নিতম্বের আকার অনুযায়ী তাদের হাঁটার ধরনও বিভিন্ন রকম হতে হবে...।

এসব 'মহার্ঘ্য' বিদ্যা সুন্দরী প্রতিযোগিতার গ্রুমিং (বাছাইপর্ব) চলাকালে শেখানো হয়। যে যতো নিখুঁতভাবে এসব আত্মস্থ করে পুরুষের সামনে নিজেকে প্রদর্শন করতে পারে, তার মাথায়ই উঠে পুরুষমোহনের জয়টীকা। তার মস্তকে পরানো হয় সুন্দরীশ্রেষ্ঠার ঝলমলে মুকুট। একটি জলজ্যান্ত মেয়েকে পুরুষের জন্য আর কতোভাবে উপাদেয় করলে তাকে ভোগ্যপণ্য বলা যাবে, তুমি বলবে আমাকে?

প্রিয় নাদিয়া–

একটি গোপন তথ্য জানাই তোমাকে। আমেরিকার জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআইয়ের কিছু টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট রয়েছে,

যেগুলো সাধারণত লোকসম্মুখে কখনো প্রকাশ করা হয় না। সেগুলো নিয়ে কিছুদিন আগে 'রিডার ডাইজেস্ট' নামের বিখ্যাত ইংরেজি ম্যাগাজিন একটি প্রতিবেদন ছাপে। সেখানে বলা হয়েছে, হলিউডের তারকাদের জীবনঘনিষ্ঠ এমন কিছু তথ্য এফবিআইয়ের কাছে সংরক্ষিত আছে, যেগুলো তারা কখনো প্রকাশ করেনি, করবেও না হয়তো। কারণ, তারকাদের সেসব গোপন তথ্য এতোটাই নোংরা যে, জনসমক্ষে প্রকাশ করলে ওইসব তারকার ইমেজ বলে কিছু থাকবে না। লোকজন থুতু ছিটাবে তাদের মুখের ওপর।

প্রিয় কানিজ–

তুমি যদিও সাহিত্য খুব একটা ভালোবাসো না, বই পড়তেও তোমার খুব একটা অভ্যেস নেই; তবু সাহিত্য বিষয়ে কিছু না কিছু তো তুমি অবশ্যই জানো। আর যা-ই হোক, বাঙালি বড় বড় সাহিত্যিকদের নাম তো আলবত শুনেছো। এবার তোমার সঙ্গে কথা বলবো আমাদের সেই বাংলা সাহিত্য নিয়ে।

এখানে আমি তোমাকে দেখাবো, সভ্যতার লালিত্য দিয়ে গড়া আমাদের বাংলা 'সাহিত্য' নারীকে কীভাবে উপস্থাপন করেছে। সাহিত্যে নারী থাকবে– এটা অবশ্যম্ভাবী। তুমি কখনো খেয়াল করেছো কি না জানি না, কোনো উপন্যাসের নায়িকাকে আজ অবধি কুৎসিত কালো দেখা যায়নি (ক্ষেত্রবিশেষে ব্যতিক্রম ঘটতে পারে!)। উপন্যাসের নায়ক হোক যেমন-তেমন, নায়িকাকে বিশ্বসুন্দরী হতেই হবে। বাংলা সাহিত্যে আলাওলের 'পদ্মাবতী' কিংবা লাইলি মজনুর 'লাইলি' থেকে শুরু করে হালনাগাদ উপন্যাস-গল্পের নায়িকাদের যে রূপের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তাতে তাদের মানবী ভাবতে কষ্ট হয়। আদর্শ নারী মানেই রূপবতী।

নজরুল তার কবিতায় বলেছেন, 'আমি হতে চাই না একা নারী কারো; এরা দেবী, এরা লোভী' (পূজারিনী)। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা।' তিনি আরও বলেছেন, 'পুরুষ আধিপত্য ছেড়ে দিলেই মেয়ে আধিপত্য শুরু করবে। দুর্বলের আধিপত্য অতি ভয়ঙ্কর (শেষের কবিতা)।' ভাগ্য ভালো, রবীন্দ্রনাথ একশো বছর

আগে এই কথা লিখে গিয়ে বেঁচে গেছেন। এখন বললে নিশ্চয় তার নোবেল প্রাইজ নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে যেতো!

প্রিয় নীলিমা–

তোমাকে শুধু বাংলা সাহিত্যের কথাই বা বলছি কেন, ইংরেজি, স্প্যানিশ, ল্যাটিন, আরবি, উর্দু, ফারসি সব সাহিত্যেই নারী মানেই রূপে-লাবণ্যে অনন্য। গল্প-উপন্যাসের রচনা টেনে নিতে সাহিত্যিকরা বারবার নারীকে বানিয়েছেন গল্পের চালিকাশক্তি। তাকে সুন্দরের অতিকায় নক্ষত্র বানিয়ে পাঠককে উপহার দিয়েছেন টানটান উত্তেজনার উপাখ্যান। ক্লিউপেত্রা থেকে শুরু করে হুমায়ূনের রূপা, ট্রয়ের হেলেন থেকে সুনীলের নীরা– সবাই রূপালি জোসনার মতো রূপবতী। রূপসী ছাড়া আবার নায়িকা হয় নাকি!

সুতরাং আর দশটা গুণের সঙ্গে নারীকে রূপবতী হতেই হবে। তবেই তাকে নিয়ে গল্প-উপন্যাস লেখা সম্ভব। রোমান্টিক কিংবা ট্র্যাজেডি, কমেডি কিংবা স্যাটায়ার– সুন্দরী নারী ছাড়া পাঠক উপন্যাস খাবে কেন? সুতরাং, নারী এখানে সুন্দরীর তকমা গায়ে এঁটে এসে দাঁড়ায় পুরুষের সামনে। তাহলে নারীকে পণ্য বানানোর অপরাধে একজন লেখক কেন অপরাধী হবে না?

এমন প্রশ্ন তুমি নিঃসংকোচে করতে পারো।

প্রিয় ফারিয়া–

বলতে বড় দুঃখ হয় জানো, আমাদের সমাজব্যবস্থাটা একটা দুষ্টচক্রে বাঁধা পড়ে গেছে। কারণ, পুঁজিবাদ এভাবেই আমাদের পণ্য বিকিকিনি শিখিয়েছে। গণতন্ত্র এভাবেই আমাদের ব্যক্তিস্বাধীনতার সাফাই গেয়েছে। আমরা ইচ্ছা করলেও এই পণ্যবিক্রির ভয়াবহ চক্র থেকে বের হতে পারবো না। পুঁজিবাদ যেমন ব্যবসার জন্য নারীকে পণ্য করে বাজারে তুলছে, তেমনি মিডিয়া সেই পণ্য অবলীলায় বাজারজাত করে চলছে হরদম। পুঁজিবাদের ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখতে মিডিয়া যেমন অপরিহার্য, তেমনি মিডিয়াকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে নারীকে পণ্য করার বিকল্প নেই।

তাহলে তুমি কী করবে এখন? আগে পুঁজিবাদ তাড়াবে নাকি আগে মিডিয়ার গলায় শেকল পরাবে? সত্য কথা হলো, কোনোটাই করা যাবে না। কেননা এ দুটোই গণতন্ত্র নামের এক স্বার্থবাদী মতাদর্শ টিকিয়ে রাখার প্রধান হাতিয়ার। গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে হলে পুঁজিবাদ এবং মিডিয়া একে অন্যের পরিপূরক। গণতন্ত্র থাকলে পুঁজিবাদ থাকবে। পুঁজিবাদকে বিকশিত করার জন্য মিডিয়ার মিথ্যাচার অপরিহার্য। আর সেই মিথ্যার অন্যতম উপাদান নারী। তাই একটি পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতিতে নারী পণ্য হবে, এটা সহজ বিষয়। সুতরাং, নারীকে পণ্য বানানোর মূল অনুঘটক কে– সেটা আশা করি আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। গণতন্ত্র নামের এই হারামিতন্ত্র সত্যিকার অর্থেই নারীকে পণ্য বানানোর এক মেশিন ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রিয় স্নিগ্ধা–

হয়তো আমার কথা শুনে হতাশ হচ্ছো। আসলে অতোটা হতাশ হওয়ার কিছু নেই। মিথ্যা ছিলো, সুদূর অতীত থেকেই মিথ্যা, অসত্য, অন্যায় এ পৃথিবীতে বন্যার প্লাবনের মতো ধেয়ে এসেছে। তাই বলে কি সত্য ও ন্যায় কখনো বিলুপ্ত হয়ে গেছে? না, মোটেও না। বরং মিথ্যা যতো প্রবল হয়েছে, সত্য ততোটাই হয়েছে দৃঢ় ও শক্তিশালী। হোক সেটা সংখ্যায় কম, কিন্তু সত্যের দৃঢ়তার সামনে মিথ্যা সবসময়ই পরাভূত হয়েছে। তাই হতাশ হয়ো না। নিজের বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বান করে যাও, হেদায়েত একদিন আসবেই। আর হেদায়েতের মালিক তো আল্লাহ, তিনিই সিদ্ধান্ত নেবেন– কে হেদায়েত পাবে আর কে পাবে না।

প্রিয় আবিদা–

এবার সত্যি সত্যি কিছু ক্ষোভের কথা বলবো। এ কথাগুলো যখন ভাবি, তখন সত্যিই মনের মধ্যে অনেক ক্ষোভ জমা হয়। এই পুঁজিবাদী করপোরেট দুনিয়া কীভাবে আমাদের বোকা বানিয়ে তাদের ব্যবসা বাগিয়ে নিচ্ছে, কীভাবে তোমাকে-আমাকে পণ্য বানিয়ে সেই পণ্য আবার আমাদের কাছেই বিক্রি করছে, সেটা আজ তোমাকে একদম হাতেনাতে ধরিয়ে দেবো। দেখলে তোমার মাথাও ঠিক থাকবে না।

ধরো, গোসলের সময় তোমাকে সাবান মাখতেই হবে। ফ্রেশ গোসলের জন্য। গোসলের পর শরীরটা বেশ চনমনে লাগবে, এ কারণে। এতে শরীরের ত্বকের উজ্জ্বলতাও বাড়বে। রূপে স্নিগ্ধতা আসে। মুখে লাবণ্য আসবে। সোনার মতোন রং হবে শরীরের। যে কেউ একবার তাকালে চোখ ফেরাতে পারবে না।

বুঝতেই পারছো– তোমার সামনে সাবানের বিজ্ঞাপন দিচ্ছি। তুমি তো জানোই, সাধারণত বিউটি সোপগুলো ব্যবহার করলে আমাদের ত্বক ও চেহারার এ ধরনের উপকারিতা অনিবার্য। কেননা সারাজীবন টিভি, পত্রিকা, বিলবোর্ড, ইন্টারনেটের বিজ্ঞাপনে এমনই দেখে আসছি। সব ব্র্যান্ডই এ কথা বলে আসছে– বিউটি সোপ দিয়ে নিয়মিত গোসল করলে স্বপ্নীল সৌন্দর্য হাতের নাগালে। মুখের সমস্ত মলিনতা চলে গিয়ে তকে দেখা দেবে ঝকঝকে জেল্লা। বেশ বেশ... তাই না?

প্রিয় সারা–

তাহলে ধরা যাক মাল্টিন্যাশনাল প্রসাধনী কোম্পানি ইউনিলিভার (Unilever)-এর কথা। তারা লাক্স সাবান বিক্রির জন্য এমন অ্যাড অহরহ প্রচার করে আসছে– লাক্স মানেই ঐশ্বরিয়া, দীপিকা, ক্যাটরিনা, প্রিয়াঙ্কা, মেহজাবিন, অপির মতো নজরকাড়া সৌন্দর্য। একটুখানি লাক্স, ব্যস... মেয়ে তোমার কেল্লা ফতে! সোনার মতো ঝলমলে ত্বকে তুমি হয়ে উঠবে অনন্যা। লাক্স সাবানের নিয়মিত স্পর্শে মসৃণ কোমল ত্বক হবে তোমার।

কিন্তু তাদের ফাজলামোটা দেখো, ফেসওয়াশ বিক্রির বিজ্ঞাপনে আবার তারাই বলছে– সাবানের ক্ষার মুখের ত্বকের জন্য ক্ষতিকারক!

তাহলে সুন্দর হওয়ার জন্য কী করতে হবে? ব্যবহার করতে হবে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি (Fair and Lovely) ফেসওয়াশ। গোসলের আগে-পরে ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুতে হবে দিনে তিনবার। তাহলে ত্বক হবে তুলতুলে, মুখের মলিনতা দূর হয়ে যাবে, কোনো ভাঁজ থাকবে না মুখের ত্বকে, চেহারা সুন্দর হবে, ছেলেরা চোখ ফেরাতে পারবে না। বেশ ভালো কথা, কিনতে হবে একটা ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি ফেসওয়াশ।

প্রিয় তাসনুভা–

তোমার রূপবতী হওয়াটা এতো সহজ নয়। রূপে নজরকাড়া জাদু আনার জন্য ফেসওয়াশ যথেষ্ট নয়। ছেলেদের উষ্টা খাওয়ার মতো রূপের জন্য দরকার ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি ক্রিম। এই বিউটি ফেয়ারনেসসমৃদ্ধ ক্রিম মাখলে চেহারা সুন্দর তো হবেই, আপকামিং বিয়েটাও কেউ ঠেকাতে পারবে না। পাড়ার ছেলেরা ঠাস ঠাস চিঠি পাঠিয়ে আত্মহত্যার হুমকি দেবে।

কিন্তু আমি সম্ভবত তবু তোমার রূপ ঝলসানো মুখটা দেখতেই পারবো না। কেননা তোমার চমকানো রূপের সাধ পূরণ হতে দিচ্ছে না ইউনিলিভার বা এমন ব্র্যান্ডগুলো। তারা আবার আরেক বিজ্ঞাপনে বলছে, রাসায়নিক কেমিক্যাল দিয়ে বানানো ক্রিমগুলো ত্বকের ক্ষতি করে বহুত। তোমাকে ব্যবহার করতে হবে আয়ুর্বেদিক ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি। এটা সম্পূর্ণ ভেষজ উপায়ে তৈরি! প্রাকৃতিক গুণে ভরা এ ক্রিম তৈরি করা হয়েছে কেবল তোমার কথা চিন্তা করেই। এটা ব্যবহার করলে ত্বকের কোনো ক্ষতি হবে না। বাড়তি পাওনা হিসেবে– ত্বক বলিউডের নায়িকাদের মতো সুন্দর না হয়েই যায় না!

প্রিয় আইরিন–

আমি খুবই দুঃখিত! চার প্রকারের চার প্রস্থ প্রসাধনী নিশ্চিত করার পরও আমি তোমার সুন্দরী হওয়ার সাধ পূরণ করতে পারছি না। তুমি তো জানোই, আমাদের দেশ ষড়ঋতুর দেশ। এ কারণে শীতের দিনের জন্য কেবল এগুলো ব্যবহার করলেই হবে না, শীতের জন্য রয়েছে আলাদা প্রসাধনী। ব্যবহার করতে হবে পন্ডস কোল্ড ক্রিম, ত্বকের শুষ্কতা থেকে বাঁচতে দরকার লোশন কিংবা ভ্যাসলিনের মতো অন্য প্রসাধনী। গরমের রুক্ষতা থেকে বাঁচতে তোমাকে ব্যবহার করতে হবে আবার অন্য রকম আরেক প্রস্থ ক্রিম। তাছাড়া রাতে ঘুমানোর আগে তোমার জন্য রয়েছে আলাদা ময়েশ্চারাইজার ক্রিম। ঘুম থেকে উঠে পেঁপের প্রাকৃতিক গুণে ভরা অন্য আরেক প্রস্থ ফেসওয়াশ। আবার তারা হাত ধোয়ার জন্য নিয়ে এসেছে আরেক ধরনের সাবান। সাধারণ সাবানে হাত ধুলে রোগ-জীবাণুদের নাকি কিচ্ছুটি হয় না!

প্রিয় মুনিরা–

এবার তুমি ঠান্ডা মাথায় ভেবে আমাকে বলো– মানে কী এসবের? মানুষের টাকা কি বাড়ির পেছনের গাছে ধরে? একই কোম্পানি প্রতিটি প্রসাধনী প্রোডাক্টের ব্যাপারে বলছে– সুন্দর হওয়ার জন্য এটাই আখেরি কথা! আবার আরেক প্রোডাক্টের জন্য বলছে– সুন্দর রং ফরসা করার জন্য বিশ্বের ১ নম্বর ক্রিম। বিফলে ১ লাখ টাকা বাজি!

মিথ্যা কথার একটা লিমিট থাকা দরকার। তারা নিজেরাই তো নিজেদের প্রোডাক্টের বিরুদ্ধাচারণ করছে। নিজেদের প্রোডাক্টকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে টিভিতে অ্যাড দিয়ে। তাদের এক পণ্য অন্য পণ্যের বিরুদ্ধে কথা বলছে। আমরা গড়গড় করে সেগুলো গিলে বারোটা বাজাচ্ছি নিজেদের চেহারা ও ত্বকের।

আমার কথা কি তুমি বুঝতে পারছো, কী বলতে চাচ্ছি আমি? মেয়ে, বিজ্ঞাপনের ঝলমলে আলোয় যা দেখো তার প্রায় সবটুকুই মিথ্যা। আরেকটু সাবধান হও, আরেকটু বাস্তববাদী হও। মিথ্যা ওই পৃথিবীকে বিশ্বাস করে নিজের বিশ্বাসের অবমূল্যায়ন কোরো না। নিজের বিশ্বাসকে এতো সস্তা দরে বিকিয়ে দিয়ো না।

প্রিয় মরিয়ম–

এ তো গেলো তোমার রূপচর্চার প্রসাধনী উপাখ্যান, তোমার লম্বা উজ্জ্বল চুলের জন্যও রয়েছে নানা দাওয়াই। উজ্জ্বল ঝলমলে চুলের জন্য শ্যাম্পুই যথেষ্ট? উঁহু, শ্যাম্পুর পর দরকার হবে কন্ডিশনার। এরপর তোমাকে এক প্রস্থ তেল ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু কোম্পানি বলছে, চুলে তেল দেয়ার আগে মেখে নিন আরেকটি প্রসাধনী (আমি এর নামটাও জানি না, তবে মাখতে হয়- এটা জানি), তারপর তেল। বুঝো অবস্থা!

আবার দেখো, ছেলেদের চুলের জন্য তেল ব্যবহার করা যাবে না, ব্যবহার করতে হবে জেল। সুতরাং, রেশম কালো স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চুলের জন্য আমাকে যেতে হবে চার কিসিমের প্রসাধনীর নিচ দিয়ে। চুল নষ্ট হওয়ার জন্য আর কী দরকার? চার ধরনের প্রসাধনী মানে চুলে চারবার কেমিক্যাল ব্যবহার করা। চারবার কেমিক্যাল দিলে চুল তো আর চুল থাকার কথা না! চুল এমনিতেই ঝরে যাবার কথা!

প্রিয় মোনা–

একবার ভাবো, এই যে মিথ্যার দুনিয়ায় তুমি-আমি বসবাস করছি, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো দিনভর মিথ্যা কথা দিয়ে আমাদের পকেট থেকে খসাচ্ছে টাকা; তারা এর বিনিময়ে আমাদের উপহার দিচ্ছে কেবল জীবনবিধ্বংসী কিছু উপাদেয় কেমিক্যাল, আর কিছুই না। এসব ক্ষতিকর কেমিক্যালসমৃদ্ধ প্রসাধনী বিক্রি করতেই তারা কোটি কোটি টাকা খরচ করে টিভিতে বিজ্ঞাপন দেয়। মডেলদের মুখে তুলে দেয় ভুবনমোহিনী হাসি আর মিষ্টি বুলি। তুমি তাদের সেই মিষ্টি বুলি গিলেই মনে করো– আমি পাইলাম, আমি তাহাকে পাইলাম!

প্রিয় শাকিলা–

তুমিও শুনে থাকবে হয়তো, আমাদের বিএসটিআই নামে একটা প্রতিষ্ঠান আছে বলে শুনেছি। যাদের কাজ হচ্ছে বাংলাদেশে উৎপাদিত, বিক্রীত, প্রচারিত প্রতিটি পণ্যের মান বিচার করা। তাদের উচিত– বিজ্ঞাপনে কোম্পানিগুলো যে স্লোগান, গান, বক্তব্য প্রচার করে সেগুলোর সত্যতা যাচাই করা। সত্যতা নিশ্চিত না হলে এসব পণ্যের উৎপাদন, বাজারজাত, বিক্রি বন্ধ করে কোম্পানিগুলোকে আইনের আওতায় আনা। চরিত্র পরিবর্তন না হলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাদের এ দেশ থেকে বের করে দেয়া! ফাজলামির একটা সীমা থাকা দরকার!

বাংলাদেশের মতো গরিব দেশে আটা-ময়দা-সুজি দিয়ে বানানো যাচ্ছেতাই ক্রিম বা প্রসাধনী বানিয়ে তারা নির্দয়ভাবে লুটে নিচ্ছে গরিব মানুষের টাকা। এ ব্যাপারে সরকার তো নয়ই, সুশীল সমাজ বা সচেতন শিক্ষিত মহলও কোনোদিন কোনো উচ্চবাচ্য করতে নারাজ। কেননা তারাও তো এদের টাকা দিয়েই রুটিরুজি করে।

প্রিয় মাহবুবা–

তুমি এতোক্ষণ ধরে আধুনিক নারীদের ব্যাপারে আমার নানাবিধ রটনা শুনে হয়তো খানিকটা ঘাবড়ে গেছো। মনে মনে ভাবছো, এভাবে ছাল বাছতে গেলে তো কম্বল উজাড় হওয়ার জোগাড় হবে। এক অর্থে তোমার এ চিন্তা একেবারেই অসত্য নয়।

ভেবে দেখো, আজ থেকে এক হাজার বছর আগেও এ পৃথিবীতে সুন্দরী নারীরা ছিলো। তারাও রূপচর্চা করতো। তবে এমন কেমিক্যালসমৃদ্ধ প্রসাধনী দিয়ে নয়। প্রাকৃতিক উপায়েই তারা সৌন্দর্যচর্চা করতো। তাই বলে মুখে শসা, মসুরের ডাল আর মুলতানি মাটি মেখে সঙ সেজে বসে থাকার কথা কিন্তু আমি বলিনি!

তোমার সচেতনতার জন্যই বলছি, এতো এতো প্রসাধনী মেখে নিজের স্বরূপ সৌন্দর্যকে নষ্ট কোরো না। এক প্রস্থ প্রসাধনী মানেই এক প্রস্থ কেমিক্যাল, যা তৈরি করা হয়েছে কয়েক ধরনের রাসায়নিক উপাদান দিয়ে। এসব তোমার সত্ত্বাগত সৌন্দর্যকে বাড়ানোর বদলে ক্ষতি যে করবে, সে ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো।

বিজ্ঞাপনের মিথ্যা আশ্বাসে কখনোই বিশ্বাস কোরো না। তারা তাদের পণ্য বিক্রি করে ব্যবসার ধান্দায় আছে। তোমার সৌন্দর্য বাড়ানোর মহৎ কাজে সময় নষ্ট করতে তারা কোটি কোটি টাকার বিজ্ঞাপন দেয় না। তাদের প্রতিটি বিজ্ঞাপন মানেই হচ্ছে– তোমার পকেট থেকে এক তোড়া টাকা খসিয়ে নেয়া। তা সেটা যেভাবেই হোক!

আশা করি আমাকে ভুল বুঝবে না।

মেয়ে, এই অভিধা তোমার

প্রিয় রুকাইয়া–

একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা শেয়ার করি তোমার সঙ্গে। আশা করি, এ অভিজ্ঞতা থেকে তুমি অনেক কিছুই জানতে পারবে। সমাজের যুবক-যুবতীরা কীভাবে নিজেদের জীবনকে কলুষিত করছে, কীভাবে তারা অভব্যতা দিয়ে নিজেদের উপস্থাপন করছে সবার সামনে– তার একটা সঠিক চিত্র তুমি পাবে এ ঘটনা থেকে।

সেদিন পল্টন থেকে গাবতলী আসছিলাম। বিআরটিসির দোতলা বাসে চড়েছি। দোতলা বাসে ওঠা মানে দোতলায় বসা, ভিড় কম থাকে। সেদিনও ভিড় কমই ছিলো, তবে শাহবাগের পর এসে ভিড় বাড়তে লাগলো।

আমার সামনের সিটটা খালিই ছিলো এতোক্ষণ। কাওরান বাজার থেকে এক জোড়া যুবক-যুবতী উঠে সিটটায় বসে পড়লো। ছেলেটা লম্বা তবে যথেষ্ট কালো। মুখে ব্রণের দাগ। মেয়েটার চেহারা দেখিনি তবে একটু খাটোর দিকে এবং একটু মোটাও, পেছন থেকে দেখে তা-ই মনে হলো। যাক, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমার কাজ নিরুপদ্রবে বাড়ি ফেরা।

প্রিয় লাবিবা–

কিন্তু আমার যাত্রা আর নিরুপদ্রব রইলো না। সামনে বসা যুবক-যুবতী সিটে বসার পর থেকেই নানা অসভ্যতা শুরু করে দিলো। তাদের সে অসভ্যতা দেখে বমি আসতে চাইলো। যুবকটি বারবার মেয়েটির শরীরের নানা জায়গায় হাত দিচ্ছে, কখনো জড়িয়ে ধরছে, কখনো মাথা টেনে বুকে নিচ্ছে, মেয়ের খিলখিল হাসি... কী অবস্থা!

তাদের এমন অসভ্যতা দেখে নিজেই নিজের কাছে লজ্জা পেলাম। চোখ তুলে তাকাতে পারছিলাম না সামনের সিটের দিকে। বাইরেও বেশিক্ষণ তাকানো যায় না, জ্যামের মধ্যে একদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে ঘাড় ব্যথা করে। কিছুক্ষণ নিচের দিকে তাকাই, কিছুক্ষণ বাইরে। অথচ তারা ছিলো নির্বিকার। নিজেরা নিজেদের নোংরামি করেই যাচ্ছে।

প্রিয় টুনি–

এমন যদি হতো, ছেলেটি মেয়েটির অনিচ্ছায় তার শরীরে হাত দিচ্ছে- তাহলে হয়তো এটাকে নারী নির্যাতন বলা যেতো বা দৈহিক ইভটিজিং বলা যেতো। কিন্তু মেয়েটি ছেলেটির কার্যকলাপে বেশ আমুদই পাচ্ছিলো মনে হয়। হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ছিলো ছেলেটির গায়ে। নানারকম নখরা করছিলো দুজনে মিলেই।

যদি তারা স্কুলের টিনএজ পোলাপান হতো, যৌনতা বিষয়ে যারা অদম্য কৌতূহলী, তাহলেও একটা কথা ছিলো। কিন্তু এ যুবক-যুবতী মোটেও টিনএজ ছিলো না। দুজনের বয়সই ২৪-২৫-এর কম হবে না। তার ওপর তাদের দেখে কোনো ভার্সিটি বা কলেজের স্টুডেন্টই মনে হয়েছে। হাতে বই-কাগজ ছিলো। একদম যে লোয়ার লেভেলের ছেলেমেয়ে বা নিম্নবিত্ত পরিবারের, তাদের দেখে তা মনে হয়নি। পোশাক-আশাকে দুরস্তই মনে হলো। ভদ্রগোছের চেহারা-সুরত।

প্রিয় রেহনুমা–

তাদের এমন অভদ্র আচরণ দেখে আমি ভেবে পেলাম না, লোকসম্মুখে তারা এসব কীভাবে করতে পারে! সাধারণ একটা চক্ষুলজ্জা তো থাকবে। শিক্ষিত ছেলেমেয়ে, তাদের দ্বারাই যদি এমন অভব্য কাণ্ড হয়, এ বাংলাদেশে বস্তির লোকদের নির্লজ্জতার জন্য দোষ দিই কোন আক্কেলে?

আরেকটা বিষয় দেখে আমি হতবাক হলাম, তাদের চারপাশের প্রতিটা সিটে লোক বসে আছে। দাঁড়িয়েও আছে অনেক লোক। এমনকি তাদের ঘাড়ের ওপর দু-তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। সেদিকে তাদের

কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। বিআরটিসির দোতলা বাস মাত্রই প্লাস্টিকের স্লিম সিট। এগুলো ওপরের দিকের আয়তনও কম হয়। অন্যান্য বাসের মতো গদিমোড়া নয় যে চিপায়-চাপায় হাতাহাতি করবে...। আশপাশের সিটের সবাই এবং যারা দাঁড়িয়ে আছে, তারাও এই যুবক-যুবতীর নখরামি দেখছে। তাদের নির্লজ্জতা দেখে না কিছু বলতে পারছি না সইতে পারছি। অন্যদেরও একই অবস্থা।

তারা দুজন ছাত্র বলে সাধারণ মানুষও কিছু বলছে না। কেননা বাংলাদেশে ভার্সিটির ছাত্রদের দু'কথা বলতে যাওয়া মানেই তো রাস্তায় দশ-পনেরোটা গাড়ি ভাঙচুর, নয়তো চোখের সামনেই অপমান! কে আর নিজের খেয়ে ডেকে আপদ গলায় ঝোলাতে যায়! এসব অভদ্র যুবক-যুবতী সমাজের একটা আপদেই রূপ নিয়েছে।

মেয়েটির জন্য আমার করুণাই হলো- আহা! নিজেকে কেমন সস্তায় বিকিয়ে দিচ্ছে লালাতুর ছেলেদের কাছে। তা-ও এমন নির্লজ্জভাবে!

প্রিয় ডলি–

তোমার যে প্রেমিক রিকশায় বসে সুযোগ পেয়েই হুড তুলে তোমার শরীরে হাত দিচ্ছে– মনে রেখো, সে এ কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। পূর্বের সম্পন্ন অভিজ্ঞতা ছিলো বলেই আজ সে নির্দ্বিধায় তোমার দিক হাত বাড়াতে সাহস পেয়েছে। কাল সে আরও সাহসী হবে, কাল তোমার অগোচরে রিকশার হুড তুলে আরেকজনের শরীরে হাত দেবে।

প্রিয় তান্নি–

আজ যে ছেলে বাসে বসে সবার সামনে তোমার শরীরে হাত দিচ্ছে, তার চারিত্রিক ওজনটা তোমার সাধারণ বিচার-বুদ্ধি দিয়ে মেপে দেখো। চরিত্রের পাল্লায় তাকে একজন চরিত্রহীন ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না। এমন একজন চরিত্রহীনের সঙ্গে নিজের জীবন কোন সাহসে জড়াবে, সে প্রশ্ন তোমার কাছেই তোলা রইলো।

প্রিয় মুক্তা–

যে ছেলে ঝোপের আড়াল পেলেই কামতাড়িত হয়ে তোমার শরীরে হামলে পড়ে, তাকে তুমি প্রেমিক বলো কীভাবে? সে তো কামতাড়িত একটা পশুমাত্র। সে বারবার শুধু ঝোপ খুঁজে বেড়াবে, কখনো ঘর-সংসার খুঁজবে না।

প্রিয় শান্তা–

যে ছেলেকে আজ জীবনের 'একমাত্র পুরুষ' বলে বিশ্বাস করে সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়ার 'মহান উদারতা' দেখাচ্ছো, একবার কি ভেবেছো সেই ছেলে তোমাকে কী ভাবছে? সে তোমাকে একটা সস্তা, চাইলেই পাওয়া যায়, কামনা মেটানোর সহজ মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই ভাবছে না।

প্রিয় সাথী–

পুরুষ 'জিনিসটা' স্বামী হিসেবে তুমি যা ইচ্ছা তা-ই তাকে তৈরি করতে পারো, কিন্তু প্রেমিক হিসেবে তাকে একজন কামপাগল ছাড়া আর কিছুই বানাতে পারবে না। কারণ, সে তোমার শরীর আর রূপ-লাবণ্য দেখে তোমার প্রেমে পড়েছে, তোমার 'তুমি'কে দেখে নয়।

প্রিয় লিলি–

একজন যুবক অগণিত নারীকে নষ্ট করলেও, কিশোরী মেয়েকে ধর্ষণ করলেও, অনেক নারীর সঙ্গে পাপাচার করলেও আমাদের জালেম সমাজ তাকে একদিন ক্ষমা করে দেবে। সমাজ বলবে, একটি যুবক পথহারা ছিলো, সে সুপথে ফিরে এসেছে। এই অজুহাতে সে সমাজের কাছে সাদরে গৃহীত হবে এবং সকলেই তাকে স্নেহে, ভালোবাসায় গ্রহণ করে নেবে। একদিন হয়তো সে সমাজের সবচেয়ে সম্মানের আসনটায় বসার মতো ফেরেশতা চরিত্রের অধিকারীও হয়ে যেতে পারে। তার পিতা সমাজে গর্বে মাথা উঁচু করে হাঁটতে পারবে।

প্রিয় লিপি–

আর তুমি? একবার নিজের সতীত্বে স্খলন ঘটলে– অপমানিত, লাঞ্ছিত, অস্পৃশ্য হয়ে চিরদিন পড়ে থাকবে অন্ধকারের ঘিঞ্জি গলিতে। শুধু একবার তোমার সতীত্বের স্খলন ঘটলে– তোমার জালেম সমাজ কোনোদিন তোমাকে ক্ষমা করবে না। তোমার তওবা করুণাময়ের কাছে গৃহীত হতে পারে; তোমার সমাজের কাছে নয়, তোমার পরিবারের কাছে নয়। তোমার প্রতিবেশী প্রতি রাতে তোমাকে একজন দুশ্চরিত্রা ভেবে ঘুমাতে যাবে। তোমার বন্ধুরা তোমাকে একজন সস্তা মেয়ে মনে করে আড়ালে-আবডালে কানাঘুষা করবে। তোমার আদরের ভাইটি কোনোদিন মাথা উঁচু করে মানুষের সামনে কথা বলতে পারবে না।

তোমার সতীত্ব এমনই স্পর্শকাতর! এমনই অমূল্য!

রঙিন দুনিয়ার হাতছানি
'মডেলিং হইতে সাবধান'

প্রিয় সওদা–

মনে মনে কল্পনা করো– তুমি একটা বিলাসবহুল হলরুমে বসে আছো। তোমার আশপাশে বসে আছেন দেশের নামীদামি অনেক লোক। কেউ কোনো কথা বলছেন না, মৃদু ফিসফাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে শুধু। একরকম পিনপতন নীরবতা।

একটু পর– হলরুমের ভেতরের নানা রঙের বাতিগুলো নিভে যাচ্ছে একটা একটা করে। স্টেজ ও স্টেজের সামনে সাজানো রানওয়ের নিচ থেকে উঠে আসছে বাহারি রঙের আবছা আলো আর কৃত্রিম মিহি ধোঁয়া। অফট্র্যাকের মৃদুমন্দ মিউজিক বাজছে ব্যাকগ্রাউন্ডে। ধীরে ধীরে পর্দা উঠছে স্টেজের। পর্দা ওঠার তালের সঙ্গে মিল রেখে বাড়ছে মিউজিকের লয়। রানওয়ের তিন পাশে বসে থাকা দর্শকদের হার্টবিটও বেড়ে যাচ্ছে সেই সঙ্গে।

আচমকা ড্রামের বিটের সঙ্গে সঙ্গে পুরো স্টেজ ভরে গেলো কৃত্রিম ধোঁয়ায়। একসঙ্গে স্টেজ আর রানওয়েজুড়ে ছড়িয়ে পড়লো নীলাভ আলো-আঁধারি। সেই আলো-আঁধারি আর ধোঁয়াশা ভেদ করে স্টেজের পেছন থেকে আলতো পদক্ষেপে রানওয়ে বরাবর হেঁটে আসছে এক সুন্দরী তরুণী। তার চলার ভঙ্গিতে কাঁপছে আলোর নাচন।

রানওয়ের দিকে তাকিয়ে থাকা দর্শকদের উত্তেজনার পারদ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সুন্দরীর পদক্ষেপের সঙ্গে। স্টেজের পেছন থেকে বেরিয়ে আসছে আরো কিছু তরুণী। তারা নানা কমনীয় ভঙ্গিমায় হেঁটে

এসে একটু সময়ের জন্য দাঁড়াচ্ছে রানওয়ের শেষ প্রান্তে। দর্শকদের দিকে বুনো হাসিসমেত এক পলকের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আবার ফিরে যাচ্ছে স্টেজের পেছনে। একটু পর আবার ফিরে আসছে ভিন্ন পোশাকে, ভিন্ন সাজে, ভিন্ন হেয়ার স্টাইলে...।

প্রিয় তাসলিমা–

কিছু কি বুঝতে পারলে? জানি, আমার বর্ণনা শুনেই তুমি বিষয়টি বুঝে ফেলেছো আমি কিসের ধারাবিবরণী দিচ্ছি। তোমার ধারণাই ঠিক– ফ্যাশন শো বলতে যে চিজ আমাদের কুলীন সমাজে সদ্য সংযোজিত হয়েছে, এ দৃশ্যকল্প সে ফ্যাশন শোরই একটি খণ্ডচিত্র। ফ্যাশন শো বলতে আমরা আমজনতা যা বুঝি– পোশাক প্রদর্শনী। কিন্তু এসব অনুষ্ঠানে পোশাক প্রদর্শনীর নামে আসলে কী প্রদর্শন হচ্ছে, সেটা গবেষণার দাবি রাখে। কারণ, ফ্যাশন শো নামে র‌্যাম্প মডেলরা যেসব পোশাকের প্রদর্শনী করেন, সেগুলো বাংলাদেশের মেয়েরা আদৌ পরেই না, মূলত সেগুলো পৃথিবীর কোথাও পরা হয় না।

এখন তুমি প্রশ্ন করতে পারো– তাহলে এ ফ্যাশন শো জিনিসটা কেন নাজিল হয় বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশে? যে দেশের ৩০% মানুষ এখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে, পেট চালানোর জন্য যে দেশে নিজের সন্তান বিক্রি করতে বাধ্য হয় অভাবী মা, অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয় দরিদ্র কৃষক; সে দেশে ফ্যাশন শোর নামে এমন কুলীন সংস্কৃতি কী ফায়দাটা আমাদের দেবে? এমন প্রশ্ন করাটা একজন দেশপ্রেমিক বাঙালি হিসেবে তোমার জন্য মোটেও অন্যায় কোনো আচরণ নয়।

প্রিয় জুলিয়া–

যেমনটি তোমাকে বলছিলাম– বর্তমানের ফ্যাশন শোর মূলমন্ত্রটা কখনোই পোশাককেন্দ্রিক নয়। পোশাকের অনুষঙ্গটা এখানে কেবল শরীর প্রদর্শনের একটা বাহানামাত্র। কেননা পশ্চিমা বিশ্বে অধিকাংশ ফ্যাশন শোই হয় স্বল্পবসনের অন্তর্বাস প্রদর্শনী। বাংলাদেশে অতোটা না হলেও সম্প্রতি একটি ফ্যাশন শোতে দর্শক হিসেবে ছিলেন এমন এক

পরিচিতজন মন্তব্য করেছেন, মিডিয়ায় যে ফ্যাশন শোর সংবাদ বা ছবি আসে, সেগুলো মূলত আইওয়াশ। সাধারণ দর্শকদের জন্য মোটামুটি ধরনের পোশাক পরে মডেলরা র‍্যাম্পে হাঁটলেও গভীর রাতে চলে প্রায় নগ্ন দেহের শো। সেগুলো সাধারণ দর্শকদের জন্য নয়, কেবল সমাজের উঁচুমহলের লোকজন সেখানে আপ্যায়িত হন। তারা কতোটা উঁচুমহলের? এমন প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এতো উঁচু যে মানুষ তাদের দিকে বাঁকা চোখে তাকাতে ভয় পায়।

প্রিয় তাকরিমা–

দাসপ্রথার ব্যাপারে তো তুমি শুনে থাকবে নিশ্চয়। প্রাচীনকালে যখন দাস-দাসী ব্যবসা বৈধ ছিলো, তখন দাস-দাসী কেনাবেচার জন্য শহরে আলাদা বাজার থাকতো। এসব দাসবাজারে বিক্রির জন্য সুন্দরী দাসীদের নিলামে তোলা হতো। দাসীদের নিলামে তোলার জন্য সেখানে আলাদা মঞ্চ থাকতো। দাসবিক্রেতারা তাদের সুন্দরী দাসীদের সেই মঞ্চে উঠিয়ে দিতো তাদের দাম হাঁকানোর জন্য। নিলামকারী জোরে হাঁক দিয়ে তাদের দাম বলতো আর আগ্রহী ক্রেতা মঞ্চে উঠে দাসীদের শরীরের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরখ করে তাদের দাম নির্ধারণ করতো।

পোশাক প্রদর্শনীর নামে দেহ প্রদর্শনের বর্তমান ফ্যাশন শোগুলোও যেনো সে দাসবাজারেরই নমুনা। মডেলদের সাজিয়ে তোলা হয় র‍্যাম্পে, তারা রানওয়ে ধরে হেঁটে প্রদর্শন করে তাদের দেহবল্লরী। যার হাঁটা যতো ঢেউতোলা, যার চোখের চাহনি যতোটা পুরুষভেদী, যার কোমরের স্ফীতি যতোটা সুডৌল–তার জন্যই নিলামে দর ওঠে হড়হড় করে। এ বাজারে আগ্রহী ক্রেতার অভাব বাংলাদেশে কোনোদিনই ছিলো না।

একটা মজার বিষয় শোনো– কিছুদিন আগে মাদকবিরোধী এক অনুষ্ঠানেও দেখা গেলো ফ্যাশন শো নামক এ কিম্ভূত সংস্কৃতির উপস্থিতি। মাদকবিরোধী আলোচনা শেষে দর্শকদের জন্য আয়োজন করা হয়েছিলো ফ্যাশন শোর। এটা দেখে অনেকেই মন্তব্য করেছেন, মাদকের নেশা থেকে মানুষকে উলঙ্গ নারীর নেশায় উত্তরণের চেষ্টা আর কি! সুতরাং, আমি তোমাকে প্রশ্ন করতেই পারি– দুটোর মধ্যে কোনটা বেশি ক্ষতিকর?

প্রিয় পারভীন–

কোনো কথা বোলো না। আমি বাংলাদেশি এক নারী মডেলের কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি। কোনো কথা না বলে তার কথাগুলো শোনো আগে।

'...প্রতিযোগিতার এক পর্বে বিকিনির (অন্তর্বাস) মতো স্বল্পবসনে ফটোসেশনের প্রস্তাব দেয়া হয় আমাকে। এ ফটো দিয়ে নাকি কোন এক ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ করা হবে। আমি সে খোলামেলা সেশনে অংশ নিতে আপত্তি জানালে আমার সঙ্গে ভীষণ দুর্ব্যবহার করা হয়।...'

'আমাদের নিরাপত্তার জন্য চুক্তি অনুযায়ী যে রকম মানসম্পন্ন হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করার কথা ছিলো, তা-ও করা হয়নি। এমন এক হোটেলে আমাদের রাখার ব্যবস্থা করা হয়, যেখানে 'অসামাজিক কর্মকাণ্ডের' স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিলো। এমনকি আসা-যাওয়ার পথে সে হোটেলে আসা খদ্দেরদের অশ্লীল ইশারায় আমাদের বিব্রত হতে হয়েছে।...'

'কলকাতায় এ প্রতিযোগিতার মেকআপম্যান পর্যন্ত প্রতিযোগীদের সঙ্গে আপত্তিজনক ব্যবহার করেছে। ইভেন্ট আয়োজকদের কেউ কেউ বোঝাতে চেয়েছে, যে নিজেকে যতো উজাড় করে দেবে তার স্কোরিং ততো বেশি হবে। সবচেয়ে আপত্তির বিষয় ছিলো, মেয়েদের পোশাক পরানোর জন্য সেখানে রাখা হয় পুরুষ ড্রেসম্যান। এ বিষয়টি নিয়েও আমার সঙ্গে আয়োজকদের বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। সব মিলিয়ে একপর্যায়ে ওই পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে না পেরে গ্র্যান্ড ফিনালেতে অংশ না নিয়েই দেশে ফিরে আসি।...'

প্রিয় আকলিমা–

তুমি যদি নিয়মিত পত্রিকা পড়তে তাহলে হয়তো এ বক্তব্য তোমার চোখ এড়িয়ে যেতো না। সে সময় বেশ আলোচিত হয়েছিলো এ বক্তব্য। যেহেতু বিষয়টি তোমার চোখ এড়িয়ে গেছে, এ কারণে বিষয়টি তোমাকে একটু খোলাসা করেই বলি।

এ বক্তব্য যে তরুণীর, তার নাম আনহা আমিন। ২০১৩ সালের ২৮ জুলাই বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের নারীদের নিয়ে কলকাতার নেতাজি

ইনডোর স্টেডিয়ামে 'মিস অ্যান্ড মিসেস অদ্বিতীয়া' নামে একটি সুন্দরী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার 'অদ্বিতীয়া' নামের একটি ফ্যাশন ম্যাগাজিনের সম্পাদক কেয়া শেঠ বাংলাদেশ-কলকাতার নারীদের নিয়ে এই সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। বাংলাদেশে এর মিডিয়া পার্টনার ছিল বৈশাখী টেলিভিশন। সে প্রতিযোগিতায় রানারআপ হওয়া বাংলাদেশি সুন্দরী আনহা আমিন মূল অনুষ্ঠানের গ্র্যান্ড ফিনালের দুদিন আগেই কলকাতা থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে চলে আসেন। কেন এমন একটি আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতার ফাইনাল রাউন্ড থেকে আনহা আমিন চলে এলেন? কারণটি তার বক্তব্যেই উঠে এসেছে।

প্রিয় তাজিমা-

এখন এখানে দুটি প্রশ্ন আমাকে যেমন ভাবিত করবে, তেমনি প্রশ্নগুলো তোমাকেও ভাবনার যথেষ্ট খোরাক দেবে বলেই আমি বিশ্বাস করি। এক. বাংলাদেশের সুন্দরী প্রতিযোগিতাগুলোও কি 'যে নিজেকে যতো উজাড় করে দেবে তার স্কোরিং ততো বেশি হবে' এ দর্শনতত্ত্বের আওতাভুক্ত? দুই নম্বর প্রশ্নটি প্রথম প্রশ্নেরই অনুগামী- সত্যতা যদি এমনই হয়ে থাকে, তাহলে সুন্দরী প্রতিযোগিতার অন্য সুন্দরীরা কেন আনহা আমিনের মতো প্রতিবাদী হয় না?

প্রিয় মাহফুজা-

প্রশ্নগুলোর উত্তর শোনার জন্য তোমার মন নিশ্চয় উৎসুক হয়ে আছে। তবে প্রশ্নগুলোর উত্তর সরাসরি আমি তোমাকে দিচ্ছি না, প্রশ্ন এক-এর উত্তরের জন্য আমি তোমাকে নিয়ে যাবো ২০০৬ সালের 'লাক্স চ্যানেল আই সুন্দরী প্রতিযোগিতা'র মঞ্চে। ২০০৬ সালে লাক্স-চ্যানেল আই মূল প্রতিযোগিতার আগে ঘোষণা দেয়া হয়- যে তিনজন মেয়ে এ সুন্দরী প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হবে, তারা হুমায়ূন আহমেদের পরবর্তী সিনেমা 'দারুচিনি দ্বীপ'-এ অভিনয় করার সুযোগ পাবে। সিনেমাটি পরিচালনা করবেন অভিনেতা-পরিচালক তৌকীর আহমেদ।

বেশ ভালো প্রস্তাব। এমন প্রস্তাব শোবিজে হতেই পারে, তা নিয়ে তোমার-আমার মাথাব্যথার তেমন কিছু নেই। কিন্তু গোলটা বাধলো প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পর। সুন্দরী প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হন যথাক্রমে মম, বাঁধন ও বিন্দু নামের তিন তরুণী। বিরাট অনুষ্ঠান শেষে তাদের নাম ঘোষণা করা হয় এবং পরদিন পত্রপত্রিকায় তাদের ঢাউস সাইজের ছবি দিয়ে সংবাদ পরিবেশন করা হয়।

বেশ, এবার তবে তৌকীর আহমেদের সিনেমা বানানোর পালা। কিন্তু সিনেমা বানানোর সময় দেখা গেলো, প্রতিযোগিতার দুই সুন্দরী– মম ও বিন্দু নায়িকা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন, তবে সিনেমার কাস্টিংয়ে আরেক রানারআপ প্রতিযোগী বাঁধন নেই। বরং বাঁধনের জায়গায় রিপ্লেস করা হয়েছে প্রতিযোগিতার শীর্ষ দশে থাকা মুনমুনকে। ঘোষণা দেয়ার পরও কেন বাঁধন নেই? এমন প্রশ্ন ঘুরপাক খেয়েছে তখন মিডিয়া অঙ্গনের সবার মনে।

এই প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার বেশ কিছুদিন পরে থাইল্যান্ডে ঘটে যায় একটি অনভিপ্রেত ঘটনা। একটি নাটকের শুটিংয়ের জন্য লাক্সসুন্দরীদের থাইল্যান্ড নিয়ে যাওয়া হয়। হঠাৎ একদিন বাংলাদেশের প্রতিটি দৈনিকে খবর আসে, লাক্সসুন্দরী মডেল-তারকা বাঁধন একটি শপিংমল থেকে কিছু পণ্য চুরি করে ধরা পড়েছেন। তাজ্জব ব্যাপার! বাংলাদেশে নায়ক-নায়িকারা কতো হাজারো অপরাধ করে থাকে, তবুও তাদের খবর আমাদের 'ভদ্র' সাংবাদিকরা নিজেদের পত্রিকায় না ছেপে সেগুলো ধামাচাপা দেন। অথচ সুদূর শ্যামদেশে নতুন মডেল বাঁধন তুচ্ছ কিছু জিনিস চুরি করলো আর সেটা ফলাও করে আমাদের সবগুলো পত্রিকা ছেপে দিলো! আমাদের বিনোদন সাংবাদিকরা এতো মহান হয়ে গেলেন কী করে?

পরবর্তী সময়ে জানা যায়– মূলত স্ক্যান্ডাল দিয়ে বাঁধনকে হেয় করতে চেয়েছিলো একটি সংঘবদ্ধ মহল। তাকে দোষারোপ করে তার সম্মানহানির চেষ্টা করেছে তারই সুন্দরী হওয়ার পথের প্রভুরা। কেন? সেই প্রশ্নের উত্তর মেলেনি আজও।

আশা করি তুমিও আমাকে এ ব্যাপারে আর প্রশ্ন করবে না। আমার ধারণা, আমার চেয়ে একজন নারী হিসেবে এ প্রশ্নের জবাব তুমিই ভালোভাবে অনুধাবন করতে পেরেছো।

প্রিয় তাহসিনা–

কথাগুলো তোমার শুনতে খারাপ লাগলেও আমাকে বলতেই হবে। কেননা তোমাকে জানতে হবে সেইসব কথা, যা পর্দার অন্তরালে সবার অলক্ষ্যে উচ্চারিত হচ্ছে। আমরা টিভি-পত্রিকা খুলে যাদের আমাদের জীবনের আদর্শ মানি, আইডল হিসেবে যাদের অনুসরণ করি–তাদের জীবনের অনুল্লেখ অধ্যায় আমাদের জানা একান্ত প্রয়োজন। নইলে আমরা ভুল মানুষে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে আমাদের বিশ্বাসের প্রতি অবিচার ছাড়া আর কিছুই করতে পারবো না।

দেখো, মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে এসে যখন একটি মেয়ে হঠাৎ করেই তারকা বনে যাচ্ছে, যারা তাকে তারকা বানাচ্ছে তারা কিন্তু উদারতার বটবৃক্ষ নয়। তারা মুফতে তোমাকে তারকা বানায়নি। সুতরাং, তারা যদি বাঁধন বা অন্য কোনো মডেলের সামনে এসে দাবি করে– তুমি মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবার থেকে উঠে এসে বিরাট মডেল হয়ে গেছো, সিনেমা-নাটকের নায়িকা হয়ে গেছো, টিভি খুললেই তোমাকে দেখা যাবে... আর এসবের বিনিময়ে তুমি তোমার লাক্স-প্রভুদের কিছু দেবে না! তা কী করে হয়! যদি না-ই হয়, তাহলে তোমার জন্য এমনই অপমানসূচক সংবাদ কিছুদিন পরপরই প্রকাশ পাবে।

যারা এই সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন, তারা কি বাংলার হাতেম তায়ি হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন, নাকি তারা হাজি মুহসিন? তারা মোটেও এমন বোকা দানবীর নন। তারা যদি দশ টাকা দিয়ে সুন্দরী নির্বাচন করেন, তবে সুন্দরীর কাছ থেকে তারা তো একশো টাকা অবশ্যই উশুল করবেন। সেই টাকা উশুলের নোংরা পন্থায় যদি কোনো সুন্দরী অনীহা প্রকাশ করেন, তবে তাকে চুরির অপবাদ তো নস্যি, খুনের মামলায় ফাঁসাতেও তারা দ্বিধা করবে না। এর বহু প্রমাণ মিডিয়ায় কান পাতলেই শোনা যায়।

প্রিয় শেফালী–

ফটোশুট ব্যাপারটি কি তুমি বুঝো? হয়তো কখনো শুনেছো, কিন্তু এর বিশদ বিবরণ হয়তো তোমার অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। আচ্ছা, তোমার অজ্ঞতাকে আরও কয়েক মিনিট স্থির করে রাখো। সে ব্যাপারে তোমাকে একটু পর বলছি। তার আগে তোমাকে এক নারী মডেলের বাস্তব ফটোশুট অভিজ্ঞতার বয়ান শোনাচ্ছি...।

'অ'-এর ('অ' আদ্যক্ষরের একজন ফটোগ্রাফার) স্টুডিওর বাথরুমে ছিটকিনি নাই। আমি একবার ফটোশুটে গিয়েছিলাম। বাথরুমে কাপড় বদলাতে গিয়ে দেখি, দরজা লাগানো যাচ্ছে না...। কিছুক্ষণ পর বান্দা ('অ') নিজেই হাজির!...

'অ'-এর কাছে যে একবার ফটোশুট করতে গিয়েছে সে ... না হয়ে ফিরে আসে নাই! ভালো ব্যবসা করছে সে। বিকিনি ফটোশুটও করে। ব্যাংকক, ভুটানসহ এশিয়ার কিছু দেশে বাংলাদেশি মেয়েদের দিয়ে ভাড়া খাটায় সে!'

এ বক্তব্য একজন উঠতি নারী মডেলের। তার বক্তব্যে উদ্ধৃত 'অ' আদ্যক্ষরের ফটোগ্রাফারকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো কিছুদিন আগে, কিছু মেয়ের অভিযোগে। তার কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিলো মেয়েদের অসংখ্য নগ্ন স্টিল ছবি ও ভিডিও। ব্ল্যাকমেল করার কাজে এগুলো ব্যবহার করতো সে। পরে জামিনে ছাড়া পেয়ে যায় সে। ছাড়া পেয়ে আবারও সে নিজের মহৎকর্মে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছে।

প্রিয় ফরিদা–

এবার তোমাকে বলি ফটোশুট ব্যাপারটি আসলে কী। ফটোগ্রাফ বা ছবি– মডেলিং জগতের একটি অন্যতম অনুষঙ্গ। কেননা প্রিন্ট মিডিয়া বা ওয়েব মিডিয়া স্থিরচিত্রকেন্দ্রিক। বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপন বানাতে নারী-পুরুষ মডেলদের তুলতে হয় ছবি। তাছাড়া নতুন একজন মডেলকে কেউ কাজ দিতে চাইলে প্রথমে তার কিছু ছবি দেখতে চায়। এ কারণে এ জগতে একজন ভালো ফটোগ্রাফারের কদর অনেক বেশি।

নামীদামি ফটোগ্রাফারের তত্ত্বাবধানে ছবি তুলতে আগ্রহী থাকে যেকোনো উঠতি মডেল। যেহেতু নামি ফটোগ্রাফারের সঙ্গে যোগাযোগ

থাকে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনী সংস্থা, ফ্যাশন হাউস, ফ্যাশন ম্যাগাজিন, বিনোদন সাংবাদিকদের সঙ্গে, এ সুযোগে অনেক সুযোগসন্ধানী ফটোগ্রাফার কবজা করে উঠতি মডেলদের। বিজ্ঞাপনী সংস্থা, ফ্যাশন হাউস, ম্যাগাজিনে তাদের ছবি দেয়ার প্রলোভনে তাদের ভোগ করে এবং সুযোগমতো তাদের নগ্ন ছবি বা ভিডিও ধারণ করে। সে নগ্ন ছবি দেখিয়ে পরবর্তী সময়ে মডেলদের কাছ থেকে নানাভাবে হাতিয়ে নেয় অর্থসহ 'অনেক কিছু'।

উঠতি মডেলরা স্বভাবতই মিডিয়া-শোবিজে তাদের খ্যাতির জন্য মরিয়া হয়ে থাকে। এ কারণে নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে খুব বেশি কুণ্ঠাবোধ করে না তারা। কারণ, তাদের শেখানো হয়– মিডিয়া হলো এমন জায়গা, যেখানে ত্যাগ ছাড়া কেউ ওপরে উঠতে পারে না। এ ত্যাগের ভেতর দিয়েই চলে দেহব্যবসা, ড্রাগ, ইয়াবা-আইস পিল, ব্ল্যাকমেলিং, নারী পাচারসহ হাজারো অপরাধ।

মূলত এভাবেই বিজ্ঞাপনী সংস্থা, ফ্যাশন হাউস, ফ্যাশন ম্যাগাজিন, বিনোদন সাংবাদিক বা মিডিয়া অঙ্গনের নানা রথী-মহারথীদের মাঝে গড়ে ওঠে এক সংঘবদ্ধ সিন্ডিকেট। যাদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে মডেলিং করতে আসা অসংখ্য তরুণী।

অনেক সময় মডেলরা স্বপ্রণোদিত হয়েই এসব কাজে নিজেদের সঁপে দেন। কারণ, অর্থ আর খ্যাতির লোভ কাঁচা বয়সী তরুণীদের উচ্চাভিলাষী করে তোলে। আর সুযোগসন্ধানীরা তাদের সে স্বপ্ন দেখিয়েই টেনে নেয় মায়াবী এক অন্ধকারে।

প্রিয় নাজিয়া–

বুঝলে, উপায় নেই। একবার যদি তুমি এই আলো চমকানো দুনিয়ার অন্দরে পা রাখো, বের হতে পারবে না। এখানে আছে খ্যাতির ফাঁদ, অর্থের হাতছানি, ভোগবিলাসের সুতীব্র আকর্ষণ। এসব অবজ্ঞা করার মতো ইচ্ছাশক্তি থাকে না অধিকাংশ সদ্য কৈশোর পেরোনো তরুণ-তরুণীর। যখন সবকিছু খুইয়ে নিজেকে অচ্ছুত মনে করে বের হয়ে আসতে চায়, তখন দেখে ফিরে যাওয়ার আর কোনো মুখ নেই

তার। ফলে অনুশোচনার দগ্ধ অনলে পুড়তে পুড়তে সেই অন্ধকার জগৎই হয় তার শেষ ঠিকানা।

একটা বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরছি তোমার সামনে। অনলাইনে একটি বাংলা ব্লগে এক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী তার মডেলিং অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন– আমার পরিচিত কয়েকটি মেয়ে মডেলিংয়ে কাজ করছে। বয়স ১৮-এর মতো। ওদের বললাম, লেখাপড়া করো না কেন? খালি মডেলিং আর ফটোগ্রাফি করলে হবে? এইচএসসিও পাস করো নাই। তারা বলে, লেখাপড়া করে চাকরি করে কয় টাকা পাও তুমি? তা-ও কষ্ট করে ডাক্তার হয়ে? আমি এক-একটা ফটোসেশনের জন্য ১৫-২০ হাজার টাকা পাই। মাসে মিনিমাম ৫০ আসা কোনো ব্যাপারই না। এখন বলুন এ বয়সে এতো টাকা হাতে পেলে অপরাধ না করে যাবে কই? আর অতো টাকা ওই বয়সে মডেলিং ছাড়া পাবে কই? যখন বুঝবে, তখন ও মডেলিং ছাড়তে পারবে না। মডেলিং তখন গ্রাস করবে ওর সমস্ত সত্তা।

মূলত অর্থ ও খ্যাতির স্বপ্ন দেখতে গিয়ে অনেকে নিজের সর্বস্ব খুইয়েও সিন্ডিকেটের দেয়াল ভাঙতে পারে না। তখন তাদের হারাতে হয় নিজের সাধের জীবনটা। মনে পড়ে মডেল তিন্নির কথা? রাহা, আদৃতা, স্মৃতি– সবাইকেই বলি দিতে হয়েছে নিজের জীবন।

প্রিয় নাজনীন–

তোমাকে মডেল আদৃতার কথাই বলি। নামীদামি কোনো মডেল নয় সে, কেবল মডেলিং শুরু করেছিলো শোবিজে। আদৃতা মডেলিং জগতে নিজের ক্যারিয়ার গড়তে দ্বারস্থ হয়েছিলো মোহাম্মদপুর তাজমহল রোডের 'জেনেসিস ভিউ মিডিয়া অ্যান্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট' নামের একটি সংস্থার। এ প্রতিষ্ঠানের হাত ধরেই সে কয়েকটি পত্রিকার ফ্যাশন পাতায় মডেল হয়। কিন্তু একটা সময় সে ড্রাগ অ্যাডিক্টেড হয়ে পড়ে এবং তার মাধ্যমে নানাজন ড্রাগের ব্যবসা শুরু করে। পরবর্তী সময়ে সে এ পথ ছেড়ে চলে আসতে চাইলে ব্ল্যাকমেলিংয়ের শিকার হয় এবং ৩১ অক্টোবর ২০১১ তারিখে খুন হয় ওই মিডিয়া সংস্থারই নিজস্ব অফিসে।

কিন্তু পত্রিকায় আসে সম্পূর্ণ ভিন্ন খবর। বলা হয়, প্রেমের কারণে আত্মহত্যা করেছে আদৃতা। আমাদের কোনো একটি পত্রিকাও এই হত্যারহস্য উদ্‌ঘাটনে আগ্রহী হয়নি। ধামা দিয়ে তারা চাপা দিয়েছে একটি জলজ্যান্ত সত্যকে। আমাদের সংবাদপত্রগুলো কখনোই এসব সংবাদ পরিবেশন করবে না। কারণ, মডেল উৎপাদনের অন্যতম একটা মাধ্যম তো তারাও।

ভাবতে পারো, একটা জলজ্যান্ত মেয়েকে নিজেদের স্বার্থের লোভে কিছু মানুষ ঠান্ডা মাথায় খুন করে ফেললো অথচ তার কোনো সুবিচার তো হলোই না, বরং আমাদের মিডিয়াও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে তার হত্যাকাণ্ডকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দিলো।

সবচেয়ে অবাক করার মতো বিষয় হলো, মডেল বা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের হত্যা বা আত্মহত্যা মামলার কখনো কোনো সুরাহা হয় না। সেই সোহেল চৌধুরী থেকে শুরু করে সদ্য গত হওয়া মিতা নূর, কারও হত্যারহস্য আজ পর্যন্ত উদ্‌ঘাটিত হয়নি। কেন? উত্তর নেই।

প্রিয় শারমীন–

আরেকটি ভয়াবহ বাস্তবতা শেয়ার করি তোমার সঙ্গে। সেদিন বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় ব্লগে 'স্বাধিকার' নামের একজন ব্লগার নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন এভাবে– 'মামার ব্যবসায়িক ফার্মের জন্য কয়েক সেকেন্ডের একটি বিজ্ঞাপন নির্মাণের তাগিদে একটি অ্যাড ফার্মের সঙ্গে কথা বলি এবং তারা মডেলদের ছবি দেখায়। সবশেষে প্রস্তাব করে– আগে ছবি দেখে চয়েস করেন, তারপর মডেল আপনার বাসায় পাঠাবো। একটু হাসলাম। ফিরে এসে মামাকে বললাম, কুত্তা দিয়ে বিজ্ঞাপন বানালেও এদের মতো শরীরজীবীদের দিয়ে ব্যবসার পবিত্রতা নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।'

তোমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও অনেক অ্যাড ফার্মের এ ধরনের ব্যবসা বেশ রমরমা। সবাই নয়, কিন্তু কিছু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যে রয়েছে যারা এ ধরনের শরীরকেন্দ্রিক ব্যবসা করে, সে ব্যাপারে সন্দেহ থাকাটা বোকামি।

প্রিয় বীথি–

এসব ঝলমলে আলোর পেছনের অন্ধকারে একটু গভীর নজরে দৃষ্টি দিলেই তোমার সামনে বিষয়গুলো খোলাসা হতে শুরু করবে। কিছুদিন আগে দৈনিক 'বাংলাদেশ প্রতিদিন'-এ বাংলাদেশের টিভি নাটকের সবচেয়ে ব্যস্ত তারকাদের নাটকপ্রতি আয়ের একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ করে। সেখানে দেখানো হয়েছে একজন ব্যস্ত অভিনেত্রী একটি এক পর্বের নাটকে বড়জোর ২৫-৩০ হাজার টাকা পারিশ্রমিক পান। একজন অভিনেত্রী যদি নাটকপ্রতি ২৫-৩০ হাজার টাকা পান, মাসে তিনি কয়টি নাটক করেন? খুব বেশি হলে ৪টি।

সে হিসেবে তিনি মাসে আয় করছেন ১ লাখ বা তার চেয়ে বেশি কিছু। কিন্তু তুমি খোঁজ নিয়ে দেখো কোন মডেল বা অভিনেত্রীর বাসায় দুটি বা তিনটি গাড়ি নেই। দেখো তিনি যে ফ্ল্যাটে থাকছেন ফ্ল্যাটের ভাড়া কতো। তালাশ করো তার ব্যাংক হিসাব। অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে যাবে। কই থেকে আসে এই অঢেল অর্থ? মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

প্রিয় আলিয়া–

এ বিষয়ে দৃষ্টি যদি আরেকটু প্রসারিত করতে চাও, তাহলে নজর দাও তারকাদের বিদেশ সফরের দিকে। ইচ্ছে হলেই এক পর্বের একটি নাটকের জন্য প্রযোজক কিংবা পরিচালক ঘটা করে অভিনেত্রীদের নিয়ে চলে যান নেপাল, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, দুবাই কিংবা দূরদেশে। অথচ একটি এক পর্বের নাটকের জন্য বাজেটই বা কতো থাকে? বড়জোর ৩-৪ লাখ টাকা। তাহলে বাকি এতো টাকা আসে কোথা থেকে?

এভাবেই ঝলমলে উচ্চাভিলাষ আর রঙিন জীবনের হাতছানি দিয়ে প্রতিদিন শত শত মেয়েকে মডেল বানানোর স্বপ্ন দেখিয়ে সমাজের একশ্রেণির অভিজাত মানুষ তাদের বানাচ্ছেন অভিজাত পতিতা। একজন তরুণীর জীবন নিয়ে তারা প্রতিনিয়ত জুয়া খেলেন মিডিয়ার নাম করে। মডেলিংয়ের নাম করে তারা নতুন করে খুলে বসেছেন আধুনিক দাসবাজার। আর প্রতিদিন সেই দাসবাজারে বিক্রির জন্য তোলা হচ্ছে নতুন নতুন মেয়েদের। তারা জানতেও পারছে না, তাদের আগামী জীবন

বিক্রি হয়ে যাচ্ছে একজন ক্রীতদাসী হিসেবে। যাকে এই ভোগ্যদুনিয়া যৌন লালসার এক সেক্সটয় ছাড়া আর কিছুই ভাবে না।

আমি খুবই দুঃখিত প্রিয় ইতি–

বিষয়গুলো অনেকটা খোলামেলাভাবেই তোমার সামনে বলে ফেললাম। কিন্তু এছাড়া আমার কোনো উপায়ও ছিলো না। বেশ কিছুদিন থেকেই মনে হচ্ছিলো বিষয়গুলো নিয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করা উচিত। কেননা, হয়তো তুমি নও, কিন্তু তোমার পরিচিত অন্য অনেকেই হয়তো জানে না টিভি পর্দার সেলিব্রেটি নামের ঝলমলে মানুষেরা পর্দার ওপাশে কতোটা কদর্যভাবে তাদের জীবন কাটায়। তুমি কিংবা তোমরা হয়তো মনে করো– তারা কতো সুখে-ভোগে জীবন কাটাচ্ছে! কিন্তু একবার তাদের হৃদয়ের কাছে গিয়ে দেখে এসো, বুকের ভেতর থেকে হাহাকারের কান্নার শব্দে তুমি চোখের জল ধরে রাখতে পারবে না।

আমি শুধু এতোটুকুই জানাতে চেয়েছি– রুপালি পর্দায় প্রসাধনচর্চিত যে মুখটা দেখো, সেটাই তার আসল চেহারা নয়। প্রত্যেকজন অভিনেতা-অভিনেত্রীর পর্দার আড়ালেও আরেকটা চেহারা আছে। সেই চেহারাটা বড় পাপাবিদগ্ধ, বড় করুণার!

নারীর ফেসবুক
আন্তর্জালিক অন্দর-বাহির

প্রিয় হাফসা–

আজ বড় বেদনা নিয়ে তোমাকে লিখতে বসেছি। ইচ্ছে ছিলো না বিষয়টি তোমাকে জানানোর। তবুও যখন ক্রমশই চারদিক থেকে ধেয়ে আসছে ঝড়ের পূর্বাভাস, তখন সেই ঝড়ের প্রবল জিঘাংসা থেকে তোমাকে রক্ষা করতে এসব আমার বলতেই হবে। কারণ, তুমি সেই নারী– যে জন্ম দিয়েছিলো খালিদ বিন ওয়ালিদকে, তুমি সেই গর্ভধারিণী– যে গর্ভে ধারণ করেছিলো আবদুল্লাহ ইবনে মুবারককে, তুমি সেই মহীয়সী– যে আবুল হাসান আলি নদভিকে প্রতিপালন করেছিলো বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দিয়ে, তুমি সেই অনুপমা– যে ভালোবাসার অতলান্ত পরশ দিয়ে স্বপ্ন দেখিয়েছিলো মুহিউদ্দীন খানকে।

সুতরাং, একজন মা-বোন-সহধর্মিণী-মেয়ে হিসেবে তোমাকে সেই পবিত্র আলোয় দেখতে চাই, যেখানে কোনো পাপ তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। স্নিগ্ধ ভোরের মতো নিস্পাপ-নিষ্কলুষভাবে তোমাকে তুলে ধরতে চাই জান্নাতের সেই রূপ-সিংহাসনে, যেখানে তোমার ইন্তেজার করছে শত সহস্র পুণ্যবতী নারী। লৌহবর্ম হয়ে তোমার চারপাশ ঘিরে রাখতে চাই, যাতে সকল আঘাত-জিঘাংসা বুক পেতে নিয়ে তোমাকে রাখতে পারি নিরাপদ, সুরক্ষিত। তুমি হয়ে উঠবে অনাগত সকল মুসলিম নারীর রোলমডেল। তোমার স্তুতি উচ্চারণে গান গেয়ে উঠবে আকাশের ফেরেশতা পর্যন্ত। আমার কামনা শুধু এতোটুকুই।

প্রিয় সোহানা–

ফেসবুকে তোমার অ্যাকাউন্ট আছে কি না, আমার জানা নেই। যদি না থাকে, তবে তোমার জন্য অন্তরের গভীর থেকে রইলো একরাশ

শুভকামনা। আর যদি থেকে থাকে, তবে তোমার জন্যই আজ আমার এ অকুণ্ঠ নিবেদন। তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে স্মরণে রেখো এই নিবেদন, আশা করি প্রযুক্তি আর আধুনিকতার এই যুগে ঘরের অর্ধেক প্রশান্তি এনে দেবে আমার এ ছোট্ট নিবেদন।

চলো, কথা না বাড়িয়ে তোমাকে ফেসবুক ব্যবহারকারী এক নারীর ইনবক্সে নিয়ে যাই। ভাবছো অজ্ঞাত কোনো এক নারীর ইনবক্সে আমি কীভাবে প্রবেশ করলাম? সে তোমাকে পরে বলছি, আগে ইনবক্সের একটা ম্যাসেজ পড়ে নাও। সঙ্গত কারণেই ম্যাসেজটি হুবহু তুলে ধরছি, যাতে তোমার বুঝতে সুবিধে হয়–

[...মেম আপনি ফেসবুক চালানোটা বন্দ করুন *এমন একটা ভাব নিলেন যেন আপনি কতনা পর্দানিশিন *আমি বলি আপনি মার্কা মারা পতিতা ****আপনার কাছে রিকোষ্ট পাঠালে কি লাভ হবে? আপনার দেহটাকে ফ্রি হিসাবে দিবেন ভোগ করার জন্য? দিলেও নেবনা *কারন*******। এত অহমিকা ভাল নয় *কি ভাবেন নিজেকে ***অসংখ্য কাওমির মেয়ে আছে আমার ফ্রেন্ড ******মেজাজটা ****তাই হয়ে যান ******যত্ত পতিতা পাগলীর দল *কোথায় থেকে যে এরা আসে]

প্রিয় মীম–

ঘটনা কী ঘটেছে, অভিজ্ঞতার আলোকে হয়তো তুমি কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছো। তবে সত্যিই যদি তুমি ফেসবুকের এই ইনবক্স বার্তার মর্ম বুঝে না থাকো, তবে তোমার জ্ঞাতার্থে বলছি–

পর্দানশিন একজন নারী ফেসবুক ব্যবহার করেন। তিনি তার পরিচিত লোকজন ছাড়া কাউকে ফ্রেন্ড করেন না এবং এ বিষয়টি তার ফেসবুক প্রোফাইলের অ্যাবাউটে (পরিচিতি) বেশ কড়াভাবে লেখা আছে। তবুও প্রতিদিন গন্ডায় গন্ডায় তার নামে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানো হয়, রিকোয়েস্ট একসেপ্ট করার জন্য নানা ফন্দি-ফিকির, অনুনয় এবং কখনো অশ্লীল ভাষায় আবেদন করা হয়। যেহেতু অপরিচিত কারো রিকোয়েস্ট তিনি গ্রহণ করেন না, এ কারণে মাঝেমধ্যে তাকে উপরোক্ত ধরনের বার্তাও রিসিভ করতে হয়।

এই নারী গতকাল আমাকে ইনবক্সে নক করে বললেন– 'ভাইজান, এ বিষয়টি নিয়ে একটু লিখেন।'

তিনি আমাকে তার আইডি-পাসওয়ার্ড দিয়ে বললেন– 'আপনি একটু আমার ইনবক্সটা চেক করে দেখেন। বুঝতে পারবেন ছেলেদের মানসিকতা কতোটা নীচ আর রগড়। আপনি যেহেতু ফেসবুকেও লেখালেখি করেন, সবার সচেতনতার জন্য এ বিষয়টা নিয়েও একটু লিখেন।'

আমার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যা-ই বলো, আমি তাকে পাঠানো বিভিন্নজনের সাম্প্রতিক মেসেজগুলো পড়েছি। আমি সেসব পড়েছি আর একজন পুরুষ হিসেবে নিজেকে ধিক্কার দিয়েছি। ধিক্কার কেন দিয়েছি তার উদাহরণ তো তুমি দেখলেই। ছিঃ! আমাদের মানসিকতা এতোটা স্খলিত হতে পারে!

প্রিয় ফাহমিদা–

ফেসবুককে তুমি যতোটা সুন্দর, যতোটা কাজের জিনিস মনে করো, বাস্তবে জিনিসটা মোটেও তেমন নয়। বললে তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানি না, ফেসবুকে অনেক ছেলে (মেয়েও হতে পারে) জয়েনই করে প্রেম-পিরিতি, সুন্দরী-দ্বীপবাসিনী মেয়ে পটানোর ধান্দায়। তারা সারাদিন বসে বসে সুন্দরী মেয়েদের তালাশ করে। কাউকে দেখে জিবে জল এলে টুপ করে তাকে একটা বন্ধুত্বের ঢিল ছুড়ে মারে। বেছে বেছে কিছু মেয়ের ইনবক্সে বন্ধুকাতর দুঃখী মানুষ সেজে সকরুণ বার্তা পাঠায়। কখনো 'আপনার লেখা পড়ে ফিদা' 'আপনার ঠোঁটের হাসি বুকের মধ্যে হাহাকার পয়দা করেছে' 'আপনার চোখের চাহনি দেখে লিখেছি এই কবিতা...'– এমন টাইপের চটুল বাক্য ছুড়ে দেয়।

প্রিয় মারুফা–

মজার বিষয় হলো, যে নারীর কথা একটু আগে তোমাকে বললাম, এই নারীর ইনবক্সে কিছু ছেলে এমন আবেদন করেছে যে– 'আপনার লেখা পড়ে ইমানি চেতনায় জাগ্রত হতে চাই। নিয়মিত লাইক-কমেন্ট করে কলমসৈনিক হতে চাই। ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট একসেপ্ট করুন, প্লিজ!'

বুঝলাম না, ফেসবুকে এসে মেয়েদের পোস্ট দেখে কারো ইমান কীভাবে জেগে ওঠে এবং কীভাবে তারা কলমসৈনিক হতে চায়!

প্রিয় নাজিফা–

তুমি হয়তো একটু আনন্দ পেতে ফেসবুক ব্যবহার করবে। বান্ধবীদের সঙ্গে চ্যাট করতে সবার অলক্ষ্যে ফেসবুকে প্রবেশ করবে। কিন্তু আমার এ কথাটা খুব মন দিয়ে শোনো এবং মনের মধ্যে চিরস্থায়ী করে গেঁথে ফেলো– ফেসবুক হলো একধরনের নেশা, এক প্রকারের ওয়ানওয়ে এন্ট্রি– একবার ঢুকলে বেরোতে পারবে না।

সময়ের কোনো এক আলবেলা মুহূর্তে অকস্মাৎ চোখে পড়বে কারো একটা লেখা কিংবা ছবির ওপর। তোমার মনের মধ্যে তার জন্য সামান্য হলেও খানিকটা দুর্বলতা সৃষ্টি হবে। না না... আমি তেমন কোনো দুর্বলতার কথা বলছি না, তুমি যেমনটি ভাবছো। দুর্বলতা বলতে আমি বোঝাচ্ছি খানিকটা ভালো লাগা, একটুখানি প্রশংসিত দৃষ্টি, সামান্য সহানুভূতি।

প্রত্যেক মানুষেরই কোনো না কোনো দুর্বলতা থাকে, থাকাটাই স্বাভাবিক। ফেসবুকে প্রবেশ করে কৌতূহলবশতই এদিক-সেদিক ঘুরতে ঘুরতে চোখ পড়ে যাবে তোমার নিজের কোনো দুর্বলতার দিকে। কারো কোনো লেখা পড়ে বুকে একটু চিনচিনে ব্যথা অনুভূত হবে, হয়তো এক চিমটি সহমর্মিতা জাগবে মনের মধ্যে। ব্যস, শুরু হলো মনের মধ্যে এক ইঁদুর-বিড়াল খেলা। এ খেলা বড় ভয়ঙ্কর!

প্রিয় ফারিহা–

ফেসবুকে আরেক ধরনের লীলাকামী পুরুষ আছে, তাদের কাজ হচ্ছে মেয়েদের ছবি-পোস্ট দেখলেই সেগুলোতে কমেন্ট করতে ঝাঁপিয়ে পড়া। তারা ওই মেয়ের ছবি বা পোস্টের গুণগান গেয়ে তাকে রাবেয়া বসরি বা কেট মিডলটন বানিয়ে ফেলে। প্রশংসা পেতে কার না ভালো লাগে বলো! অনেকেই হয়তো তোমাকে শব্দের এমন চাতুর্যে আটকে ফেলবে, তুমি মুগ্ধ না হয়ে পারবে না। বাক্যের কারুকার্যে তোমাকে বাধ্য করবে তার প্রতি একটু হলেও সিমপ্যাথি প্রকাশ করতে।

আমার কাছে মনে হয় কি জানো, যারা এভাবে ফেসবুকে অকাতরে মেয়েদের পোস্টে কমেন্ট করে যায়; এটাও একধরনের নারী নির্যাতন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস– এসব পুরুষমানুষ নিজের স্ত্রী কিংবা মা বা বোনের সঙ্গেও এতো নরম লুতুপুতু ভাষায় কথা বলে না, যতোটা মনোজ্ঞ ভাষা তারা মেয়েদের পোস্টের নিচে কমেন্ট বক্সে খরচ করে। এদের দেখলেই গা ঘিনঘিন করে উঠবে তোমার।

পুলিশ এ দেশে ধর্ষক, নারী নির্যাতক খুঁজে পায় না। আমার মনে হয়, এই বর্ণচোরা ভদ্রবেশী ফেসবুক ব্যবহারকারীদের চেয়ে বড় ধর্ষকামী, নারী নির্যাতনকারী বাংলাদেশে খুব বেশি নেই। শুধু সুযোগ ও সাহসের অভাব। এ দুটো যদি কোনোদিন বাগাতে পারে, দেখবে ঝাঁ করে এদের চেহারার মুখোশ খুলে পড়েছে। ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে লিপ্সাকাতর এক রাসপুতিনের অবয়ব।

প্রিয় মুকাররমা–

এতো সবকিছুর পরও তোমার জন্য আমার শুভকামনা– মেয়েদের ফেসবুক ব্যবহারের পক্ষপাতী আমি কখনোই নই। তা তুমি যতো ধার্মিক হও বা যতোটা নিজেকে নিরাপদ রাখতে চাও। কারণ, শয়তান তোমার চেয়ে অনেক বেশি ধুরন্ধর, অনেক বেশি সুযোগসন্ধানী। কখন তোমাকে পাপের নোংরা কাদায় ডুবিয়ে দেবে, তুমি বুঝতেই পারবে না। যখন বুঝতে পারবে, তখন নিজের দিকে তাকিয়ে দেখবে, পঙ্কিল কাদায় তোমার সারা শরীর দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে। সারাজীবন নিজের কাছে নিজেই অপরাধী হয়ে থাকবে। শত চেষ্টাতেও এ পাপের দাগ দূর করতে পারবে না।

বেশকিছু বিবাহিত-অবিবাহিত মেয়ের ব্যাপারে জ্ঞাত হয়েছি, ফেসবুকের কারণে যাদের পরিবার-সংসারে নেমে এসেছে ঘোর অমানিশা।

প্রিয় মাদিহা–

তার পরও তোমার মতো আরও অন্য মেয়ে, যারা ফেসবুক ব্যবহার করতে আগ্রহী, তাদের কাছে অনুনয়– অপরিচিত কাউকে কখনো ফ্রেন্ড করবে না। ছেলে আইডি তো একেবারেই হারাম, মেয়ে আইডিও নয়। কারণ, অনেক মেয়ে আইডির আড়ালে লুকিয়ে থাকে ধর্ষকামী লোলুপ পুরুষ।

এবং খুব মন দিয়ে মনে রাখবে, একটা ছেলে এবং একটা মেয়ের মধ্যে কখনোই বন্ধুত্ব হতে পারে না। বন্ধুত্বের বাতাবরণ যতোই বিশ্বাসের হোক, তবু সেটা নিষ্কাম হওয়া অসম্ভব। মনে করো না এ কথা আমি তোমাকে শুধু শুধু ভয় দেখাতে বলছি, এ কথা বিশ শতকের বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড বলে গেছেন! আর একজন মেয়ে হিসেবে এ কথাটা তোমারও অনুধাবন করতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

প্রিয় তোহফা–

আজ তুমি যে ছবি পোস্ট করছো, আজ তুমি বন্ধু বা বান্ধবীদের সঙ্গে যে সেলফি তুলে ফেসবুকে আপলোড করছো, বেড়াতে গিয়ে যে উল্লসিত ফটো সবাইকে দেখানোর জন্য ছড়িয়ে দিচ্ছো; সে ছবি হাজারো মানুষ প্রতিদিন লাখবার দেখছে। অসংখ্য পুরুষের চোখ তোমার চেহারা দেখছে, তোমার শরীরের দিকে লোভাতুর দৃষ্টি ফেলে তোমাকে তাদের চোখ দিয়ে ধর্ষণ করছে।

তুমি হয়তো নিছকই আনন্দ উদ্‌যাপনের জন্যই একটি নিষ্পাপ ছবি আপলোড করেছো, কিন্তু যে দর্শক এটি দেখছে তার দৃষ্টি মোটেও নিষ্পাপ, নিষ্কাম নয়। একেকজন পুরুষ তোমাকে দেখছে আর প্রতিবার দৃষ্টিপাতের ফলে তারা যেমন পাপ করছে, তেমনি তাদের চেয়ে বড় পাপের ভাগীদার তুমিও হচ্ছো। একেকটি কুদৃষ্টির পরিবর্তে তোমার আমলনামায় যোগ হচ্ছে শত-সহস্র গোনাহের হিসাব। যতোদিন তোমার এ ছবি ফেসবুকে থাকবে, ততোদিন তোমার আমলনামায় গোনাহ্ যোগ হতেই থাকবে। যাকে বলে গোনাহে জারিয়াহ্! তোমার অলক্ষ্যে গোনাহের পাহাড় জমা হতে থাকবে।

প্রিয় তন্বী–

আরেকটি বিষয় তুমি হয়তো কখনো খেয়াল করোনি। ফেসবুকে তোমার আপলোড করা সব ছবি কিন্তু সবার জন্যই উন্মুক্ত। যে কেউ ইচ্ছে করলেই তোমার ছবি ডাউনলোড করতে পারবে। যে কেউ ইচ্ছে করলেই এসব ছবি অন্য কোথাও ব্যবহার করতে পারবে।

এবার বলি এসব ছবির ভয়াবহ অন্য আরেকটি দিকের কথা। পৃথিবীতে লাখ লাখ পর্নো ওয়েবসাইট বা নানা ধরনের অসংখ্য নীল ওয়েবসাইট রয়েছে। এসব সাইট পরিচালনাকারীরা ফেসবুকের সুশ্রী মেয়েদের ছবি নিয়ে নিজেদের সাইটে ব্যবহার করে থাকে। ছবির নিচে ক্যাপশনে লেখা থাকে– 'আপনার জন্য অপেক্ষা করছে...'!

ব্যস! সর্বনাশের ষোলকলা পূর্ণ হয়ে যায় মুহূর্তে। মনে করো না এ শুধু কথার কথা। এমন শত শত প্রমাণ প্রতিদিন ঘটে চলেছে ইন্টারনেটের কুৎসিত রঙিন দুনিয়ায়। তোমার পরিচিত কেউ যদি এসব নীল সাইটে একবার তোমার ছবি দেখে ফেলে, সে এলাকার সব মানুষকে তোমার ছবি দেখিয়ে বেড়াবে এবং তোমাকে কোন ধরনের মেয়ে ভাববে তা তুমি খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছো।

এমন ঘটনার মুখোমুখি হয়ে শুধু বাংলাদেশেই লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে শত শত মেয়ে। বললে হয়তো বিশ্বাস করবে না, লাঞ্ছনা সইতে না পেরে বেশ কিছু আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটেছে।

অথচ দেখো, ঘটনার সূত্রপাত কিন্তু হয়েছে সামান্য একটি নিরুত্তাপ ছবি আপলোড করার মাধ্যমে।

প্রিয় হাসিবা–

এবার এ কথাগুলো বলছি তোমার অভিভাবকদের প্রতি– যারা বাবা, স্বামী, ভাই অভিভাবক হিসেবে আছেন, তাদের অনুরোধ করবো– আপনার মেয়ে, বোন, স্ত্রীর প্রযুক্তি ব্যবহার অবশ্যই আপনি মনিটরিং করবেন। তবে সেটা শাসন করে নয়, খুবই বন্ধুত্বপূর্ণভাবে এবং হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমে। দুজন দুজনের সঙ্গে ফেসবুক বা অন্যান্য সোস্যাল সাইটের যাবতীয় বিষয় শেয়ার করুন। উপকার-অপকার বুঝিয়ে দিন।

মনে রাখবেন, প্রযুক্তিকে আপনি-আমি চাইলেই দূরে সরিয়ে রাখতে পারবো না। প্রযুক্তি আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। আমরা ইচ্ছে করলেই আর প্রযুক্তির অন্তর্জাল থেকে বাইরে বেরোতে পারবো না। তবে প্রযুক্তিকে সঠিক উপায়ে ব্যবহারের চাবিকাঠি

কিন্তু আমাদের হাতেই রয়েছে। প্রযুক্তির মন্দ দিক যেমন আছে, ঠিক তেমনি সেটি ব্যবহারের ভালো দিকও আছে।

সুতরাং, পরিবারের সবার সঙ্গে সবার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং ভাব আদান-প্রদানের সহজ, স্বাভাবিক পরিবেশই পারে প্রযুক্তিকে আমাদের আয়ত্তের মধ্যে রাখতে। কেননা এ গুড ফ্যামিলি ক্যান মেক এ বেটার লাইফ!

আল্লামা শফীর ভিডিও বিতর্ক

নর্তকীর আস্ফালনে দোলে বাংলার মসনদ

প্রিয় সাফিয়া–

যে কথাগুলো এখন বলবো, কথাগুলো বছর কয়েকের পুরোনো। না, কথাগুলো পুরোনো নয় তবে কথার প্রেক্ষাপটটি পুরোনো। তবে পুরোনো হোক আর যা-ই হোক, ঘটনার প্রেক্ষিতে যে কথাগুলো এখন তোমাকে বলবো সেসব কথা যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর বুকে ঘটে চলেছে। আমার বলাটা কেবল নতুন উপলক্ষ ছাড়া আর কিছুই নয়।

তোমার মনে আছে নিশ্চয়, ২০১৩ সালে সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম আল্লামা শাহ আহমদ শফী সাহেবের একটি বক্তব্য নিয়ে আমাদের মিডিয়া হঠাৎই বেশ সরগরম হয়ে ওঠে। বক্তব্যটিতে তিনি বর্তমান সময়ের নারীদের ব্যাপারে বেশকিছু সত্য ভাষণ তুলে ধরেন। নারীদের সমসাময়িক বাস্তবতা ব্যক্ত করেন অত্যন্ত নির্মোহভাবে। আর তাতেই আমাদের 'আধুনিক' মিডিয়া শফী সাহেবকে তুলাধোনা করতে কোমর বেঁধে নেমে পড়ে। সঙ্গে শাহবাগকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীরাও তাকে নানাভাবে হেনস্থা এবং অপদস্থ করতে উঠে-পড়ে লাগে।

তখন আমার মনে হলো, এ বিষয়টা নিয়ে একটু খোঁজখবর করি– বিষয়ের বাস্তবতা বা সামগ্রিক বিচার আসলে কতোটুকু সত্য! এ চিন্তা থেকেই ঘটনার অনুসন্ধানে নামি এবং নারী বিষয়ে প্রগতিবাদীরা বা শাহবাগীরা কী মনোভাব পোষণ করে, তারও একটা সুলুকসন্ধানের চেষ্টা করি। তুলে আনি নারীদের নিয়ে আধুনিকমনস্ক মানুষের যাপিত ভাবনা এবং তাত্ত্বিক পর্যালোচনা।

প্রিয় রুহামা–

এ কাজের শুরুতেই আমি সর্বপ্রথম যোগাযোগ করি এমন একজন লোকের সঙ্গে, যিনি আল্লামা শফী সাহেবের বয়ান রেকর্ড করে থাকেন। তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি যে কথাগুলো আমাকে বলেন, সেগুলো প্রায় হুবহু তোমাকে শোনাচ্ছি–

'...শফী সাহেব হুজুরের এই ওয়াজটি আমি দুই-তিন বছর আগে চট্টগ্রামের কোথাও রেকর্ড করেছিলাম। কোথায় করেছিলাম, সেটি এখন আর মনে নেই। কারণ প্রতিবছর হুজুর শত শত স্থানে ওয়াজ করেন। আমি চেষ্টা করি হুজুরের সব বক্তব্য রেকর্ড করতে। আমি হুজুরের প্রায় প্রতিটি ওয়াজেই উপস্থিত থাকি। কিন্তু বিগত দুই-এক বছরে যে এ বক্তব্য রেকর্ড করিনি, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। করলে আমার মনে থাকতো।

'...হুজুরের বক্তব্য নিয়ে সম্প্রতি যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে, এটা সুপরিকল্পিত একটি অপপ্রচার। হুজুর আমাদের চট্টগ্রামের সব মানুষের মুরব্বি, সবার অভিভাবকের মতো। তিনি সাধারণ মানুষকে ধর্ম সম্পর্কে বোঝাতে গিয়ে নানা সময় নানা আঙ্গিকে কথা বলেন। আমরাই দেখেছি, তিনি ৬০-৭০ বছরের বৃদ্ধ মানুষকে সবার সামনে গালমন্দ করেন। সমাজের অনেক বড় বড় ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, শিক্ষিত মানুষকেও তিনি এভাবে বকাঝকা করেন– আপনার বাড়িতে গান-বাজনা চলে কেন? আপনার ছেলে নাকি নেশা করে? আপনার ঘরে নাকি পর্দা নাই? এমন বিষয়ে তিনি সবসময়ই সবাইকে সতর্ক করেন, উপদেশ দেন। তারা হুজুরের সামনে তার কথার প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা বরং মাথা নিচু করে বসে থাকে, নিচুস্বরে হাসে। এলাকার মানুষের প্রতি ভালোবাসা থেকেই তিনি এমনটা করেন। এলাকার মানুষও বিনা বাক্যব্যয়ে হুজুরের কথা মেনে নেয়।

'...এই ওয়াজটি তিনি কোনো একটি গ্রাম্য মাহফিলে দিয়েছিলেন সম্ভবত। গ্রামের মানুষের জন্য হুজুর সাধারণত চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় ওয়াজ করেন এবং এমন সব উপমা দিয়ে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেন, যেগুলো দিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষ সহজেই বুঝতে পারে। আমার মনে হয়, তিনি যা বলেছেন তাতে নারীদের মোটেও অসম্মান করা হয়নি, বরং নারীদের সম্মানকে আরো বাড়ানো হয়েছে। এতোদিন

আগের একটি ওয়াজকে এখন মানুষের সামনে উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রচার করে ফায়দা ওঠানো নাস্তিকদের কারসাজি ছাড়া আর কিছু নয়।'

প্রিয় নুসাইবা–

এ লোকের নাম ইয়ার আহমদ, স্বত্বাধিকারী আল আরব এন্টারপ্রাইজ, হাটহাজারী মাদরাসা মার্কেট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। আল্লামা আহমদ শফীর বক্তব্য বা ওয়াজগুলো সাধারণত আল আরব এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী ইয়ার আহমদ রেকর্ড করে থাকেন এবং আলোচিত ওয়াজটিও আল আরব এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক রেকর্ডকৃত ও বাজারজাতকৃত। উপর্যুক্ত বক্তব্যটি আল আরব এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী ইয়ার আহমদের।

প্রিয় লুবাবা–

ইয়ার আহমদের বক্তব্যের রেশ ধরে আমরা কয়েকটি বিষয়কে আলোচনার টেবিলে টেনে আনতে পারি। প্রথম কথা হলো, আল আরব এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী ইয়ার আহমদের বক্তব্য অনুযায়ী ওয়াজটি কম হলেও দুই বছর আগের কোনো এক ওয়াজ মাহফিলের। এর প্রেক্ষিতে প্রথম প্রশ্ন হবে– দুই বছর আগের একটি বক্তব্যকে কেন আমাদের চতুর মিডিয়া হঠাৎ করেই সামনে নিয়ে এলো?

দ্বিতীয় কথা হলো, বিশেষ অপপ্রচারের জন্য আমাদের মিডিয়া যখন এই ইস্যুটি সামনে নিয়েই এলো, কেন তারা এটিকে আল্লামা আহমদ শফীর 'সাম্প্রতিক' বক্তব্য বলে চালিয়ে দিলো? দুই বছর সময়কে কি কেউ সাম্প্রতিক বলে? কোনো কোনো সংবাদমাধ্যমে এই বক্তব্যকে 'কয়েক দিন' আগের বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। একটি জনপ্রিয় অনলাইন সংবাদমাধ্যম বক্তব্যটিকে ৮ জুলাই ২০১৩ হাটহাজারীতে দেয়া আল্লামা শফীর বক্তব্য বলে প্রচার করে। অথচ আল্লামা শফী জুলাইয়ের প্রথম থেকেই উমরার উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে অবস্থান করছিলেন। তবে কেন মিডিয়ার এই নির্জলা মিথ্যাচার?

তৃতীয় কথা হলো, আল্লামা শফী বক্তব্য দিলেন অথচ তার সামনে উপস্থিত শ্রোতারা কেউ প্রতিবাদ করলো না। এক বছর গেলো, দুই বছর

গেলো কিন্তু কোথাও কোনো প্রতিবাদ হলো না; একজন নারীও সরব হলেন না তার 'অপমানের' প্রতিশোধ নিতে। অথচ দুই বছর পর তার সেই বক্তব্য নিয়ে হঠাৎ করেই আমাদের মিডিয়া সরব হয়ে উঠলো। কতিপয় নারীনেত্রী আর ধাপ্পাবাজ রাজনৈতিক নেতার শরীরে আগুন ধরে গেলো- জাত গেলো জাত গেলো বলে। অথচ সরাসরি যাদের সামনে বললেন তাদের গায়ে আগুন লাগলো না, তাদের মা-বোনের ইজ্জত গেলো না; ইজ্জত গেলো আমাদের প্রগতিবাদীদের। তা-ও তিন বছর পর!

বাঙালি নারীর ইজ্জত কি এতোই সস্তা? তিন বছর পর তার ইজ্জত ঢাকার জন্য আমাদের রাজনৈতিক নেতা এবং তাদের ভাড়া করা নারীনেত্রীদের টনক নড়ে! তবে কি বাঙালি নারীরা এতোদিন আব্রুহীন হয়ে পথেঘাটে পড়ে ছিলেন?

প্রিয় শুআইবা–

এবার খুব বুঝেশুনে তুমি আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দাও। আল্লামা শফী সাহেব নারীদের পর্দায় থাকতে বলে, তাদের যত্রতত্র বেপর্দা ঘোরাফেরা না করতে বলে, পর্দাহীন হয়ে চাকরি-বাকরি না করতে বলে যেসব বক্তব্য দিয়েছেন, তার বক্তব্যের ফলে কোনো নারী কি ধর্ষণের শিকার হবেন? কোনো নারী কি স্বামীর দ্বারা নির্যাতিত হবেন? কোনো নারী কি যৌতুকের মতো অভিশাপের শিকার হবেন? কোনো নারী কি কর্মস্থলে তার সহকর্মীর হাতে যৌন নিগ্রহের শিকার হবেন? স্কুল-কলেজে কি এর দ্বারা ইভটিজিং বেড়ে যাবে?

আমি জানি, তোমার দেয়া প্রতিটি উত্তরই হবে– 'না'। বরং তুমি বলবে– তার বক্তব্যের দ্বারা তো নারীর সম্ভ্রমকে আরও রক্ষা করা হলো। তার সতর্কবাণীর ফলে সমাজে নারীর প্রতি যৌন নিগ্রহই শুধু নয়, নারীর প্রতি মানুষের অবহেলারও অবসান ঘটবে।

তাহলে এবার তুমিই বলো– তার বক্তব্যে যদি এতোসব উপকারিতা থেকে থাকে, তবে কোন অমৃত সুধার তালাশে আমাদের তথাকথিত নারীনেত্রীরা তার বিরুদ্ধে ১৮ জনের মানববন্ধন নিয়ে প্রেসক্লাবের সামনে দাঁড়ান? আর আমাদের বেহায়া মিডিয়াগুলো কীভাবে সেই ১৮ জনের

মানববন্ধনের ছবি পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপতে পারে? ১৮ জনের জনসমর্থনই কি দেশের ১৭ কোটি মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে?

যদি তা-ই না করে থাকে, তবে কেন তারা মুষ্টিমেয় কিছু লোকের মিছিলকে দেশের মানুষের নিরঙ্কুশ দাবি বলে দেদার চালিয়ে দিচ্ছে?

প্রিয় টুম্পা–

আল্লামা আহমদ শফী সাহেব ওয়াজ মাহফিলে তার ওই বক্তব্যে যা বলেছিলেন, তার সারসংক্ষেপ আমি তোমাকে জানাচ্ছি। এতে করে কিছুটা হলেও তুমি অনুধাবন করতে পারবে তিনি নারীদের প্রতি কতোটা আন্তরিকতা নিয়ে প্রতিটি কথা বলেছিলেন। অথচ তার সেই আন্তরিক কথাগুলোকে প্রগতিশীল সুশীল লোকেরা বিকৃত করে মিডিয়ায় প্রচার করেছে এবং নারীকে অপমান করার অজুহাতে তাকে নানাভাবে দোষী সাব্যস্ত করার অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে।

কী কারণে দোষ ধরা হয় আল্লামা আহমদ শফীর? তিনি নারীকে ঘরে সুরক্ষিত থাকতে বলেছেন, তাকে অনর্থক বাইরে বেরোতে নিষেধ করেছেন, তাকে ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে চলতে নিষেধ করেছেন, চাকরিতে, স্কুল-কলেজে, ছেলেদের সঙ্গে উন্মুক্তভাবে মিশতে নিষেধ করেছেন। একজন মেয়ের জন্য এটা কি অপমানসূচক উপদেশ? তিনি মেয়ের বাবাকে বলেছেন মেয়ের খোঁজ নিতে, মেয়ে চাকরির নামে অন্য ছেলের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছে কি না, স্কুলের নামে পার্কে বসে আড্ডা দিচ্ছে কি না, সে যা উপার্জন করছে সেগুলো হালাল কি না– এসব বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলেছেন। এগুলো একজন অভিভাবককে পরামর্শ দেয়াটা কি মানবতাবিরোধী কাজ?

বরং এটা কুরআনের সরাসরি নির্দেশ। কুরআনে এসেছে– '(নারীরা!) তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে এবং মূর্খতা যুগের (আইয়্যামে জাহেলিয়ার) অনুরূপ নিজেদের প্রদর্শন করবে না।' (৩৩:৩৩)

এর আগের আয়াতে বলা হয়েছে– 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তবে পরপুরুষের সঙ্গে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না। ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সংযত কথাবার্তা বলবে।' (৩৩:৩২)

প্রিয় তাহমিনা–

তুমি ভালো করেই জানো, বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে ওয়াজ-মাহফিল একটি অতি সাধারণ বিষয়। তুমি নিজেও হয়তো অনেক মাহফিলে গিয়েছো, ওয়াজ শুনেছো। শুনে থাকলে নিশ্চয় শুনে থাকবে– সেসব ওয়াজে নারী-পুরুষ পরস্পরের সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, ছেলেমেয়ের প্রতি আচরণ, পিতা-মাতার মর্যাদার বিষয়ে খুব সাধারণ ভাষায় বক্তব্য রাখেন ধর্মীয় বক্তারা। সেখানে শুধু তেঁতুল নয়, আগ্রহী শ্রোতাদের বোঝাতে মুরগি-ডিম, চোর-ডাকাত, স্বামী-স্ত্রী, ঢাকা-বাগদাদ এমন নানা ধরনের উপমার অবতারণা করেন বক্তারা। এটা গ্রামীণ ওয়াজে খুবই প্রচলিত একটি টার্ম। এমনকি গ্রামের মাহফিলে সেই বক্তাকেই বেশি তোয়াজ করা হয়, যে যতো বেশি বিভিন্ন ধরনের উপমা ব্যবহার করতে পারেন। সেখানে তেঁতুল উপমা অতি সাধারণ গোছের একটি উপমা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সুতরাং, শহরের ওয়াজ না শোনা সুশীল ব্যক্তিরা যখন এইসব গ্রাম্য উপমা আর গ্রামীণ দরদমাখা কথাবার্তা শোনেন, তখন মনে করেন এটা গালিবিশেষ, অতি কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য। আল্লামা শফীও সমাজে নারীর অবমূল্যায়ন এবং অবমাননা রুখতে সাধারণ গ্রাম্য ভাষায় বিষয়টি প্রতিহত করতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মাত্র। এখন শহরের আধুনিক মানুষ যদি গ্রাম্য ভাষাকে গালি মনে করে আল্লামা শফীকে অপরাধী ঠাওরান, তাহলে দোষটা আসলে কার, সেটা বিবেচনার দাবি রাখে।

প্রিয় তাশফিয়া–

তুমি জেনে অবাক হয়ে যাবে, আল্লামা শফীকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য তার বক্তব্য আমাদের মিডিয়ায় আংশিকভাবে বিবৃত হয়েছে। তিনি নারীদের ঘরের বাইরে না যাওয়ার ব্যাপারে বলার আগে বলেছেন, নারীরা ঘরের রানি। আপনারা কেন বাইরে যাবেন? আপনার বাবা, স্বামী, ছেলেকে বলুন আপনার কী দরকার। তারা আপনাকে এনে দেবে। আপনি শুধু ঘরে বসে আরাম-আয়েশ করবেন।

সুতরাং, আল্লামা শফী দোষটা করলেন কোথায়? আমাদের সমাজব্যবস্থাটা তো তার বক্তব্যের চেয়ে খুব বেশি ভিন্ন নয়।

প্রিয় মুশফিকা–

এবার তোমাকে এমন কিছু ভয়াবহ সত্য তথ্য শোনাবো, যা শুনলে তুমি আঁতকে উঠবে এবং ঘৃণায় তোমার শরীর রি রি করে উঠবে নিঃসন্দেহে। হলফ করে বলতে পারি, এমন সত্যের মুখোমুখি হওনি তুমি এর আগে কখনো।

কিছুদিন আগে ঢাকার আইসিডিডিআরবি হাসপাতালের উদ্যোগে একটি জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপের প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশে ১৮ বছরের আগেই অন্তত ৫০ ভাগ শহুরে তরুণ-তরুণী নানাভাবে যৌন অভিজ্ঞতা নিচ্ছে। এরা পরোক্ষভাবে প্ররোচিত হয়েই এমনটা করছে।

আইসিডিডিআরবি তাদের প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করেছে, ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সী কিশোররাও যৌনকর্মে লিপ্ত হচ্ছে পর্নোগ্রাফি দেখে, যা এ সময়ের এক ভয়ঙ্কর ব্যাধি।

২০১২ সালে সময় টিভি থেকে করা এক জরিপে উঠে এসেছে আরও ভয়াবহ তথ্য। তারা রাজধানী ঢাকার বেশ কয়েকটি স্কুল ঘুরে জানতে পারে, স্কুলের ৮২% ছাত্রছাত্রী সুযোগ পেলেই মোবাইলে পর্নোগ্রাফি দেখে। ঢাকা শহরের ৬২% স্কুলপড়ুয়া ক্লাসে বসেই পর্নো ছবি দেখে। ৪৪% প্রেম করার জন্য মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। আর স্কুলপড়ুয়া মেয়েরা মনে করে, তার একটা বয়ফ্রেন্ড থাকতেই হবে, না হলে সে স্মার্ট নয়। একাধিক বয়ফ্রেন্ড থাকাটাও একটা ক্রেডিটের ব্যাপার মনে করে তারা।

এবার বুঝো, এ কেমন বাংলাদেশে আমরা বসবাস করছি। আমাদের ছেলেমেয়েরা কীভাবে নিজেদের ভবিষ্যৎ ধ্বংসের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। অথচ আল্লামা শফী সাহেব এ ব্যাপারে নিজের ভাষায় সতর্ক করলেই আমরা তাকে সেকেলে, আনকালচার্ড, অসামাজিক বলে গালি দিতে মোটেও পিছপা হই না। অথচ সারাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের মুরব্বি হিসেবে তিনি এমন দরদি ভাষায় নসিহত করতেই পারেন।

প্রিয় তাহিয়া–

তোমার মনে রাখতে হবে, এখানে যে জরিপের ফলাফল তোমাকে জানালাম, এটা কিন্তু কলেজ-ভার্সিটি বা সাধারণ নারীদের ওপর জরিপ

নয়, এটা স্কুলের মেয়েদের ওপর করা জরিপ। যারা এখনো এসএসসির নিচে অধ্যয়নরত এবং তাদের কারোরই বয়স ১৬-১৭-এর ওপরে নয়।

তো আমাদের সুশীল নারীনেত্রী আর সংসদ সদস্যরা এই বাস্তবতায় নিজেদের অবস্থান কোথায় তুলবেন? সমাজ যেখানে চাক্ষুষ পাপাচারে লিপ্ত হচ্ছে, মেয়েরা যখন ইচ্ছা-অনিচ্ছায় সর্বক্ষেত্রে যৌনতার মতো ভয়াবহ ব্যাধিতে আক্রান্ত, সেখানে আল্লামা শফীর এই সহজ কথন কেন তাদের গায়ে কাঁটা দেয়? তিনি বিষয়গুলো সহজ আর সরল ভাষায় বলেছেন বলেই কি তিনি এতোটা প্রশ্নবাণের শিকার হয়েছেন? নাকি এসব কথা বলে মানুষকে সচেতন করলে অনেকেরই ভোগবাদী চরিত্র খসে পড়ার ভয় আছে?

প্রিয় তাকিয়া–

'সিগমুন্ড ফ্রয়েড'-এর নাম শুনেছো কখনো? তিনি ছিলেন বিগত শতাব্দীর অন্যতম একজন মনোবিজ্ঞানী। মনোবিজ্ঞান এবং মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে তার থিওরি পৃথিবীতে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়ে আছে। তিনি নারী-পুরুষের মানবীয় সম্পর্কের ব্যাপারে অনেক নতুন নতুন তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে বিশ্ববাসীকে অবাক করে দিয়েছিলেন।

এখন সিগমুন্ড ফ্রয়েডের থিওরি অনুযায়ীই তোমাকে কিছু তাত্ত্বিক পর্যালোচনা দেখাবো।

আচ্ছা, নারীকে দেখলে পুরুষের কামভাব জাগবে, এতে অবাক হওয়ার কী আছে? এটার মধ্যে রুচি-কুরুচির কী আছে? এটা আদম থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের প্রতিটি পুরুষের বেলায়ই প্রযোজ্য। এটা তো মানুষের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি।

এ কারণেই মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড ব্যাপারটি অত্যন্ত সহজ সাবলীল ভাষায় বলেছেন, 'কামভাবটা নারী-পুরুষের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি (ন্যাচারাল টেনডেন্সি) এবং এর অনুপস্থিতি ঘটলে কোনো নারী কিংবা পুরুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না।' –*Three contributions to the theory of sex.*

নারীদের ব্যাপারেও ফ্রয়েড অত্যন্ত চমৎকার কথা বলেছেন– *The great question that has never been answered, and which*

I have not yet been able to answer, despite my thirty years of research into the feminine soul, is What does a woman want? -From Sigmund Freud: Life and Work by Ernest Jones, 1953

প্রিয় মুবাশশিরা–

আগেই বলেছি তোমাকে, সিগমুন্ড ফ্রয়েডকে বলা হয় আধুনিক মনোবীক্ষণের জনক। তিনিই নারী-পুরুষের যৌনতার ব্যাপারে এভাবে খোলাখুলি মন্তব্য করেছেন এবং মোটা দাগে বলে দিয়েছেন, নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ থাকবেই– এটা স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। সেটা স্কুল হোক, কলেজ হোক, চাকরি কিংবা পথেঘাটে হোক; নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ অনস্বীকার্য।

সেই হিসেবে আল্লামা আহমদ শফী কুরআন-হাদিসের আদেশ-নিষেধকে উপমার ভঙ্গিমায় বলেছেন। তার উপমা এবং সোজা-সাপ্টা কথায় যদি কারো আঁতে ঘা লাগে, তাহলে সেটা যার যার ব্যক্তিগত বিষয়। সেটা নিয়ে রাজনৈতিক ইস্যু তৈরি করা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাদের স্মরণ রাখা উচিত, হেফাজতে ইসলামের ক্ষত এতো তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে না বাঙালির বুক থেকে।

প্রিয় হোমায়রা–

তোমাকে জানাচ্ছি এই– আল্লামা আহমদ শফী সাহেবের এ বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছিলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও। আমাদের প্রধানমন্ত্রীও বড় গুণী মানুষ। কুরআন-হাদিসের উদ্ধৃতি দিতে তার জুড়ি মেলা ভার। এ কারণেই তার কাছের নেতা-কর্মীরা প্রায়ই ভয়ে থাকেন– কখন নেত্রীর জবান খুলে যায়! আল্লামা শফীকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন, 'নবিজির স্ত্রী ব্যবসা করতেন। তিনি তার স্ত্রীকে ব্যবসা করতে বারণ করেননি। তাছাড়া নবিজি জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনে সুদূর চীন দেশেও যেতে বলেছেন। সেখানে তিনি নারী বা পুরুষ আলাদা করে বলেননি।'

আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে কে বোঝাবে, রাসুলের স্ত্রী খাদিজা যখন ব্যবসা করতেন, তখন আমাদের নবি নবিই হননি। তিনি নবি হওয়ার

পর যখন খাদিজা মুসলমান হন, তৎপরবর্তী সময়ে তিনি ইসলামের কোন আদেশ-নিষেধটা অমান্য করেছেন, এটা প্রধানমন্ত্রীকে কে জানাবে? প্রধানমন্ত্রীর এটাও জানা থাকা প্রয়োজন– নবুওয়াতের পরপরই পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়নি, পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়েছে আরও অনেক পরে।

তাছাড়া তিনি চীন দেশে জ্ঞানার্জনে যাওয়ার যে বাণী দিলেন, সেটা আদতে কোনো হাদিসই নয়, এটা জাল হাদিস বা সাধারণ আরবি প্রবাদ মাত্র।

প্রিয় মানসুরা–

আরও অবাক করার মতো বিষয়টা কী জানো? আল্লামা শফীর ব্যাপারে অভিনেত্রী রোকেয়া প্রাচীসহ কতিপয় নট-নটী অভিযোগ করেছেন, তিনি নাকি ধর্মের অপব্যাখ্যা করছেন। কী আজিব কথা! তিনি ৭০ বছর ধরে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ মাদরাসায় শিক্ষাদান করে কুরআন-হাদিসের অপব্যাখ্যা করেন, আর রোকেয়া প্রাচী এবং তার মতো সুবিধাভোগী নারীনেত্রীরা দেশবাসীকে ইসলামের বিধিবিধান শিক্ষা দেন! এর চেয়ে বড় কৌতুক আর কী হতে পারে!

বুঝলে, দেশবাসী সবচেয়ে অবাক হয়েছে রোকেয়া প্রাচীর আস্ফালিত বক্তব্য শুনে। যাকে নাটক-সিনেমায় সাধারণত পতিতার চরিত্রে নির্বাচন করা হয়, কারণ তিনি এই চরিত্রে সবচেয়ে বেশি মানানসই। তিনি ৭০ বছর হাদিস শিক্ষাদানকারী আলেমকে বললেন, আপনি তওবা করুন! বুঝো অবস্থা!! একজন পতিতা চরিত্রের অভিনেত্রী, যার দুই স্বামী বিগত হয়েছেন, তিনি নব্বই-ঊর্ধ্ব দেশবরেণ্য সর্বজনমান্য একজন আলেমকে বলছেন, আপনি তওবা করুন!

তার এমন আস্ফালনে দেশবাসী তো শঙ্কায় আছে, কবে যেনো তারা বলবেন– পতিতালয় ছাড়া নামাজ সহিহ হবে না!

আল্লামা শফীর বক্তব্য যদি ধর্মের অপব্যাখ্যাই হতো তাহলে একজন ধর্মবেত্তা, আলেম, পীর-মাশায়েখ অন্তত তার এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করতেন। কিন্তু তার এই পুরোনো ভিডিও প্রকাশ পাওয়ার পর একজন আলেম বা মাদরাসাশিক্ষকও প্রতিবাদ করেননি। অথচ ধর্ম নিয়ে আগ

বাড়িয়ে ময়দানে নামলেন কয়েকজন টিভি ও সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রী। ইসলামের ঠিকাদারি কারা নিয়েছে এবার বুঝতে পারছো?

প্রিয় মুন্নি–

এবার কিছু স্বতঃসিদ্ধ রেফারেন্স তুলে ধরছি তোমার সামনে। আমার ধারণা, রেফারেন্সগুলো পড়তেই তোমার মাথায় একটা চক্কর দিয়ে উঠবে। তবে ভয় পেয়ো না, রেফারেন্সগুলো পড়ার পর তোমাকে বিষয়টি পরিষ্কার করে খুলে বলবো। আগে রেফারেন্সগুলো পড়ো, আমাদের সর্বমান্য স্কলারগণ নারীকে কী নজরে দেখেছেন, তার একটা শুদ্ধ ফিরিস্তি পাবে তুমি এগুলোর মধ্যে।

'পুরুষ প্রভু, নারী দাসী।' –*অ্যারিস্টটল*

'পুরুষ হচ্ছে অনিবার্য, অপরিহার্য, অবধারিত; আর নারী হচ্ছে আকস্মিক, অপ্রয়োজনীয়, অতিরিক্ত।' –*মিশেল ফুকো*

'নারী ভূমি, নারী উর্বর, তবে ওই উর্বরতা সৃষ্টিশীল নয়, তাকে সৃষ্টিশীল করে পুরুষ।' –*হিপক্রিটাস*

'রয়েছে এক শুভ নীতি, যা সৃষ্টি করেছে শৃঙ্খলা, আলোক ও পুরুষ; রয়েছে এক অশুভ নীতি, যা সৃষ্টি করেছে বিশৃঙ্খলা, অন্ধকার ও নারী।' –*পিথাগোরাস*

'নারী এমন এক রাজ্য, যাকে শুধু জয় করলেই হবে না, সম্পূর্ণরূপে পরাভূত, পর্যুদস্ত আর পদদলিত করতে হবে, যেনো সে লন্ডভন্ড হয়ে যায়।' –*নেপোলিয়ন*

'নারীর জন্মই হয়েছে পুরুষাধীন থাকার জন্য, তাকে চিরকাল তা-ই থাকতে দাও।' –*রুশো*

'পুরুষ প্রভু, নারী তার সেবিকা; গৃহে থাকা, সংসার করা, পুরুষের সেবা করাই নারীর প্রকৃত স্থান ও শক্তি।' –*রাসকিন*

'নারী ভালোবাসার জন্য, জানার জন্য নয়।' –*অস্কার ওয়াইল্ড*

'নারী একই সঙ্গে একটি আপেল ও সাপ।' –*হেনরিক হাইনে*

'কোলে থাকিলেও নারী, রেখো সাবধানে

শাস্ত্র, নৃপ, নারী কভু বশ নাহি মানে।' –*রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

'নারী কভু নাহি চায় একা হতে কারো
এরা দেবী এরা লোভী
যত পূজা পায় এরা চায় তত আরো
ইহাদের অতিলোভী মন
একজনে তৃপ্ত নয়, এক পেয়ে সুখী নয়
যাচে বহুজন।' –*কাজী নজরুল ইসলাম*

প্রিয় লামিয়া–

এসব রেফারেন্স পড়ে নিশ্চয় মনে মনে তুমি বেশ খানিকটা দমে গেছো। ভাবছো, যারা ইতিহাসের রথী-মহারথী, যাদের সারা পৃথিবীর মানুষ মান্য করে, তারা নারীর ব্যাপারে কীভাবে এমন কথা বলতে পারলেন? যাদের কথা এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে, তারা সবাই কিন্তু প্রগতির একেকজন ডাকসাইটে ধ্বজাধারী। প্রগতিবাদীরা তাদের কথা চোখ বুজে মান্য করে।

কিন্তু অ্যারিস্টটল, পিথাগোরাস, রুশো, রবি ঠাকুর যা বলে গেছেন নারী সম্বন্ধে– এখন আমাদের মানতে হবে, তাদের এসব কথা মিথ্যে। অন্তত আমাদের তা-ই মানতে হবে। তারা তাদের গভীর জীবনবোধ এবং দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা দিয়ে নারীকে যতোটুকু মাপতে পেরেছেন, আল্লামা শফী সমাজে নারীদের কার্যকারিতা মাপতে জীবনবোধের গভীরতা ততোটা বুঝতে পারেননি। আর তাতেই গোল বেধেছে সংসদ থেকে চায়ের দোকানে।

জার্মান বিজ্ঞজন হেনরিক হাইনে নারীকে সাপ বললে সেটি হয়ে যায় 'বাণী চিরন্তন', আর আল্লামা শফী নারীকে 'তেঁতুল'-এর সঙ্গে সাযুজ্য দিলে সেটি হয়ে যায় অশ্লীল-কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য। ব্রিটিশ চিত্রশিল্পী রাসকিন নারীকে পুরুষের সেবিকা বললে, তাকে গৃহকোণের আলোকবর্তিকা বললেও তিনি পূজনীয়, পক্ষান্তরে আল্লামা শফী তাকে গৃহের রানি বললে তিনি হয়ে যান নারীবিদ্বেষী। কাজী নজরুল নারীকে অতিলোভী বলতে পারলেন, আর আল্লামা শফী হয়ে গেলেন নারী অবমাননাকারী।

প্রিয় নাসরীন–

শাহবাগের ঘটনা তো তোমার বেশ ভালো করেই মনে আছে। নাস্তিক ব্লগারকেন্দ্রিক যে মরা বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিলো, দেশবাসী তা সহজে ভুলবে না। তোমারও ভোলার কথা নয়। সেই শাহবাগ ঘটনার পর কথাসাহিত্যিক হাসানাত আবদুল হাই শাহবাগের কোনো এক নারীর দেহদানের ফিরিস্তি নিয়ে 'প্রথম আলো' পত্রিকায় একটি গল্প লেখেন। তার গল্পটি প্রকাশিত হওয়ার পরপরই শাহবাগীরা তো বটেই, প্রগতিবাদীরাও রোষে ফেটে পড়ে। তাকে বয়কট করা হয় সমস্ত পত্রপত্রিকা থেকে।

কিন্তু কেন? হাসানাত আবদুল হাই শাহবাগী কোনো মেয়ের নষ্টামির কথা লিখলেই সেটি হয়ে যায় নারীর অবমাননা, কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক, আল মাহমুদ, নির্মলেন্দু গুণ, হুমায়ুন আজাদ, হেলাল হাফিজরা যখন নারীর বিভিন্ন অঙ্গসৌষ্ঠবের আকার, ধরন, বর্ণ, উপকারিতা নিয়ে সাহিত্যের তুবড়ি ছোটান, তখন সেটি তারানা হালিমদের কাছে হয়ে যায় উপাসনার বিষয়। এর চেয়ে অবিচার আর কী হতে পারে!

প্রিয় রুবা–

বিশ্বসাহিত্যের দিকে একবার তাকিয়ে দেখো, সেখানে নারীকে কীভাবে উপস্থাপন করা হয়। সেই সুদূর ইতিহাস থেকে নিয়ে শুরু করে বর্তমান সব সাহিত্য অধ্যয়ন করো, দেখবে, সেখানে নারীকে কেবলই যৌনতার পূজ্য বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

যদি নিদেনপক্ষে বাংলা সাহিত্যের দিকেও তাকাও, তবে সেখানে নারীকে নিয়ে নামী আর বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের এমন সব পঙ্‌ক্তি এবং লেখা পাবে, যেগুলো সাধারণ ভদ্রসমাজে পাঠের উপযোগী নয়। তবু যতোটুকু ভদ্র জিনিস উপস্থিত করা যায়, ঠিক ততোখানিই আমাদের কুলীন সুশীল সমাজের সুরুচিকর সাহিত্যপ্রতিভা আমি তুলে ধরছি তোমার সামনে। আশা করি এতোটুকু অভব্যতা মার্জনা করবে তুমি।

ব্যথাতুর প্রেমের কবি নির্মলেন্দু গুণ তার 'স্ত্রী' কবিতায় স্ত্রীকে ভালোবাসা শিখিয়েছেন এই ভাষায়–

রান্নাঘর থেকে টেনে এনে স্তনগুচ্ছে চুমু খাও তাকে
বাথরুমে ভেজানো দরোজা ঠেলে অনায়াসে ঢুকে যাও-
সে যেখানে নগ্ন দেহে স্নানার্থেই তৈরি হয়ে আছে

আল মাহমুদের 'সোনালী কাবিনে' তিনি উদারহস্তে ঢেলেছেন নারীর প্রতি তার 'সুরুচি'র বাহাদুরি−

'তারপর তুলতে চাও কামের প্রসঙ্গ যদি নারী
খেতের আড়ালে এসে নগ্ন করো যৌবন জরদ
শস্যের সপক্ষে থেকে যতটুকু অনুরাগ পারি
তারো বেশী ঢেলে দেবো আন্তরিক রতির দরদ।

(সনেট ১০ : সোনালী কাবিন)

কবি ও লেখক সৈয়দ শামসুল হক আল্লামা শফীর সমালোচনায় বিবৃতি দেয়া ১৭ জন বিশিষ্টজনের মধ্যে একজন। তার লেখাজোখা নিয়ে কথা বলতেও বিবাহিত হতে হয়। অবিবাহিতদের জন্য সাধারণত তার রচনা পড়া নিষিদ্ধ। তিনি প্রাপ্তবয়স্কদের লেখক। দেখো তার অ্যাডাল্ট কবিতা−

শত বাধা সত্ত্বেও থামতে পারে না কামুক পুরুষ
দুজনের দেহ ছিঁড়ে বের হয় দুধ-পূর্ণিমা
আর তা নেমে আসে স্তনের চূড়ায়
বাড়তে থাকে কামনার জ্বর
আর জ্বরতপ্ত হাত কুড়ায় কামনার ফুল।

(ভালোবাসার রাতে-২৯)

হুমায়ুন আজাদের কবিতা এখানে উল্লেখ করা গেলো না অতিরিক্ত 'রুচিবোধে'র কারণে। তবে তার একটি বচন অমৃত পড়তে পারেন পাঠকসকল− 'চোখের সামনে আমার মেয়ে বড় হচ্ছে। কিন্তু সামাজিক নিয়মের বেড়াজালে আমার হাত-পা বাঁধা।'

প্রিয় বুশরা−

কী, রাগ হচ্ছে আমার ওপর? আমি তো কেবল বিখ্যাত কবিদের কিছু পঙ্ক্তি তুলে দিলাম মাত্র, এমন আরও শত শত কবি আছেন,

যাদের কবিতায় এর চেয়েও বহু ভয়াবহ অশ্লীলতা পাবে তুমি। যারা নারীদের অঙ্গসৌষ্ঠবের কুরুচিপূর্ণ উপমা টেনে আমাদের দেশে কবি বলে সর্বমহলে সমাদরে সমাদৃত হন।

সুতরাং বুঝতেই পারছো, এই হলো আমাদের সুশীল আর সভ্য সমাজের রুচিবোধ। আল্লামা শফী গ্রামের সহজ-সরল ভাষায় বললেই সেটা হয়ে যায় কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য আর সমাজের ভোগবাদী পুরুষরা বললে সেটা হয়ে যায় রমণীবান্ধব শ্লোকমালা। এখানেই আল্লামা শফীর পরাজয়।

প্রিয় তোবা–

এ কারণেই সাংবাদিক ফারুক ওয়াসিফ এই ঘটনার পরপর এক কলামে লিখেছিলেন, বার্বি ডল আর সেক্সি গ্রেনেডের যুগে পারবে না হেফাজত...।

কারণ ইসলামপন্থীরা জানে না, কী করে নকল স্ক্যান্ডাল তৈরি করতে হয়। তাদের কাছে কোনো ব্যক্তির দোষ ধরা কুরআনের পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ। হাদিস বলে, অন্যের দোষ তুমি গোপন রাখো, আল্লাহ তোমার দোষ গোপন রাখবেন। এই নির্দেশের পর কীভাবে তারা প্রতিপক্ষের দোষ খুঁজতে যাবে?

এ জন্যই হয়তো ফারুক ওয়াসিফরা আক্ষেপ করে বলতে পারেন, সেক্সি গ্রেনেড আর বার্বি ডলের যুগে আপনাদের (হেফাজতের) বেইল নাই...।

এফএম দুনিয়ার দিবানিশি

প্রেম ছাড়া চলে না দুনিয়া

প্রিয় উম্মে সালমা–

এফএম রেডিও শোনো? নিয়মিত না শুনলেও মাঝে মাঝে হয়তো শোনো। অথবা কখনো কখনো প্রয়োজনের খাতিরেও হয়তো শুনে থাকবে! বর্তমান সময়ে তো এফএম রেডিও তরুণদের মধ্যে বেশ একটা ক্রেজ সৃষ্টি করেছে। সারাদিন ইয়ারফোন কানে লাগিয়ে শুনছে তো শুনছেই। দুনিয়ার আর কোনোদিকে তাদের ধ্যান-জ্ঞান নেই।

আজকে কথা বলবো এই এফএম রেডিও নিয়েই। এফএম রেডিওগুলো আসলে কী করছে বা কীভাবে তরুণ মগজ ধোলাই করছে, তার একটা সুরতহাল প্রতিবেদন তোমাকে না জানালেই নয়।

তার আগে তোমাকে একটা মজার কাণ্ড বলি!

প্রিয় সামিয়া–

দৈনিক 'আমাদের সময়' পত্রিকাটা চেনো? চেনার কথা। একসময় খুব নাম করেছিলো ভিন্নধর্মী এ পত্রিকাটি। এ পত্রিকার সাবেক বিতর্কিত এবং বিখ্যাত সম্পাদক নাঈমুল ইসলাম খান 'আমাদের সময়ের' সম্পাদক থাকাকালে 'সচিত্র সময়' নামে একটি ম্যাগাজিন বের করতেন। সে ম্যাগাজিনের প্রথম বা দ্বিতীয় সংখ্যায় একজন প্রতিবেদক বাংলাদেশে অনলাইনে পর্নো ছায়াছবির বিস্তার নিয়ে একটি প্রতিবেদন লেখেন। প্রতিবেদক সেই প্রতিবেদনে অত্যন্ত শঙ্কার সঙ্গে জানান, বাংলাদেশে পর্নোসাইট ভিজিট করা ভয়াবহভাবে বেড়ে গেছে, এগুলো থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে, এগুলো যুবসমাজের জন্য খুবই ক্ষতিকর ইত্যাদি

ইত্যাদি। এবং মজার বিষয় হলো, প্রতিবেদক সাহেব তার প্রতিবেদনে কোন কোন ওয়েবসাইটে বাংলাদেশিরা পর্নো ছায়াছবি দেখছে তার একটা সূচি-ফিরিস্তিও লিখে দেন!

সুতরাং বুঝতেই পারছো, এ প্রতিবেদন পড়ার পর সেসব পর্নোসাইটে ভিজিটর কমেছিলো নাকি বেড়েছিলো। যে জিনিসের প্রতি নিষেধাজ্ঞা, সে জিনিসের প্রতি মানুষের কৌতূহল দুর্নিবার। নাঈমুল ইসলাম খান এ কৌশলটিকেই কাজে লাগিয়েছিলেন।

প্রিয় সাবিনা–

যাকগে, বলছিলাম আমাদের দেশের এফএম রেডিও নিয়ে। আমাদের বিনোদনমাধ্যমে এই অধুনা সংযোজিত এফএম রেডিওগুলোও কিছু কিছু অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঠিক সেই কাজটিই করছে, যে কাজটি সুচতুর সাংবাদিক নাঈমুল ইসলাম খান করেছিলেন। তারা রাতের বিশেষ সময়ে বিশেষ অনুষ্ঠান করে বিশেষ বয়সের শ্রোতাদের বিশেষ কাহিনি শুনিয়ে বলছে– এসব কাজকর্ম থেকে সবার দূরে থাকা উচিত!

হাস্যকর বটে! চলো, ঘটনার ভেতরে ঢোকা যাক।

প্রিয় আসমা–

একটা সময় ছিলো যখন আল্ট্রামডার্ন তরুণদের বলা হতো ডিজুস প্রজন্ম। ডিজুস প্রজন্ম গত হয়েছে। এরপর এসেছে এফএম প্রজন্ম। এদের পরিচিতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এরা সারাদিন কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে ঘোরে। ঘরে থাকলেও অবধারিতভাবে ইয়ারফোনের হেড দুটো কানের মধ্যে লেগেই থাকে। সারাদিন এদের মোবাইল প্লেয়ারে বাজছে বাংলা-হিন্দি-ইংরেজি জ্যাজ, হিপহপ, র‍্যাপ, রক, হেভি মেটাল, রিমিক্স গানের গুরুভোজ। শোনার কিংবা শোনানোর কোনো কমতি নেই কোনো পক্ষেরই।

আর রাত হলে তো কথাই নেই! রাতেই সাধারণত প্রচারিত হয় এফএম রেডিওগুলোর জাঁকালো অনুষ্ঠান। প্রতিটি রেডিও স্টেশনের সাপ্তাহিক কিংবা প্রতিদিনকার বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার হয় রাতের বেলা। রাত এগারোটা কিংবা বারোটার পর। সারাদিন নানা কিসিমের গানে

মাতোয়ারা থাকলেও, রাত বাড়লেই শুরু হয় রেডিওগুলোর 'জীবনঘনিষ্ঠ' অনুষ্ঠানের বহর।

প্রিয় বিলকিস–

এফএম রেডিও শুনে থাকলে বুঝতে তাদের রাতের সেগমেন্টগুলো কতোটা বেপরোয়া। কীভাবে তারা শ্রোতাদের মন-মগজ আচ্ছন্ন করে রাখে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। রাত এগারোটার পর 'লাভগুরু', 'আমার ভালোবাসা', 'যাহা বলিব সত্য বলিব', 'জীবনের গল্প', 'প্রেমরোগ'সহ আরও বিভিন্ন নামে রেডিও চ্যানেলগুলো নানা চটকদার অনুষ্ঠানের পসরা বসায়। সেসব পসরায় শ্রোতাদের আকৃষ্ট করতে দারুণ দারুণ সব পন্থা আবিষ্কার করেছেন চ্যানেলের আরজে আর প্রযোজকরা। যেহেতু রেডিওর নব্বই ভাগ শ্রোতাই কিশোর-তরুণ, তাই রাতের গভীরে লেইট নাইট শোর নামে রেডিও স্টেশন থেকে জিগির তোলে অবলা প্রেমকাহিনি।

প্রতি সপ্তাহে এসব অনুষ্ঠানে নিজেদের প্রেমকাহিনি শ্রোতাদের শোনাতে রেডিও কর্তৃপক্ষের কাছে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রেমকাতর প্রেমিক-প্রেমিকাদের আবেদন আসে। কর্তৃপক্ষ সেসব আবেদনকারীর কাছে ফোন করে তাদের কাহিনি শুনতে চান। যার কাহিনি শ্রোতাদের আকৃষ্ট করবে বলে মনে হয়, তাকে নির্বাচন করা হয় নির্দিষ্ট দিনের কাহিনিকার হিসেবে। নির্দিষ্ট দিনে কাহিনিকার রেডিও স্টেশনের স্টুডিওতে এলে তার কাছে প্রথমে জানতে চাওয়া হয় তার পুরো কাহিনি। পুরো কাহিনি শোনার পর ওই অনুষ্ঠানের আরজে (রেডিওজকি) তাকে বলে দেন তাকে ঠিক কোন কোন অংশ বলতে হবে এবং কোন কোন অংশ কাহিনি থেকে বাদ দিতে হবে। এরপর তার ভয়েস টেস্ট করে তাকে শেখানো হয় কীভাবে মাইক্রোফোনের সামনে কথা বলতে হবে, কীভাবে কথার টিউন ঠিক রাখতে হবে। সবকিছু শেখানো, পড়ানোর পর রাত গভীর হলেই শুরু হয় একটি জলজ্যান্ত প্রেমকাহিনির লাইভ অনএয়ার।

প্রিয় লাবণী–

বলতে পারো, কী থাকে এসব গভীর রাতের অনুষ্ঠানগুলোতে? সত্যি কথা বলতে– নিরেট প্রেমকাহিনি। গত কিছুদিন আগে এক যুবক একটি লাইভ অনুষ্ঠানে এসে তার জীবনের প্রেমকাহিনির বয়ান পেশ করলেন।

তার প্রেমকাহিনি অনেকটা এমন–

তার প্রেমিকজীবনের শুরু হয়েছিলো ক্লাস সেভেনে থাকতে। তার প্রেমিকা তখন ক্লাস সিক্সের উদীয়মান ছাত্রী। পাশের বাসার মিষ্টি মেয়ের সঙ্গে পাশের বাসার দুষ্টু ছেলে টাইপের প্রেমে পড়ে এই নাবালক যুগল। বুঝো অবস্থাটা! এই ছেলেমেয়ের বয়স তখন কতো? বড়জোর ১৩-১৪। এই বয়সেই প্রেম হলো। সেই প্রেমের কথা অকপটে তিনি এসে বলে গেলেন লাখো শ্রোতার কাছে। শুধু তা-ই নয়, প্রেমের এক বছর আগে তার জীবনে আসে গাঁজা! তিনি সিগারেটের সঙ্গে গঞ্জিকা সেবন শুরু করেছিলেন ক্লাস সিক্সে থাকতে। তিনি সে কথাও শ্রোতাদের শুনিয়েছেন। তাতে আরজে সাহেবের কোনো দ্বিমত বা ভ্রুকুটি দেখা গেলো না। তিনি নির্দ্বিধায় ঘটনাকে সামনে টানতে উদ্বুদ্ধ করলেন।

প্রিয় হাজেরা–

আচ্ছা, আমাকে বলো তো, এই যে নাবালক বয়সের ছেলেমেয়ের প্রেমকাহিনি প্রচারিত হলো লাখ লাখ শ্রোতার কাছে, এর দ্বারা এই রেডিওজকি শ্রোতাদের আসলে কী শেখাতে চাচ্ছেন? শ্রোতারা তিন ঘণ্টার একটি লাইভ জীবনী শুনে কী শিক্ষা গ্রহণ করলো? কিশোর-কিশোরীদের অবাধ প্রেমের বৈধতা? প্রেমের জন্য রাতের পর রাত জাগা? নাকি গাঁজা সেবনের সর্বজনগ্রাহ্যতার সার্টিফিকেট?

লাখ লাখ কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী এসব অনুষ্ঠান রাত জেগে শুনছে। শুনে প্রেমময় উত্তেজনা ছাড়া তাদের অন্তর্মহলে আর কোনো ফায়দা হাসিল হবে বলে আশা করা যায় না। রেডিওগুলো সেই ফায়দার ঠিকাদারিই নিজ দায়িত্বে নিজ কাঁধে নিয়ে নিয়েছে।

প্রিয় তনু–

এ তো গেলো কেবল একজন যুবকের কথা। প্রতিটি রেডিও চ্যানেলেই সপ্তাহে এমন দু-তিনটি অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। প্রতিটিতেই এমন কোনো যুবক-যুবতীকে শ্রোতাদের সামনে হাজির করা হয়। তাদের সবার কাহিনির মধ্যে প্রেম তো অবশ্যই থাকে; সেই সঙ্গে থাকে ট্র্যাজেডি, ঘাত-প্রতিঘাত, জীবনসংগ্রাম, বেদনা, পরিণয়, পরকীয়া, লিভিং টুগেদার, এমনকি মানব-মানবীর শারীরিক সম্পর্কের কথাগুলোও অবলীলায় তরঙ্গায়িত হয় এসব বেতার তরঙ্গ অনুষ্ঠানে।

এক যুবতী একটি সরাসরি সম্প্রচারিত হওয়া অনুষ্ঠানে এসে বলছেন, তিনি অনেকের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করেছেন। স্বামী ছাড়াও কার সঙ্গ কেমন অনুভব করেছেন, সেসবও তিনি নির্লজ্জভাবে বলেছেন শ্রোতাদের কাছে।

নোংরামির আর কী বাকি থাকতে পারে? এই নোংরামি দিয়ে কি আরও দশজন উঠতি বয়সীকে নোংরা হতে উদ্বুদ্ধ করা হলো না? একবার এক প্রেমিকযুগলের দীর্ঘ বিরহের পর তাদের ভাঙা প্রেম আবার জোড়া লাগিয়ে দিয়েছিলেন 'লাভগুরু' নামে খ্যাত এক সঞ্চালক। প্রেমিক-প্রেমিকা উভয়কে ভিন্ন ভিন্নভাবে ডেকে এনে এই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন এই অতিকথনপ্রিয় লোকটি। প্রেম ছাড়া কি এফএম দুনিয়ায় আর কোনো ঘটনাই ঘটে না?

প্রিয় নুসরাত–

তুমি কি চাও তোমার প্রেমকাহিনিটাও রেডিওতে গিয়ে বলবে? নিজের প্রেমের পরিণয় লাখ লাখ শ্রোতাকে শোনাতে চাও? উঁহু, তুমি ভাবলেই তো হবে না। এখানে অনুষ্ঠানের প্রডিউসারদের একটু কৌশল থাকে। রেডিওর অনুষ্ঠান প্রডিউসারদের কাছে যখন শ্রোতাদের পক্ষ থেকে এমন প্রেমকাহিনি শোনানোর আবেদন আসে, তখন তারা খুব চিন্তার সঙ্গে প্রার্থী বাছাই করেন। যে কাহিনিটার মধ্যে অধিকহারে চটুল প্রেম থাকবে, প্রেমে বাধা থাকবে, বাধা ডিঙানোর টান টান উত্তেজনা থাকবে; সেই কাহিনিটাকেই তারা গ্রহণ করেন নেক্সট এপিসোডের জন্য। সেই সঙ্গে

আরেকটি জিনিসকে তারা প্রেমকাহিনির সঙ্গে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড় করে দেখান, সেটা হলো প্রেমের সঙ্গে জীবনের মানবিক বিষয়গুলো।

অত্যন্ত সুকরুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয় প্রেমিক-প্রেমিকার ভালোবাসার ক্লাইমেক্স। এতে করে যেকোনো শ্রোতার মনেই সেই কাহিনিকারের প্রতি জেগে ওঠে অত্যন্ত দয়ার্দ্র সহানুভূতি। চোখের পাড় ভিজিয়ে ফেলেন অধিকাংশ শ্রোতা। মনের মধ্যে অনেকদিন গেঁথে থাকে 'সুখ তুমি কী বড় জানতে ইচ্ছে করে' টাইপের গানের কলি।

সুতরাং, তুমি বললেই তোমাকে তারা ডাকবেন না তাদের অনুষ্ঠানে। তোমার প্রেমকাহিনিতে থাকতে হবে এক কেজি আবেগী গদগদ ভাব, আধা সের চোখের পানি এবং পরিমাণমতো নির্লজ্জতা। এসব যদি তুমি প্রকাশ করতে পারো, তবেই তোমার চান্স আছে রেডিওতে তোমার প্রেমকাহিনি শোনানোর। নইলে তোমার পানসে প্রেমকাহিনি শুনতে বয়েই গেছে রেডিওওয়ালাদের। তারা এমন কাহিনিই চায়, যেগুলো শুনলে শ্রোতামাত্রই উহ-আহ করে উঠবে নিজের অজান্তেই। আছে তোমার প্রেমকাহিনিতে এমন আহা-উহু আবেগী প্লাবন? নির্লজ্জ হয়ে সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে বলতে পারবে সবার সামনে? যদি উত্তর নেগেটিভ হয়, তাহলে বাদ দাও। রেডিওজকির নির্লজ্জতার বাহার আর কতো দেখবে?

প্রিয় তানজিলা–

এসব অনুষ্ঠান যদি তুমি কখনো শোনো, খুব সহজেই বুঝতে পারবে– অধিকাংশ আরজেই তার অনুষ্ঠানে নানা ছ্যাবলামো করে কাঁচা বয়সের ছেলেমেয়েদের উদ্বুদ্ধ করছেন মহান প্রেমবিষয়ক কার্যক্রমে। এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা বা তার বেশি সময় ধরে চলা প্রতিটি সেগমেন্টে আরজেদের কাছে শ্রোতারা হাজার হাজার এসএমএস পাঠান। সেগুলো থেকে আরজেরা বেছে বেছে সেসব এসএমএসই পড়ে শোনান যেগুলোতে প্রেমবিষয়ক বার্তা থাকে।

তারা প্রেমিককে বানিয়েছেন বয়ফ্রেন্ড, প্রেমিকাকে বানিয়েছেন গার্লফ্রেন্ড। কোনো মেয়ে তার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে ঝগড়া করলে কিংবা মান-অভিমান করলে তা লিখে পাঠান আরজের কাছে। আরজে তা মহা

উল্লাসে পড়ে শোনান শ্রোতাদের এবং বয়ফ্রেন্ডকে (বয়ফ্রেন্ড মানে প্রেমিক পড়তে হবে) সামান্য নসিহতও করেন মান ভাঙানোর জন্য। অনেকে লিখে জানান, তিনি আজ গার্লফ্রেন্ডকে (গার্লফ্রেন্ড মানে প্রেমিকা পড়তে হবে) নিয়ে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। আরজে আরেকটু বাড়িয়ে শ্রোতাদের শোনান, পরেরবার ঘুরতে গেলে যেনো অমুক উদ্যানে যান। সেখানে ডেটিংয়ের (ডেটিং মানে একান্তে সময় কাটানো পড়তে হবে) উত্তম বাগিচা পাওয়া যায়।

প্রিয় আফ্রিদা–

তুমি যদি চাও তবে এসব অনুষ্ঠান চলাকালে সরাসরি ফোন করতে পারো অনুষ্ঠানের সঞ্চালকের কাছে। কেননা কিছু কিছু অনুষ্ঠানে সরাসরি ফোন করার সুযোগ থাকে। সেসব অনুষ্ঠানে ফোন করেন রেডিওর একনিষ্ঠ শ্রোতা তরুণ-তরুণীরা। আবার ফোনকলের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেয়া হয় তরুণীদের। তরুণীরা ফোন করে আরজের ছ্যাবলামোকে 'জোশ', 'অসাম' বলে গলার কর্ড কাঁপিয়ে তোলেন। আরজে আহ্লাদে আটখানা হয়ে তরুণীকে একটি গান গাইতে বলেন। তরুণী দু-তিন লাইন গাইলে আরজে আবার জিজ্ঞেস করেন, এতো রাতে জেগে আছো কেন? তরুণী গলায় পরিমাণমতো আবেগ ঢেলে বলেন, তোমার জন্যই তো। তুমিই তো ঘুমাতে দাও না...।

এবার বলো, নির্লজ্জতার আর কী বাকি থাকতে পারে?

প্রিয় ফেরদৌসী–

তোমার মতো যারা এফএম দুনিয়ায় কখনো পা রাখেনি, তাদের কাছে এই সুড়সুড়িমূলক কথাবার্তাকে অতিকথন বলে মনে হতে পারে, তবে বাস্তবতা এর চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ ও নগ্ন। আমি তোমার কাছে মাত্র অতি অল্প কিছু উদাহরণ পেশ করতে পেরেছি। ভদ্রতার চৌকাঠ না পেরোনোর আপ্রাণ কোশেশ করেছি।

তুমি প্রশ্ন করতে পারো, এই ধরনের সুড়সুড়িমূলক কর্মকাণ্ড দিয়ে এফএম রেডিওগুলোর ফায়দাটা কী? আসল ফায়দাটাই হলো ওই এসএমএস। এফএম রেডিওর মূল আয়ের পথ শ্রোতাদের পাঠানো

এসএমএস। প্রতিদিন শ্রোতাদের পাঠানো লাখ লাখ এসএমএস থেকে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের মুনাফা পায় তারা মোবাইল অপারেটর কোম্পানি থেকে। যতো বেশি এসএমএস ততো লাভ। সুতরাং, যেভাবে এসএমএসের ইনকামিং বাড়ানো যায়, সেই পন্থাই তারা অবলম্বন করে।

আমরা আগেই বলেছি, এফএম রেডিওর নব্বই ভাগ শ্রোতা কিশোর-কিশোরী আর তরুণ-তরুণীরা। এই বয়সের ছেলেমেয়েরা প্রেমবিষয়ক দুর্বলতায় ভোগে প্রায়ই। আর এফএম ব্যবসায়ীরা এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়েই ফেঁদেছেন তাদের এফএম ব্যবসা। নিজেদের ব্যবসাকে উর্বর করতে তারা নগ্নতা আর যৌনতাকে কাজে লাগাচ্ছেন তাদের পুঁজি হিসেবে। ব্যবসার জন্য এর চেয়ে বড় পুঁজি আর কোথায় পাওয়া যায়?

প্রিয় আনিকা–

কেবল উচ্চবিত্ত সোসাইটি কিংবা ভার্সিটির প্রাঙ্গণই নয়, প্রেম আর পরিণয়ের উগ্রতা ছড়িয়ে দিতে মোটেও কমতি নেই এফএম রেডিওগুলোতে। তরুণ-তরুণীদের অবাধ মেলামেশা, প্রেম-ভালোবাসা আমাদের সমাজ এবং নতুন প্রজন্মকে কতোটা নিচে নামিয়ে দিচ্ছে, তা অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়াই সমাজের হালচাল দেখে বোঝা যায়। সমাজের অধিকাংশ ছেলেমেয়ে এখন এসবে মত্ত। কোনো কারণে কেউ যদি এ গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসাতে না জানে, অশ্লীলতার অংশীদার না হতে পারে, তবে তার জন্যেও ব্যবস্থা রয়েছে। এফএম রেডিওর আরজেরাই আপনাকে নিজ দায়িত্বে বেহায়া হতে শেখাবেন। শেখাবেন প্রেম করার নানা কৌশল, কায়দাকানুন।

আবার মা-বাবার কাছে যেনো ধরা না খায়, সে ব্যাপারেও তারা নানা ধরনের টিপস দিয়ে থাকেন। আপনার প্রেমবিষয়ক যাবতীয় সমস্যার সমাধানে আরজেরা আছেন সদা প্রস্তুত।

প্রিয় খালেদা–

রেডিওর আরজেদের বদান্যতার একটি মজার অভিজ্ঞতা শোনাই তোমাকে। শুনলে তুমি না হেসে পারবে না। এ ঘটনা শুনলেই বুঝতে পারবে রেডিওজকিরা কতোটা হাস্যকর কাজ করে থাকেন।

এমনই একটি ভালোবাসায় টইটম্বুর লাইভ শোতে এসে এক মেয়ে তার ভালোবাসাবাসির কথা বলছিলো। প্রেমকাহিনির একপর্যায়ে সে জানায়, সে তার প্রেমিকের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করার ব্যাপারে আপত্তি জানায়। সে বিয়ের আগে এসব করতে ইচ্ছুক নয়...। তখন অনুষ্ঠান সঞ্চালক তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলেন, অবশ্যই, বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ক কোনোভাবেই উচিত নয়। প্রতিটি মেয়ের এ ব্যাপারে সচেতন থাকা প্রয়োজন। প্রেম মানেই শারীরিক সম্পর্ক নয়। প্রেম হলো দুটি মনের মিল, দুটো আত্মার মিলন...। বেশ ভালো কথা!

এবার মজার বিষয়টি শোনো। এই সঞ্চালকই কয়েক দিন পর একই অনুষ্ঠানে আরেকটি মেয়ের প্রেমকাহিনি শোনাচ্ছিলেন। প্রেমকাহিনির একপর্যায়ে মেয়েটি আবেগঘন হয়ে বলতে থাকে, সে তার প্রেমিকের জন্য সবকিছু বিসর্জন দিয়েছে। সে যখন যা বলেছে, তা-ই করেছে। তার ভালোবাসায় বিভোর হয়ে সে নিজের 'দেহমন' সব সঁপে দিয়েছে প্রেমিকের চরণতলে...।

এ পর্যায়ে সেই সঞ্চালক আগ বাড়িয়ে বলতে থাকেন, সেটা তো আপনি করবেনই। যাকে ভালোবাসবেন তাকে নিজের জীবনের সবকিছু দিয়েই ভালোবাসতে হয়। এটাই ভালোবাসার নিয়ম। জীবনের পরম সুখ যার কাছে পেয়েছেন, সে-ই তো সত্যিকারের প্রেমিক!

প্রিয় মালিহা–

এই দুটো ঘটনা দিয়ে কী বোঝাতে চেয়েছি তা নিশ্চয় বুঝতে কষ্ট হয়নি তোমার? দেখো, একই ব্যক্তি একই অনুষ্ঠানে ভিন্ন দুজন মানুষের সঙ্গে ভালোবাসার ভিন্ন দুটি সংজ্ঞা দিলেন। দুভাবে ব্যবচ্ছেদ করলেন ভালোবাসার অর্থ। এসবের মানে কী? এসবই আসলে শ্রোতা টানার সস্তা টেকনিক ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব যৌন সুড়সুড়িমূলক কথাবার্তা দিয়ে তারা রেডিওর আমশ্রোতা কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে যৌনতার সস্তা কাঁচামাল।

এভাবে ভালোবাসার সংজ্ঞাকে নানাভাবে মহিমান্বিত করে তারা না তরুণসমাজকে কিছু শেখাতে পারছেন, না শিক্ষামূলক কোনো কাজে

ব্যবহার করতে পারছেন সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য এ গণমাধ্যমটিকে। বরং তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছেন প্রেম-ভালোবাসার অযাচিত প্রভাব।

প্রিয় তানিশা–

এখন তোমাকে একটি বাস্তব ঘটনা শোনাবো। আমাদের সমাজেরই একটি ঘটনা। আমাদের আশপাশেই এমন ঘটনা অহরহ ঘটছে। আমরা হয়তো চোখ খুলে ঘটনার নেপথ্যের কারণ উদ্ঘাটনে চেষ্টা করি না। যদি একটু গভীর দৃষ্টিতে নজর দিতাম, তাহলে অনেক সত্যই আমাদের সামনে পরিস্ফুটিত হয়ে যেতো।

ধরো, আনিশা (ছদ্মনাম) ধার্মিক মেয়ে। নামাজ-রোজা, পর্দা-পুশিদায় সবসময় সচেতন। বিয়েও হয়েছে এক ধার্মিক ছেলের সঙ্গে। বিয়ের দেড় বছর পার করছে তারা। তার বর জসিমউদ্দীন (ছদ্মনাম) ব্যবসায়ী। ব্যবসার কাজে সকালে বেরিয়ে যায়, ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা। কোনো কোনোদিন রাতও হয়ে যায়। বাড়িতে শাশুড়িকে নিয়ে তাবাসসুমের একলা সংসার। সারাদিন ঘরের কাজ করেও তার হাতে অফুরন্ত সময়। ধার্মিক হওয়ার কারণে বাসায় টিভি-ভিসিডি বা অধার্মিক বিনোদনের কোনো মাধ্যম নেই। এক বান্ধবীর কাছ থেকে এফএম রেডিওর তালিম নিয়ে এখন তার বিনোদনের একমাত্র মাধ্যম হয়েছে ওটা। সারাদিন কাজের ফাঁকে ইয়ারফোন থাকে তার কানে।

এ পর্যন্ত সব ভালোই ছিলো। সমস্যাটা শুরু হলো মাস কয়েক যাওয়ার পর। তাবাসসুম তার স্বামীকে কেমন যেনো অবজ্ঞা করতে শুরু করে। সে অবজ্ঞা একসময় দাম্পত্য কলহে রূপ নিলো। সমস্যাটা কী? তাবাসসুমের দাবি– তার স্বামী যথেষ্ট আধুনিক নয়। সে ব্যাকডেটেড এবং খুবই হীনম্মন্য চিন্তার লোক। এই সমাজে প্রেজেন্ট করার মতো যোগ্য নয় সে... ইত্যাকার আরো নানা অভিযোগে সংসারে অশান্তি নেমে আসে প্রতিদিন। এবং সেই অশান্তি একসময় তাদের সংসারকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। ডিভোর্স হয়ে যায় তাদের।

প্রিয় রুখসানা–

ঘটনার নেপথ্য অনুসন্ধান করে জানা যায়, এফএম নামের এক অব্যর্থ মহৌষধে তাবাসসুম বুঝতে পারে– পৃথিবীটা অনেক বড়। নিজেকে ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখার কোনো মানে হয় না। আধুনিক সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে তাকে নিজের গণ্ডি ভাঙতে হবে। নিজেকে উদার করে সমাজের সামনে প্রেজেন্ট করতে হবে। যেখানে বন্ধু ছাড়া লাইফ ইম্পসিবল, সেখানে নিজেকে স্বামীর বেঁধে দেয়া ধরাবাঁধা নিয়মে চলাটা তার জন্য অসম্ভব। তাকে স্বাধীন হতে হবে, আর দশটা উচ্ছল মেয়ের মতো তাকেও বাধাহীন সময়ের স্রোতে গা ভাসাতে হবে।

কিন্তু সেই স্বাধীনতা দেয়া সম্ভব ছিলো না জসিমের মতো ধার্মিক ছেলের। ফলাফল কী হয়েছে তা তো তোমাকে আগেই বলেছি।

প্রিয় জেবিন–

অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে জানাচ্ছি– আমার জানামতে, চারটি নিটোল সংসার ভেঙে গেছে এফএম রেডিওর হরহামেশা প্রেমবিষয়ক 'জ্ঞানগর্ভ' যৌন উদ্দীপনার কারণে। এই চারটি পরিবারই ছিলো বেশ ধার্মিক। একটুখানি আধুনিক বিনোদনের স্বাদ চাখতে গিয়ে তাদের জীবনে নেমে এসেছে সংসার ভাঙার মতো দুঃসহ বেদনার অধ্যায়। তারা হয়তো জানতো না একটুখানি বিনোদনের নামে তারা আসলে তলিয়ে যাচ্ছে বিকট বীভৎস এক পঙ্কিল সরোবরে। যেখানে প্রতিক্ষণ প্রচারিত হয় অবলা নারীর 'সবল' হয়ে ওঠার কুমন্ত্রণা। গৃহবধূদের জন্য এফএম রেডিও সস্তা বিনোদনের খোরাক জোগালেও এটি অনেকভাবেই ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে দাম্পত্য জীবনে।

প্রিয় শিউলী–

তুমি জানো, এফএম রেডিও থেকে বিনোদন পেতে বড় ধরনের কোনো খরচ পোহাতে হয় না বলে এর প্রসার ঘটেছে খুব দ্রুত। যেকোনো সাধারণ মানের মোবাইলে এফএম রেডিওর সংযুক্তি থাকে।

তাই এটি বহন করতে আলাদা কোনো বেগ পেতে হয় না। এই সুযোগে ছাত্ররা এটিকে বিনোদনের সহজ মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে।

বিশেষ করে, মাদরাসার ছাত্রদের মধ্যেও এফএম রেডিও-রোগ প্রবল আকারে ছড়িয়ে পড়ছে। তাছাড়া মা-বাবা বা শিক্ষকদের কাছেও কোনো ধরনের কৈফিয়তের সম্মুখীন হতে হয় না। শুধু কানের ইয়ারফোনটি খুলে রাখলেই হয়। ধরা পড়ার চান্স অত্যন্ত কম। কিন্তু তারা বুঝতে পারছে না, সস্তা বিনোদন পাওয়ার অন্তরালে তারা আসলে নিজেদের সঁপে দিচ্ছে ভয়াবহ এক ভবিষ্যতের দিকে। আধুনিকতার নামে তাদের ভেতরে সাপ্লাই করা হচ্ছে যৌনতা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, নর-নারীর অবৈধ প্রেমের সর্বজনীন বৈধতা, সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতির আবর্জনা।

গান শোনা, অযথা সময় নষ্ট করা, টাকা খরচ করে এসএমএস করা, রাত জেগে পড়াশোনার ক্ষতি করা তাদের কাছে মামুলি ব্যাপার হয়ে ধরা দিচ্ছে। দ্রুত এসব থেকে ছাত্রদের বিরত রাখার পদক্ষেপ না নিলে এই এফএম-রোগ ধর্মীয় অঙ্গনকেও কলুষিত করবে নিঃসন্দেহে।

অসভ্যতার আগ্রাসন

ইন্ডিয়ার কী ঠেকা পড়েছে বাংলাদেশ দখল করার?

প্রিয় মায়মুনা–

যার কথা বলবো এখন তোমাকে, সে আমার বেশ পরিচিত ছিলো। অনার্সে একসঙ্গে পড়তাম আমরা। দেখতে মাঝারি আকারের এ মেয়ে শর্ট বোরকা এবং হিজাব পরে ভার্সিটিতে আসতো। অত্যন্ত ভদ্র এবং শান্ত-শিষ্ট মেয়ে। বাসা ঢাকাতেই। নিয়মিত বাসা থেকে এসে ক্লাস করতো। তো, এই মেয়েটির টিভি-দর্শন দিয়েই শুরু করছি এই লেখার প্রথম পাঠ।

ধরো, রাজধানীর একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সের ছাত্রী অজন্তা নীলিমা (ইচ্ছে করেই ছদ্মনাম ব্যবহার করতে হলো)। পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকে। ঘরের কাজে মাকে সাহায্যও করতে হয় মাঝেমধ্যে। দুটো টিউশনি আছে। সারাদিন টিভি দেখার সময় তার খুব একটা নেই। কিন্তু রাত নয়টা বাজলে তাকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না। কারণ, এ সময়ে একটি ভারতীয় চ্যানেলে তার প্রিয় এক নায়কের সিরিয়াল শুরু হয়। তাকে আর যা-ই করা হোক, এই সিরিয়াল দেখা থেকে কেউ সরাতে পারবে না। ঝড়-বৃষ্টি, ভূমিকম্প যা-ই হোক। সপ্তাহে ছয়দিনই সিরিয়ালটি দেখে সে নিয়মিত। কোনোদিন বিদ্যুৎ না থাকলে তার পরদিন দেখে। পরদিন এটি পুনঃপ্রচার করা হয়। এতে তার ভার্সিটির ক্লাস মিস হলেও আফসোস নেই। তার মোবাইলে সেভ করা আছে ওই নায়কের অজস্র ছবি। ওই নায়ক তার ধ্যানজ্ঞান।

এ শুধু একজন নীলিমার উদাহরণ দেয়া হলো, এমন হাজারো নীলিমা এখন ভারতীয় চ্যানেলের নানা অনুষ্ঠানে লীন হয়ে গেছে। চ্যানেল আর তার কুশীলবরা হয়ে গেছে তাদের অতি আপনজন। তাদের ভালোবাসার আখেরি মনজিল।

প্রিয় সুলতানা–

বলতে পারো, মানুষ যুদ্ধ করে কেন? এক দেশ আরেক দেশের ওপর হামলা করে কেন? কেন এক রাষ্ট্রনায়ক চান আরেকটি রাষ্ট্রকে নিজের কবজায় আনতে? সহজ কথায় আমরা বলতে পারি, মূলত অর্থনৈতিক লোভবৃত্তিই মানুষকে অন্য কোনো রাষ্ট্র জয় করতে উদ্বুদ্ধ করে। এটা ঐতিহাসিক সত্য। ওই দেশটা জয় করলে তেল পাওয়া যাবে, অমুক দেশ দখল করলে পাওয়া যাবে ইউরেনিয়াম বা মূল্যবান খনিজ গ্যাস, পাওয়া যাবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির চাবিকাঠি– এ ধরনের আরো লাভজনক উপকরণই সাম্রাজ্যবাদকে লোলুপ করে আরেক দেশ দখল করতে।

তো, কিছুদিন আগেও রাজ্যজয়ের প্রধান পদ্ধতি ছিলো যুদ্ধের মাধ্যমে দখল ও সরাসরি শোষণ। যেমন বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত শাসন, কিংবা পর্তুগিজ বা ফরাসিদের আফ্রিকা শাসন। কিন্তু সরাসরি যুদ্ধ করে দেশ দখলের সময় দেখা গেলো, সমস্যা কিছু থেকেই যাচ্ছে। দুদিন পরপর স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ শুরু করে দেয় দখলকৃত দেশের স্বাধীনতাকামীরা। এতে লাভের খাতায় তেমন কিছু একটা রাখা যায় না, উপরন্তু জীবন যায় দুপক্ষেরই বহু লোকের।

প্রিয় হাসিনা–

এই যখন অবস্থা, তখন সাম্রাজ্যবাদকে খুঁজতে হলো নতুন তরিকা। পুঁজিবাদের ছদ্মাবরণে মঞ্চে হাজির করা হলো নতুন এক অস্ত্র। এ তরিকায় জীবন যাওয়া-যাওয়ি নেই, তবে লাভ আগের চেয়ে তুমুল। এখানে বন্ধু হয়ে পেটে ছুরি মারলেও সবাই বাহবা দেয়। এ পদ্ধতিতে মানুষের পকেট থেকে অর্থ আনতে অস্ত্র ধরতে হয় না, সে নিজেই

সহাস্যে টাকা সাম্রাজ্যবাদের পায়ে অর্ঘ্য দিয়ে যায়। এই পদ্ধতির নাম হলো 'মাল্টিন্যাশনাল বিজনেস ওয়ার্ল্ড'। চোস্ত ইংরেজিতে আমরা যাকে বলি 'করপোরেট বিজনেস'। বাংলায় বলবো 'পণ্যসন্ত্রাস'। মার্কেটিং বা বাজারজাতকরণ যার মূল হাতিয়ার।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, মার্কেটিং আসলে কাকে বলে? উদারভঙ্গিতে আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, মার্কেটিং বলা হয় সেই প্রক্রিয়াকে, যা আপনাকে কিনতে বাধ্য করবে এমন একটি পণ্য, যেটি আপনার কোনোকালেই দরকার ছিলো না। এবং বিনীতভাবে অবশ্যই উৎপাদনের দশগুণ দামে।

প্রিয় তানিয়া–

আশা করি বিষয়টি তুমি একটু হলেও বুঝতে শুরু করেছো। যদিও বিষয়গুলো কঠিন কিছু না, তবে প্রথম প্রথম এমন তাত্ত্বিক কথা শুনলে বুঝতে খানিকটা ঘোলের স্বাদ লাগতেই পারে।

যাকগে, বলছিলাম মার্কেটিং দুনিয়ার কথা। এই মার্কেটিংয়ের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার কী জানো? মার্কেটিংয়ের সবচেয়ে পরাক্রমশালী হাতিয়ার হলো মিডিয়া বা প্রচারমাধ্যম। পত্রিকা, ম্যাগাজিন, টিভি, রেডিও, ইন্টারনেট, পোস্টার, লিফলেট ইত্যাকার সমস্ত প্রচারণা উপকরণই মার্কেটিংয়ের অন্তর্ভুক্ত। এসব দিয়ে মানুষের সামনে উপস্থাপন করা হয় করপোরেট বিজনেসের জায়েজ নট-নটীদের। আমরা যাদের আদরিত নামে বলি 'মডেল'। হেসে-কেঁদে, নেচে-গেয়ে তারা তোমাকে জানায়, এই পণ্যের মাঝে রয়েছে আপনার জীবনের সাফল্যের মূলমন্ত্র!

আমার কথায় দ্বিমত পোষণ করছো? আমার কথাকে বাগাড়ম্বরতা মনে হচ্ছে? হতেই পারে! তুমি হয়তো ভাবতে পারো তোমার ওপরে মিডিয়ার কোনো প্রভাব নেই। মিডিয়ার কথা বা বিজ্ঞাপনে তুমি প্রভাবিত হও না। আসলেই কি তা-ই? বিষয়টি পরখ করে দেখা যাক।

আচ্ছা, তোমাকে কয়েকটি সহজ প্রশ্ন করি–

–তোমার হাতের মোবাইল ফোনটির দাম কতো?

–দশ হাজার টাকা।

–কথা বলা ছাড়া বাড়তি কী কী সুবিধা আছে এর মধ্যে?

–এই তো ক্যামেরা, ভিডিও, এমপি থ্রি, গেমস, ইন্টারনেট, ফেসবুক, ভিডিও কলিং... এইসব।

–এগুলো কি তোমার বেঁচে থাকার জন্য অবশ্যপ্রয়োজন?

–না, তা নয়; জাস্ট বিনোদন। জীবনে কিছু বিনোদনেরও তো প্রয়োজন আছে।

বেশ বেশ...! তুমি কি বুঝতে পারছো, এই বাড়তি সুবিধা যদি না থাকতো তোমার ফোনে, তাহলে তোমার ফোনটির দাম হতো মাত্র দুই হাজার টাকা! তাহলে বোঝা যাচ্ছে, তুমি বাকি আট হাজার টাকা বাড়তি দিয়ে কেবল কিছু বিনোদন কিনেছো। তাই নয় কি?

প্রিয় সোমা–

এবার আমাকে বলো, বিনোদনের এই সহজ মাধ্যমের সবক তুমি কোথা থেকে নিয়েছো? নিশ্চয় টিভি-পত্রিকা বা ইন্টারনেটে দামি ফোনের বিজ্ঞাপন দেখে। সেখানে তুমি বিজ্ঞাপনটি দেখে এমন একটি স্মার্টফোন কিনতে উদ্বুদ্ধ হয়েছো। সুতরাং, যে জিনিসটি তোমার অদরকারি, সেই জিনিসটিকে মিথ্যা রং মাখিয়ে তোমার সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেনো জিনিসটি তুমি কিনে ধন্য হও। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে একটা ফোনের কাজ হলো কেবলই কল আদান-প্রদান।

প্রিয় সাবিহা–

আচ্ছা, একজন মেয়ে হিসেবে আমাকে বলো তো, আজ পর্যন্ত এমন কোনো মেয়ের সন্ধান কি তুমি পেয়েছো, যে মেয়ে বিজ্ঞাপনের স্নো-ক্রিম-লোশন মেখে পর্দার নায়িকার মতো হওয়া দূরে থাক, কালো থেকে শ্যামবর্ণ হয়েছে? বিজ্ঞাপনের তেল-শ্যাম্পু মেখে বিয়ে পাকা করে ফেলেছে? নিউজিল্যান্ড বা অস্ট্রেলিয়ান গরুর (যদিও মিথ্যা কথা) দুধ খেয়ে বাচ্চা হয়েছে সিন্দাবাদ বা আইনস্টাইন? এই দুধ খেয়ে যদি এতো কিছুই হওয়া যায়, তাহলে বাংলাদেশে এতো দুর্নীতি কীভাবে হয়? ডানো তো প্রজন্মের পর প্রজন্ম গড়ে তুলছে, কই বাংলাদেশে তো আইনস্টাইন

আজো এলো না? নিদেনপক্ষে একটা রবি ঠাকুর বা একটা নজরুলও তো পেলাম না আর! এই মিথ্যা কথার দুধ খেয়ে অবশ্য দুর্নীতিবাজ ছাড়া কিছু হওয়ারও কথা না। মিথ্যা দিয়েই যে দুধ গরুর উলান থেকে প্যাকেটজাত হয়, প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন দিয়েই যে দুধ প্যাকেট থেকে বাচ্চার পেটে যায়, সেই দুধ খেয়ে একটি শিশু মিথ্যা ছাড়া আর কী শিখবে? তবুও বিদেশি দুধে বেড়ে উঠছে আমাদের সন্তান। কারণ, ওটা সাম্রাজ্যবাদী দুধ। না খেয়ে উপায় নেই।

প্রিয় সুমি–

এই যখন আমাদের মতো বাঙালির অবস্থা, তখন ইন্ডিয়ার কী ঠেকা পড়েছে বাংলাদেশের দিকে বন্দুক-কামান তাক করে রাখার? তাদের শাহরুখ খান আছে; আমির খান, ক্যাটরিনা কাইফ, ঐশ্বরিয়া রাই, কারিনা কাপুর, বিদ্যা বালান, সিদ্ধার্থ মালহোত্রা, আলিয়া ভাট আছে। আছে স্টার জলসা, স্টার প্লাস, জি-বাংলা, সনি, কালারস বাংলাসহ অসংখ্য টিভি চ্যানেল। এসবের মাধ্যমে প্রতিদিন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে কিরণমালা, পাখি, বউ কথা কও, রাখী, দিদি নম্বর ওয়ানসহ অদ্ভুতুড়ে নামের এবং কিম্ভূত অভিনয়ের নাটক-সিরিয়াল।

ক্ষেপণাস্ত্রের বদলে ইন্ডিয়া বাংলাদেশের দিকে ভারত এসব নট-নটীকে তাক করে রেখেছে। এসব সুপারস্টার থাকলে ট্যাংক-কামান আর যুদ্ধবিমানের প্রয়োজন হয় না। প্রতিদিন শত শত ইন্ডিয়ান টিভি চ্যানেল হাজার হাজার 'রাউন্ড' বিজ্ঞাপনে এদের দিয়ে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে 'ফায়ার' করছে। তাতেই বাঙালি কুপোকাত। শুধু কাত হলেও কথা ছিলো, বাঙালি একেবারে 'কুপোশোয়া' হয়ে গেছে।

প্রিয় ইলোরা–

সুতরাং বুঝতেই পারছো, বাংলাদেশকে দখল করার জন্য, বাংলাদেশের ১৭ কোটি ভোক্তাকে ভারতীয় উপনিবেশ বানাতে তাদের সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতে হয়নি। চ্যানেলে চ্যানেলে ছেড়ে দিয়েছে নায়ক-নায়িকা আর মডেলদের জেল্লাদার দেহবল্লরী। তারা হরদম সাবান-

সোডা, তেল-স্নো, মোবাইল-টিভি, ওষুধ-গাড়িসহ আরো নানা ভারতীয় পণ্যের পসরা নিয়ে নগ্ন উঁকিঝুঁকি দেয় আমাদের টিভি পর্দায়। আমজনতা, মগজের ধার নিতান্ত গোবেচারা ধরনের। তাই ম্যাঙ্গো জুসের বিজ্ঞাপনে যদি ক্যাটরিনা কাইফের নধর দেহ দেখা যায়, আমরা সেটিকে পাকা আমের সাথে কাসুন্দি হিসেবে হজম করে নিই। দুনিয়া মাতানো হৃত্বিক রোশন যে মোটরবাইকের বিজ্ঞাপন দেয় সেই বাইক কিনতে, সেই বডি স্প্রে শরীরে মাখতে আমাদের কখনো মনে হয়নি এটি পণ্য-সাম্রাজ্যবাদের অংশবিশেষ।

প্রিয় সায়মা–

যে কথাগুলো তোমাকে বললাম, এ শুধু আমি একাই বলছি, এমন নয়। ভারতীয় রাজনীতিক, কলামিস্ট শশী থারুর কিছুদিন আগে মন্তব্য করেছিলেন, 'কামান-বন্দুকের বদলে টিভি চ্যানেল, সিনেমা স্টুডিও দিয়ে ভারত বিশ্বজয়ে নেমেছে।'

তাই তুমি টিভি পর্দায় তাকালে খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারবে, ভারতের জয়রথ বেশ ভালো গতিতেই এগিয়ে চলেছে। টিভি-সিনেমা তো আছেই, ভারতের বিজ্ঞাপন বাণিজ্যের নতুন সংযোজন হচ্ছে 'আইপিএল'। ধুমধাড়াক্কা ক্রিকেট দিয়ে দর্শক মাতিয়ে তারা কাবু করে ফেলেছে বাংলাদেশের বিশাল বাজার। খেলার ফাঁকে ফাঁকে চলছে বিজ্ঞাপন। চার-ছক্কার মাঝে মাঝে চলে চিয়ারলিডারদের উদ্দাম নৃত্য। বাঙালি-মন সেগুলো দেখে আনচান বোধ করে হামেশাই।

প্রিয় জিনাত–

তুমি যদি কখনো ভারতীয় কোনো হিন্দি বা বাংলা সিরিয়াল দেখে থাকো টিভিতে, তাহলে দেখবে সেসব নাটক-সিরিয়াল, সিনেমা–যেগুলোর মূল বক্তব্যই হলো প্রেম; নর-নারীর অবাধ মেলামেশা। তা-ও যেনতেন প্রেম না, পরকীয়া প্রেম। সঙ্গে থাকে লিভ টুগেদার, নাইট ক্লাব, ডিজে পার্টি, ঠুনকো কারণে স্বামী-স্ত্রীর সেপারেশন, বউ-শাশুড়ির দ্বন্দ্ব। এমন সব কুরুচিপূর্ণ বিষয় প্রতিদিন শত শত চ্যানেলে দেখানো হচ্ছে।

কাহিনির গাঁথুনি এগুলোর মধ্যে এতোটাই অটুট থাকে যে, দর্শক পরবর্তী পর্ব না দেখে থাকতে পারে না। নেশাখোরের মতো নেশাগ্রস্ত করে ফেলে দর্শককে। আর এসবের মাঝ দিয়ে চলে বিজ্ঞাপন। নেশাখোর দর্শকের কাবু না হয়ে উপায় আছে?

কারণ, শাহরুখ খান বলছে এই পণ্য ভালো, প্রিয়াঙ্কা বলছে এই সাবান সৌন্দর্যের প্রতীক। তাই যে দর্শক শাহরুখ খানের অন্ধভক্ত সে নির্দ্বিধায় বিজ্ঞাপিত পণ্যটিকে উত্তমজ্ঞানই করবে। শাহরুখ খানই তো ব্র্যান্ড। শাহরুখ যে টুথপেস্টকে ভালো বলবে সেটি দিয়ে দাঁত 'ঝিলিকমারা' সাদা না হওয়ার কোনো কারণই নেই। কিনতে হবে ওই পেস্ট কিংবা সাবান।

বুঝলে প্রিয়ন্তী, এরই নাম পণ্যসন্ত্রাস।

প্রিয় ডালিয়া–

বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে যদি খানিকটা জানাশোনা থাকে তোমার, তাহলে ভারতীয় অর্থনীতির দিকে তাকালেই দেখবে– এই পণ্যসন্ত্রাসের মুনাফালোভের কারণেই দুনিয়ার সব বড় বড় কোম্পানি তাদের এশিয়ার আঞ্চলিক অফিস খুলছে ভারতে। ভারতের রয়েছে বিশাল ভোক্তা বাজার এবং সস্তা শ্রমবাজারের নিশ্চয়তা। মুফতে পার্শ্ববর্তী দেশের বাজারও তাদের অধীন। তাই তাদের পণ্যের বিপণন করতে পুরো এশিয়া ঘুরতে হয় না। ভারতে বসেই পণ্যোপনিবেশ কায়েম করা যায় পুরো এশিয়ায়। ভারতের অগণিত টিভি চ্যানেলে তারা ছেড়ে দিয়েছে যুদ্ধংদেহী মারদাঙ্গা মডেলদের। তারাই হামেশা তোমার মস্তিষ্কের বারান্দায় এসে বলছে, 'অ্যান আইডিয়া ক্যান চেঞ্জ ইউর লাইফ'। জীবন না বদলে উপায় আছে!

প্রিয় আরিফা–

অথচ আমাদের উদারতা দেখো। আমাদের বাংলাদেশি কোনো টিভি চ্যানেল ইন্ডিয়ায় প্রচারের অনুমতি নেই। ইন্ডিয়ায় বাংলাদেশের কোনো টিভি চ্যানেল দেখা যায় না। এমনকি বাঙালি অধ্যুষিত কলকাতাতেও না। তারা প্রতিদিন আমাদের দেশে টনকে টন পণ্য

'ফায়ার' করছে, অথচ আমরা একটা গুলি তো দূরে থাক, বাংলা চ্যানেল দিয়ে একটা গালিও ছুড়তে পারছি না। বলতেও পারছি না- 'মেরে ইয়ার, এহসব কিয়া হো রহা হ্যায়...?' এই হলো আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পণ্যসন্ত্রাসের হাকিকত!

অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ এ প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন, 'অন্য রাষ্ট্রের পণ্যের ভোক্তা বাড়লে অর্থনীতি, শিল্প স্বাভাবিক নিয়মেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারতীয় চ্যানেল বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ দেশে ভোক্তা তৈরি করছে। বাংলাদেশের চ্যানেল ভারতের কোথাও দেখা যায় না। ফলে এক্ষেত্রে ভারসাম্য থাকছে না। এ দেশের চ্যানেল ভারতে দেখানো হলে বা আমাদের পণ্যের বিজ্ঞাপন সেখানে প্রচারের পর ভোক্তাগোষ্ঠী তৈরি হলে সামান্য একটা ভারসাম্য থাকতো। তা না হওয়ায় ভারত এখন একতরফা বাজার দখল করছে।'

প্রিয় পাপিয়া-

এবার এ বিষয়ে কিছু তথ্য জেনে নাও। ন্যাশনাল মিডিয়া সার্ভের সাম্প্রতিক জরিপমতে, দেশে টিভি দর্শকের সংখ্যা প্রায় ১০ কোটির ওপরে। যাদের বয়স ১৫ বছরের ওপরে। এসব দর্শক প্রতি ১০০ মিনিটের মাত্র ৩০ মিনিট দেখেন বাংলাদেশি টিভি চ্যানেল। বাকি ৭০ মিনিট দেখেন বিদেশি চ্যানেল। এর মধ্যে বেশিরভাগ সময় দেখেন ভারতীয় চ্যানেল। তারা বেছে নিচ্ছেন ভারতীয় চ্যানেলের সিরিয়াল, সিনেমা, গান আর রিয়েলিটি শোগুলো। তারা অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তুর চেয়ে বাহ্যিক চাকচিক্যে মুগ্ধ। তথ্যমতে, ডিশ কেব্‌ল সংযোগে বাংলাদেশে দেখা যায় ২৭২টির মতো টিভি চ্যানেল। এর মধ্যে বাংলাদেশি চ্যানেল ১৩ থেকে ১৫টি। বাংলাদেশি চ্যানেলগুলোর অনুষ্ঠান বাংলাদেশের দর্শকরা প্রতি ১০০ মিনিটের মাত্র ২৯.২০ শতাংশ সময় দেখেন। বাকি সময়ের সিংহভাগটা ব্যয় করেন ভারতীয় হিন্দি চ্যানেল দেখে।

বুঝতেই পারছো আমরা কতোটা নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছি ভারতীয় সংস্কৃতির পাপাবিদগ্ধ সয়লাবে।

প্রিয় রুপা–

বিশ্বায়নের এ যুগে এসব ফালতু দেশাত্মবোধক অনুভূতি নিয়ে বাতচিত করলে বিশ্বায়নে আমাদের অগ্রগতিকে ম্লান করে দিতে পারে– এ আশঙ্কা তুমি করতেই পারো। বলতে পারো– গ্লোবালাইজেশনের এই আধুনিক যুগে এসে এমন হীনম্মন্য মনোভাব নিয়ে থাকলে আমরা কখনো প্রগতির রাজপথে উঠতে পারবো না। কথা কিন্তু থেকেই যাবে। ললাটে যে লেখা আছে বাঙালি নামের রাজটীকা, সেটিকে বিশ্বায়নের নশ্বর দেহের মাঝে এমন করে বিলিয়ে দেয়াটাকে কী বলবে তুমি? আমাদের যতন করা সংস্কৃতিকে তবে কি বিলিয়ে দেবো ভারতীয় নগ্ন সংস্কৃতির অন্দরে?

ক্যাটরিনা কাইফকে পর্দায় হাজির করে বলা হচ্ছে, সে এই পণ্য ব্যবহার করে এমন রূপের জৌলুশ পেয়েছে। তুমিও ব্যবহার করে দেখো, জাস্ট তার মতো বদলে যাবে। ব্যস, ক্যাটরিনার মতো সুন্দরী হওয়ার দৌড়। নায়িকাই হয়ে যায় জীবনের আদর্শ। বঙ্গবন্ধু-শহীদ জিয়া বাদ। নবি-রাসুল তো সেই কবেই জন আব্রাহাম আর আমির খানের মাঝে বিলীন হয়ে গেছেন।

প্রিয় পুষ্প–

আমাকে বলো তো, আমাদের বাংলাদেশের দুই হাজার বছরের সংস্কৃতি, প্রাচ্যের দর্শন, আমাদের লালিত জীবনবোধ আমাদের কী বলে? আমরা কি সাফল্যের এই সংজ্ঞায় অভ্যস্ত? আমাদের হাজার বছরের জীবনভাবনা আমাদের এতোদিন শিখিয়েছে সরল জীবনযাপনই প্রকৃত সুখ। মাত্র দুটি কাপড়েই জীবন ভালোভাবে চলে যেতে পারে। অল্প খাও কিন্তু খাঁটি খাও। কিছুদিন আগে পর্যন্তও বেশি স্লিম মেয়েদের বিয়ের সমস্যা হতো। পাটকাঠির মতো মেয়ে দেখলেই পাত্রপক্ষ পিছু হটতো। কারণ, বাঙালিরা একটু স্বাস্থ্যবতী বউ পছন্দ করে। সৌন্দর্যের মাপকাঠি ছিলো সাদামাটা টানা টানা কাজল কালো চোখ আর খোঁপায় বেলি ফুলের মালা।

টিভি মিডিয়ার বদৌলতে আমরাও ইদানীং স্লিম ভালোবাসতে শিখেছি। জিরো ফিগার তত্ত্ব এখন আমাদের তরুণীদের স্বপ্নের অবয়ব। পাত্র কনে দেখতে এলে আগে দেখে মেয়ে নায়িকাদের মতো যথেষ্ট স্মার্ট কি না। কেননা এখন ক্যাটরিনা কাইফই হলো আদর্শের মাপকাঠি।

এভাবেই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাচ্ছে। আমরা চাই আর না চাই, আমাদের আদর্শ বদলে যাচ্ছে। শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্বের মানুষের মাথায় হাতুড়পেটা করে শেখানো হচ্ছে, ক্যাটরিনা মানেই সাফল্য, ক্যাটরিনা মানেই আদর্শ। অথচ ক্যাটরিনা মানে, যার সবটুকুই মিথ্যা আর ভয়াবহ রকমের পাশবিক শোষণ। ক্যাটরিনা এখানে শোষণের হাতিয়ার মাত্র।

নারী যেভাবে
ব্যবসা, পণ্য, ভোগ্য

প্রিয় জয়নব–

নারী স্বাধীনতার কথা হয়তো তুমি প্রতিদিনই শোনো, কোনো না কোনোভাবে। নারী স্বাধীনতার কথা যদি শুনেই থাকো, তাহলে একটা কথা তুমি হয়তো নিপাট নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করো– নারীর অধিকার মানেই আমেরিকা-ইউরোপ। সে অঞ্চলের দেশগুলোতেই পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে নারীমুক্তির যাবতীয় রসদসামগ্রী। আমাদের দেশের তাবৎ সুশীলকুল তো বটেই, শিক্ষিত শ্রেণি মানেও যেনো এই বিশ্বাসেরই ধ্বজাধারী। এদেশীয় প্রগতিশীল সুশীল ও নারীবাদীরা আমাদের সমাজে নারী-অধিকার প্রতিষ্ঠায় পাশ্চাত্য ভাবধারা বা আদর্শকে প্রেসক্রিপশন হিসেবে বাতলে দিচ্ছে এবং সেটিকেই মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

আসলেই কি তাই? তোমার কী মনে হয়, ইউরোপ-আমেরিকা মানে আসলেই কি নারীর সর্বোচ্চ সম্মাননা? তারা মুসলিম দেশগুলোতে প্রতিদিন টনকে টন নারী অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, উন্নয়নের মূলধারায় নারীর অংশগ্রহণের যে বুলি কপচাচ্ছে– বাস্তবেই কি সেগুলো পশ্চিমা দেশগুলোতে প্রতিষ্ঠিত? পাশ্চাত্যের অতি উত্তম নারী স্বাধীনতার আদর্শ অনুসরণ করার আগে সেটা একবার তোমার-আমার যাচাই করে নেয়া কি উচিত নয়?

তাহলে আসো, পশ্চিমা বিশ্বে নারীর বর্তমান অবস্থা এবং উন্নত বিশ্বের উন্নত সমাজে নারীদের কীভাবে সম্মান দেয়া হয়– তার একটা খতিয়ান দেখা যাক।

প্রিয় রাজিয়া–

আলোচনায় যাওয়ার আগে তুমি আমার একটি সহজ প্রশ্নের উত্তর দাও তো। বলো তো, নারী কেন নিজেকে রূপসীরূপে উপস্থাপন করতে চায়? কেন সে নানাধর্মী প্রসাধনী, বাহারি সাজগোজ, উত্তেজক পোশাক পরে থাকে? কেন সে নিজের শারীরিক বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নিজেকে প্রদর্শনের চেষ্টায় লিপ্ত হয়? এর উত্তর খুবই সোজা– পুরুষের চোখে নিজেকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করার জন্য।

এর মানে হচ্ছে– পুরুষকে নারী নিজের বাহ্যিক রূপ, শারীরিক সৌন্দর্য, স্পর্শকাতর অঙ্গের কমনীয়তা দিয়ে বশীভূত করতে বেকারার। কোনো সুদর্শন পুরুষ যদি এমন প্রদর্শনপ্রিয় নারীকে দেখে মুগ্ধ চোখে তাকায়, তাহলে নারী নিজের সৌন্দর্যের অহংকারে দ্রবীভূত হয়ে পড়ে। তারা তাদের ভেতরকার মেধা, চিন্তা, বুদ্ধিমত্তা, সেন্স অব হিউমারের ধার ধারে না এবং সেগুলো দিয়ে কখনো কোনো পুরুষকে আকৃষ্টও করতে চায় না। নিজের অন্তর্গত শক্তি নয়, নারী চিরকাল তার বহিরাগত রূপ-লাবণ্য দিয়েই পুরুষের আরাধ্য হতে চেয়েছে। সুতরাং, আমরা বলতেই পারি– প্রদর্শনপ্রিয় নারী মানেই হচ্ছে শারীরিক সৌন্দর্যে বিশ্বাসী নারী।

প্রিয় জিনিয়া–

এবার দেখা যেতে পারে, শারীরিক প্রদর্শনপ্রিয়তার দিক দিয়ে ইউরোপ-আমেরিকার নারীরা কতোটা এগিয়ে বা তারা কি শারীরিক নারী অধিকারে বিশ্বাসী, নাকি পরিপূর্ণ একজন 'নারী'র সৌন্দর্যে বিশ্বাসী! কেননা আমরা আগেই জেনেছি– ইউরোপ-আমেরিকাই হলো নারীর অন্তর্গত সকল শক্তির পূজনীয় স্থান। সেখানে নারীর রূপ-যৌবনের থোড়াই কেয়ার করা হয়। নারীর চেহারা বা শারীরিক সৌন্দর্য সেখানে কোনো বিষয় নয়। সেখানে দাম দেয়া হয় কেবল নারীর শাণ দেয়া ব্যক্তিত্বকে।

প্রিয় মনোয়ারা–

তো, সর্বপ্রথমে আমরা কিছু পরিসংখ্যানের দিকে নজর দিতে পারি। আমেরিকাতে এক সমীক্ষায় দেখা যায়, মাত্র দশ বছরে (১৯৯২-২০০২)

নারীদের স্তনের আকার বর্ধনজনিত সার্জারির (Breast implant) হার বেড়েছে ৬২৬%! অর্থাৎ দশ বছরের ব্যবধানে স্তনের আকার আকর্ষণীয় করতে আমেরিকার নারীদের আগ্রহ ছয়শো ছাব্বিশ শতাংশ হারে এসে ঠেকেছে।

আরও মজার বিষয় হলো, এসব নারীর ৫৭%-এর বয়স ৩৫ বছরের নিচে। তার মানে ধরা যায়, ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী নারীদের মধ্যেই এই প্রবণতা সর্বাধিক। এই বয়সী নারীরা অবশ্যই শারীরিকভাবে ফিট, বয়সে এখনো তরুণী। তবু তাদের স্তনের আকার বা নিতম্বের আকার সুডৌল করতে হয়। কেননা শরীর না হলে তার বয়ফ্রেন্ড বা স্বামী মিলবে না অথবা ছেলেরা তার দিকে ফিরে তাকাবে না। যদি লোভাতুর ছেলেরা তার দিকে না-ই তাকালো, তাহলে এ সাধের শরীর দিয়ে লাভটা কী? পশ্চিমা তরুণীদের এটাই সহজ হিসাব।

বাদবাকি ৪৩ ভাগ নারী, যাদের বয়সে ভাটার টান লেগেছে, শারীরিকভাবে আকর্ষণ কমে গেছে, শরীরের আকর্ষণীয় অঙ্গে স্থূলতা বা সংকোচন দেখা দিয়েছে; তারা নিজেদের পুরুষের সামনে চিরযৌবনাভাবে উপস্থাপন করতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে স্তনের আকার বর্ধন বা রহিতকরণ হাসপাতালগুলোতে।

প্রিয় ফিরোজা–

তুমি জেনে অবাক হবে কি না জানি না, বছর কয়েক আগের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রভাব ফেললেও আমেরিকায় স্তন সার্জারিতে কোনোই প্রভাব ফেলেনি, বরং বেড়েছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে– ২০১০ সালে স্তন সার্জারিতে ব্যয় হয়েছে প্রায় এক বিলিয়ন ডলার। ২০১০ সালে ১৩ মিলিয়ন মানুষের (৮৭ ভাগই নারী, বাকি ১৩ ভাগ পুরুষও রয়েছে) সৌন্দর্য বর্ধনজনিত কসমেটিক সার্জারিতে ব্যয় হয় ১০ বিলিয়ন ডলারের বেশি!

এখন প্রশ্ন হচ্ছে– আমেরিকার শিক্ষিত, সচেতন ও স্বাধীন নারীরা কী কারণে স্তনের আকার বড় করছেন? এ বিষয়ে স্তন বর্ধনকারী একজন স্বাধীন নারীর বক্তব্য শুনুন– 'I'm happier where I am now in

my life. The breast augmentation has helped my motivation, self-esteem and confidence. I did this for me– and nobodz else.'

উনি যেটা বলতে চাইলেন, সহজ কথায় বলতে গেলে– স্তনবর্ধন তার জীবনের চালিকাশক্তি, আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই একই ধরনের অভিমত পোষণ করেন সারা বিশ্বের সৌন্দর্যজনিত স্তন বর্ধনকারী নারীরা! তার মানে এই নয় যে তারা তাদের স্বাভাবিক শারীরিক গঠন নিয়ে তৃপ্ত নন? কেন তথাকথিত উন্নত বিশ্বের স্বাধীন নারীরা তাদের স্তনের আকার নিয়ে চিন্তিত, উদ্বিগ্ন? আশা করি বিষয়টি বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। তারা যদি নারীর ভেতরগত সৌন্দর্য আর ব্যক্তিত্বকেই প্রাধান্য দিতো, তাহলে তো তারা নিজেদের শারীরিক বর্ধন-সংকোচন নিয়ে এতো লাখ লাখ ডলার খরচ করতো না।

প্রিয় আসিয়া–

এখানে আরেকটি বিষয় তোমার জানা জরুরি। আমেরিকা-ইউরোপে বিয়ে সংস্কৃতি অত্যন্ত ভঙ্গুর একটি বন্ধন। খুব সাধারণ মুগ্ধতা থেকে এরা যেমন বিয়ে করে তেমনি খুবই ঠুনকো কারণেই এদের বিয়ে ভেঙে যায়। এ কারণেই দেখা যায়, তাদের জীবনে বহুবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়। কোনো সংসারেই এদের জীবন স্থায়িত্ব পায় না।

এসব কারণে পশ্চিমা নারীরা সবসময় আতঙ্কের মধ্যে থাকে। বিশেষত তাদের বয়স যখন বেড়ে যায়, শরীরে যখন ভাটার টান লাগে তখন তারা শারীরিক সৌন্দর্য ধরে রাখতে মরিয়া হয়ে যায়। হাজারও রকমের থেরাপি, ওষুধ, সার্জারি করিয়ে নিজেকে ফিট রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। কেননা শেষ বয়সে যদি তার কোনো স্বামী না থাকে, তাহলে তার বাকি জীবনটা কাটাতে হবে নির্জনে একা একা কিংবা কোনো বৃদ্ধাশ্রমে। সুতরাং, বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না– পশ্চিমা নারী মানে পুরোটাই শরীরকেন্দ্রিক মানবীবিশেষ।

প্রিয় নূপুর–

শুধু তুমি নও, বাঙালি যেকোনো পাঠকমাত্রই শুনে আশ্চর্য হবে, আমেরিকা-ইউরোপের নারীদের উদ্বিগ্নতা এখন শুধু স্তনেই সীমাবদ্ধ নেই, তারা এখন তাদের অত্যন্ত গোপন অঙ্গের সৌন্দর্য নিয়েও চিন্তিত! বিশ্বাস করো আর না-ই করো, আধুনিক বিশ্বের অনেক দেশেই সার্জারির মাধ্যমে মেয়েদের গুপ্তাঙ্গের সৌন্দর্য বর্ধন করা হচ্ছে এবং আমেরিকা-ইউরোপের মেয়েরা নিজেদের এ অঙ্গের সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য পাগলের মতো সার্জারি সেন্টারগুলোর দিকে ছুটে যাচ্ছে।

আর কী বলা যায় পাশ্চাত্যকে? যারা পুরুষের মনোতুষ্টির জন্য নিজেদের স্তন বা যৌনাঙ্গের সৌন্দর্যবর্ধনে পাল্লা দিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে, তারা আমাদের দেশে এসে নারী নির্যাতন, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, পুরুষের সমান অধিকার, জ্বলে উঠো আপন শক্তির জিগির শুনিয়ে যায়। তারা আমাদের বলে– আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা, ব্যক্তিত্ব থাকে নারীর নিজের ভেতর, চেহারা বা শরীর কিছু নয়; অথচ তারা তাদের স্তন আর যৌনাঙ্গের সৌন্দর্য দিয়ে পুরুষের মনমেহন করার জন্য কাতারে কাতারে সার্জারির কাঁচির নিচে যেতেও পিছপা হচ্ছে না। হায়রে আমাদের নারী অধিকার!

প্রিয় আরওয়া–

আমেরিকান নারীরা মুখে যতো যা-ই বলুক, তাদের জন্য শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতা বা পরিচ্ছন্ন মানসিকতার অধিকারী হওয়াই যথেষ্ট নয়। আমেরিকা-ইউরোপে নারী মানেই ব্যবসায়িক পণ্য, এ কথা খোদ পশ্চিমারাই বারবার প্রমাণ করে দিয়েছে। এ কারণেই পাশ্চাত্যে নারীর বাহ্যিক সৌন্দর্যকে পুঁজি করে গড়ে উঠেছে অসংখ্য লাভজনক ব্যবসা।

পাশ্চাত্যে এমন কোনো বিজ্ঞাপন খুঁজে পাওয়া দুর্লভ, যেখানে খদ্দের ধরার জন্য নারীর শারীরিক সৌন্দর্যকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয় না। এক সমীক্ষা অনুযায়ী দেখা যায়, আমেরিকানরা গড়ে প্রতিদিন প্রায় তিন হাজার বিজ্ঞাপনের সম্মুখীন হয়, যেখানে নারীদের যৌনাবেদনময়ী রূপে উপস্থাপন করা হয়। যারা এসব বিজ্ঞাপনে পোজ

দিচ্ছেন, মডেল হচ্ছেন, অভিনয় করছেন তারা পাশ্চাত্যেরই নারী। তারা আর কিছু নয়, নিজের শরীরটাকেই দেখাচ্ছেন মানুষকে। আরও সহজ কথায় বলতে গেলে– পুরুষমানুষকে।

প্রিয় দীপ্তি–

আমরা এতোদিন জানতাম যে, শারীরিক সৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী, মানসিক সৌন্দর্যই আসল এবং ব্যক্তিত্বের বিচারে মানসিক সৌন্দর্যই সর্বোচ্চ। সম্মান পাওয়া না পাওয়া মূলত ব্যক্তির মন-মানসিকতা কতোখানি উন্নত তার ওপর নির্ভরশীল। আর শিক্ষা মানুষকে এই উন্নত মন-মানসিকতা গড়তে প্রধান ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া জন্মগতভাবে শারীরিক গঠন ও সৌন্দর্যের ওপর মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, কিন্তু মনের ভেতরের সৌন্দর্য অনেকটাই ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন, সদিচ্ছা এবং নিরন্তর চর্চানির্ভর।

কিন্তু বাস্তবতায় দেখা যাচ্ছে, তথাকথিত উন্নত বিশ্বে নারীদের সম্মান পাওয়াটা অনেকাংশেই নির্ভর করে শারীরিক সৌন্দর্যের ওপর, নারীর সুডৌল দেহবল্লরী, জিরো ফিগার তত্ত্বের ওপর। সুতরাং, স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার নারীরা শারীরিক সৌন্দর্যকে সফলতার চাবিকাঠি মনে করে দিন দিন এই শারীরিক সৌন্দর্যকে কীভাবে আরও বাড়ানো যায়, আরও আকর্ষণীয় করা যায়– সেই চেষ্টায়ই লিপ্ত থাকেন।

সুতরাং, এরপর যদি কোনো পাশ্চাত্য নারী কিংবা পাশ্চাত্য নারীবাদে বিশ্বাসী কোনো মেয়ের দেখা পাও, তাহলে তাকে জোর গলায় বলে দেবে– ম্যাডাম, দয়া করে রাস্তা মাপুন। ইউরোপ-আমেরিকায় গিয়ে নারী স্বাধীনতার বুলি আওড়ান। আমাদের মুসলিম দেশগুলোতে বেশ সগৌরবেই বিরাজ করছে সহস্র বছরের নারী স্বাধীনতা। নারীমুক্তি জিনিসটা আপনাদের জন্যই সবচেয়ে বেশি দরকারি জিনিস।

প্রিয় শিফা–

এ কথা তুমি আমি কে না জানে– স্বভাবগতভাবে নারীরা সৌন্দর্যসচেতন, আর পুরুষেরা নারীর এই সৌন্দর্যের প্রতি দুর্বল। এই

স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দিয়ে গড়ে উঠেছে পণ্য বাজারজাতকরণের হাজারো পলিসি। এজন্য শুরু হয়েছে নারীকে আরো কতো যৌনময়ী করা যায় তার বিকৃত ও অসুস্থ প্রতিযোগিতা। শুরুতে এই মানসিকতাকে ছি ছি করলেও মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার হতে হতে তারা এখন এটিকেই সামাজিক ভ্যালু হিসেবে মেনে নিয়েছে। সেই সাথে সামাজিক যে সমস্ত ভ্যালু মেয়েদের অন্তর্গত প্রতিভা ও মননকে উপস্থাপন করতো, সেগুলোকে নারী স্বাধীনতার প্রতিবন্ধকরূপে মিডিয়াতে এমনভাবে সুকৌশলে উপস্থাপন করা হলো যে, নারীরা নিজে থেকেই লোলুপ পুরুষদের সংজ্ঞায়িত 'মুক্তি'র স্বাদ পেতে ও প্রগতিশীল হতে গিয়ে সেসব ভ্যালুগুলোকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছে। যার ফলে নারীরা নিজেদের আরো কতো যৌনাবেদনময়ীরূপে উপস্থাপন করা যায়, সে প্রচেষ্টায় বিভোর থাকে। চেয়ার-টেবিল থেকে শুরু করে শেভিং ক্রিম, এমনকি কল মেরামত করার বিজ্ঞাপনেও যোগসূত্রহীনভাবে নারীদের যৌনতাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে নারীর দেহকে উপভোগ করিয়ে প্রোডাক্টটি ভোক্তাশ্রেণির অন্তরে গেঁথে দেয়া।

বুনো পশ্চিমের এই শিক্ষা আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে তো বন্যার পানির মতো ঢুকে পড়েছে। আমাদের মিডিয়া বরং আরেক কাঠি সরেস, তারা হজ-উমরার বিজ্ঞাপনেও নারীকে ব্যবহার করে! এই হলো আমাদের মানসিকতা।

প্রিয় রহিমা–

আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে, স্বল্পবসনা নারী বা যৌন উদ্দীপক নারীর ছবি দর্শনে পুরুষের মস্তিষ্কের যে অংশটি (Prefrontal Cortex) সক্রিয় হয়, সে একই অংশটি সক্রিয় হয় যখন পুরুষ কোনো স্ক্রু-ড্রাইভার বা সাঁড়াশি জাতীয় কোনো যন্ত্র ব্যবহার করে। ফলে সে পুরুষাশালী সক্রিয়ভাবে কাজ করার তাগিদ অনুভব করে। তাছাড়া এ ধরনের ছবি দেখলে মস্তিষ্কের যে অংশটি অপরের ইচ্ছা এবং আবেগকে বিবেচনা করে, সে অংশটি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। মজার ব্যাপার হলো, স্বাভাবিক ও শালীন পোশাক পরিহিতা নারী কিংবা নারীর ছবি দর্শনে এ ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।

শুধু তা-ই নয়, পুরুষেরা স্বল্পবসনা নারীদেহ, পূর্ণবসনা নারীদেহের তুলনায় বেশি মনে রাখে। এককথায় বলা যায়, পুরুষেরা স্বল্পবসনা বা যৌনাবেদনময়ী নারীদের বস্তু হিসেবে গভীরভাবে অনুভব করে।

একে তো নারীদেহকে পণ্য বা ভোগ্যবস্তু হিসেবে ব্যবহার করে পণ্যের বিক্রি বাড়িয়ে লাভ করা হচ্ছে, সেই সাথে নারীরা যেনো নিজেদের আরো বেশি পণ্য ও ভোগ্যবস্তুরূপে গড়ে তোলে, সে উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সৌন্দর্যসামগ্রী ও সৌন্দর্যবর্ধন প্রযুক্তি তাদের কাছে বিক্রি করে মুনাফা করা হচ্ছে। তাই গড়ে উঠেছে ৩৩০ বিলিয়ন ডলারের বিউটি ইন্ডাস্ট্রি। বিশ্বায়নের সুযোগে অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেড়ে চলছে তাদের প্রভাব। অর্থনৈতিক মন্দাও এই সৌন্দর্যশিল্পের গতিকে সামান্যতম থামাতে পারেনি।

প্রিয় জেরিন–

ইদানীং পাশ্চাত্য তো বটেই, আমাদের দেশেও বিভিন্ন বয়সভিত্তিক স্থানীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়– যে সুন্দরী প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নারীদেহকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে দেখানো হচ্ছে, সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে নারীরা নিজেদের অত্যন্ত সম্মানিত ও গর্বিত মনে করছে। এমনকি পরিবারের সদস্যরাও তাদের মেয়ে বা বোনকে পুরুষের লোলুপ বস্তু বানাতে যথাসাধ্য প্রেরণা জোগাচ্ছেন! অথচ তারা কি একবারও চিন্তা করেন না, তারা তাদের মেয়েকে মূলত হাজার হাজার পুরুষের লালাসিক্ত জিহ্বার খোরাক বানাচ্ছেন?

মিডিয়া প্রভাবিত পশ্চিমা বিশ্বে নারীরা এখন একটি নতুন উপসর্গে ভুগছেন। সমাজবিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন সেলফ অবজেক্টিফিকেশন (Self-objectification)। নারীদেহকে যত্রতত্র ভোগ্যপণ্য হিসেবে প্রচার করার কারণে নারীরা তাদের স্বাভাবিক ও সহজাত সৌন্দর্য নিয়ে এতোটাই সন্দিহান ও বিচলিত যে, নিজের সৌন্দর্যের সার্টিফিকেট পুরুষের কাছ থেকে নিতে হয়। অর্থাৎ তাদের দেহ পুরুষের মনে-দেহে যথেষ্ট যৌন আবেদন সৃষ্টি করছে কি না– সেটা মুখ্য বিষয় হিসেবে দাঁড়িয়েছে।

এর যথেষ্ট কারণও রয়েছে। ক্যারিয়ার, বিয়ে, যৌনতা, কর্মক্ষেত্রে বা অর্থনৈতিকভাবে সফলতার মূলে রয়েছে নারীদেহের বাহ্যিক সৌন্দর্য। The Canadian Women Health Network-এর গবেষণা অনুযায়ী, প্রায় ৯০% নারী নিজের স্বাভাবিক বাহ্যিক সৌন্দর্য নিয়ে অসন্তুষ্টিতে ভোগেন। ২০০৩ সালে Teen Magazine-এর রিপোর্ট অনুযায়ী শতকরা ৩৫% বয়সী প্রাক-কিশোরীরা (৬ থেকে ১২ বছর বয়সী বা প্রি-টিন) ডায়েটিং করে। এদের ৫০-৭০% প্রাক-কিশোরীরা নিজেদের স্বাভাবিক দেহের ওজনকে অতিরিক্ত বলে মনে করে। তাই তরুণীরা তাদের শরীরকে যৌনাবেদনময়ী করতে এবং মাত্রাতিরিক্তি স্লিম করতে গিয়ে ইটিং ডিজঅর্ডার (Eating disorder) নামক মনোরোগে ভুগছে। এ রোগে খাওয়ার প্রতি অত্যন্ত বিতৃষ্ণা ভাব গড়ে ওঠে। ফলে অস্থিচর্মসার দেহটুকুই অবশিষ্ট থাকে, যা কিনা আফ্রিকার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের কথা মনে করিয়ে দেয়। তফাত হলো, একজন ভোগেন সৌন্দর্য ক্ষুধায়, অপরজন ভোগেন ভাতের ক্ষুধায়! বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী ডায়েট বা স্লিমিং ইন্ডাস্ট্রির বাজারমূল্য প্রায় ৮০ থেকে ১০০ বিলিয়ন ডলার।

প্রিয় নুরজাহান–

তুমি নিজেও দেখেছো, আমাদের দেশেও মেয়েদের পণ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সুশীল এবং প্রগতিশীল নারীবাদীরা প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। এর প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে লাক্স-মেরিল সুন্দরী টাইপের প্রতিযোগিতা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে। আমাদের দেশের বিজ্ঞাপনগুলোও যৌন সুড়সুড়িতে ভরপুর। আমাদের দেশে প্রচারিত বিজ্ঞাপনের অনেকাংশই ইন্ডিয়ান বিজ্ঞাপনের ডাবিং। যৌন উদ্দীপক হিন্দি ছবি ও সিরিয়ালের কথা বাদই দিলাম।

এসব প্রগতিশীল সুশীল ও নারী অধিকার নিয়ে সোচ্চার মিডিয়া কোমলমতি তরুণীদের ব্রেনওয়াশ করে তাদের যৌন উদ্দীপক হিসেবে গড়ে তুলছে। এক তেঁতুল উপমা নিয়ে যারা শোরগোল করেছে, তারাই আবার তরুণীদের যৌন উদ্দীপক হিসেবে গড়ে তুলে পুরুষের লোলুপতার মুখে ফেলে দিচ্ছে। তাই এর বিষক্রিয়া থেকে ১০-১২

বছরের বালিকারাও রক্ষা পাচ্ছে না, হচ্ছে পুরুষের পাশবিকতার শিকার। কেননা তারাই তো ফেয়ার অ্যান্ড লাভলির বিজ্ঞাপনে শিক্ষা দিয়েছে– সৌন্দর্য হলো শক্তি!

হে পুতুল, নত হও ভদ্র হও

প্রিয় উম্মে হাবিবা–

তোমার বান্ধবী বা স্বজনদের যারা হিন্দি সিরিয়াল দেখে, টিভি পর্দায় কুসুম কোমল নারীদের অভিনয় দেখে আহ্লাদিত হয়; তাদের কাছে গিয়ে একবার যদি বলতে পারো যে সত্যিকার অর্থে ভারতীয় নারীদের সামাজিক অবস্থাটা আসলে কেমন, তাহলে আশা করি তাদের সিরিয়াল-মোহ অনেকটাই কমে যাবে। অন্তত তারা বুঝতে পারবে, টিভি পর্দায় তারা যে অভিনেত্রীর সুশ্রী মুখগুলো দেখছে, তার অন্তরালে আসলে তারা কতোটা নির্যাতিত এবং কতোটা নিগৃহীত।

তুমি হয়তো সংবাদপত্রে পড়েছো, বেশ কিছুদিন ধরে ভারতে ধর্ষণ ইস্যু বেশ উত্তপ্ত করে রেখেছে সে দেশের সমাজ ও রাজনীতির অঙ্গন। বিশেষ করে ২০১৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর চলন্ত বাসে নির্ভয়া নামের এক নারীকে ধর্ষণের পর রাস্তায় ছুড়ে ফেলে হত্যার ঘটনায় জ্বলন্ত উনুন হয়ে ওঠে পুরো দেশ। প্রতিবাদে মুখর হয় পুরো ভারতবর্ষ। ধর্ষকদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে রাস্তায় নেমে আসে লাখ লাখ ভারতবাসী।

এরই মাঝে ভারতে বেড়াতে আসা বিদেশি নারীদের গণধর্ষণের প্রবণতাও বেশ বেড়ে যায়। কয়েক দিন আগেও গণধর্ষণের শিকার হন এক বিদেশিনী। বিশেষ করে, ভারতের দিল্লি ও মুম্বাইতে ধর্ষণের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। এ কারণে দিল্লিকে ডাকা হয় 'রেপ সিটি' নামে।

প্রিয় হান্না–

ভারতীয় নারীদের এই যখন অবস্থা, ঠিক তখন ঋতু তাওড়ে নামে মুম্বাই পৌরসভার একজন সদস্য ধর্ষণ কমাতে অভিনব এক প্রস্তাব দেন। মুম্বাই পৌরসভার সদস্য এবং বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে গড়া মুম্বাই নাগরিক

সমাজের এক নীতিনির্ধারণী বৈঠকে ঋতু তাওড়ে পোশাকের দোকানে সাজানো প্লাস্টিকের নারী পুতুলগুলোকে (ম্যানিকুইন) ধর্ষণের অন্যতম কারণ বলে দাবি করেন। ধর্ষণ রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে তিনি মনে করেন, এসব নারী পুতুলকে যে রকম উত্তেজক পোশাক পরিয়ে দোকানের সামনে সাজিয়ে রাখা হয়, তা কিশোর-তরুণদের মনকে যৌন উত্তেজনায় তাড়িত করে। এর ফলে সমাজে ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধ সংঘটিত হওয়ার হার অনেক গুণ বেড়ে যায়।

চলতি পথে নারীদেহের এমন প্রদর্শনীকে কুরুচিপূর্ণ বলেও আখ্যা দিয়েছেন বিজেপির নাগরিক সমাজের এক কাউন্সিলর। ঋতু তাওড়ে বলেন, যদি তাদের এই দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে পোশাকহীন, অন্তর্বাস পরা বা অর্ধনগ্ন সব ম্যানিকুইন জোরপূর্বক দোকান থেকে সরিয়ে নেয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, স্বল্পবসনা এসব ম্যানিকুইন কোমল মনে কুপ্রভাব ফেলতে সক্ষম। তাই তিনি এটি নিষিদ্ধের জোর দাবি তুলেছিলেন।

প্রিয় আনোয়ারা–

ঋতু তাওড়ের এই দাবি নিয়ে বিশ্বমিডিয়ায় বেশ তোলপাড় শুরু হয়। ভারতের মতো একটি উদারনৈতিক বাণিজ্যিকীকরণ দেশেই যদি এই দাবি ওঠে, তবে বাংলাদেশের মতো রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থার দেশে তা কেন উঠবে না? বাংলাদেশের অনেক নামীদামি বিপণিবিতানে এ ধরনের প্লাস্টিকের পুতুলকে উত্তেজক পোশাকে সাজিয়ে রাখার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সাধারণ বিপণিগুলোতে এই ম্যানিকুইনকে যদিও সাধারণ পোশাকেই সাজানো হয়, কিন্তু সেগুলোকে স্থাপন করা হয় নানা উত্তেজক ভঙ্গিমায়। আর নামীদামি বিপণিগুলোতে সাধারণ পোশাকের পরিবর্তে ম্যানিকুইনের গায়ে ওঠে উত্তেজক পোশাক। যেমন বিকিনি, শর্ট স্কার্ট, অন্তর্বাস, নাইটি ইত্যাদি। যেগুলো প্রদর্শন করা আমাদের সমাজের সঙ্গে মোটেও চলনসই নয়।

সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, ম্যানিকুইনগুলো পোশাকের দোকানে যে ভঙ্গিমায় এবং যেসব দর্শনীয় স্থানে সাজিয়ে রাখা হয়, তাতে প্রায়ই বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয় সাধারণ ক্রেতাদের। কারণ, শপিংমলে মা-

ছেলে, বাবা-মেয়ে কিংবা ভাই-বোন একসঙ্গে কেনাকাটা করতে গেলে এসব উত্তেজক ভঙ্গির পুতুল দেখলে বিব্রত না হয়ে উপায় থাকে না। মাথা নিচু করে কিংবা দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে সেখান থেকে চলে আসতে হয়। এগুলো একজন সচেতন বাবা-মা কখনোই কামনা করেন না।

প্রিয় আমরিন–

ঋতু তাওড়ে যে বিষয়টি সামনে এনেছিলেন, সাদাচোখে দেখলে মনে হবে– ধর্ষণ প্রবণতা বৃদ্ধিতে খুব একটা প্রভাব ফেলে না, কিন্তু তাই বলে এটিকে উপহাস করে উড়িয়ে দেয়ারও যুক্তি নেই। যেমন সমাজে হিন্দি মুভির প্রচলন জোরসে চললেও সেটিকে ভদ্রোচিত কোনো বিনোদন বলা যাবে না। হিন্দি মুভি যেমন আমাদের সমাজে কদর্য যৌনতা ছড়িয়ে দিচ্ছে, তেমনি আরও অনেক ধরনের বাহুল্য সংস্কৃতিও সস্তা দরে বিকোচ্ছে বাংলাদেশের বাজারে। জনগণও সস্তায় পেয়ে সেগুলোর যথেচ্ছ ব্যবহার করছে। কিন্তু এর কুফল যে কতোটা ভয়াবহ রূপ নিতে পারে, সে ব্যাপারে কারো বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।

ভারতে সাম্প্রতিক ধর্ষণ-ভয়াবহতা দেখে বিভিন্ন শ্রেণির গবেষক ধর্ষণের কারণ উদ্ঘাটনে ব্যাপৃত হন। তারা বেশ কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেন। যেমন নারীদের নিরাপত্তার জন্য অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনী, মেয়েদের যৌন উত্তেজক পোশাক, সামাজিকভাবে নারীকে দুর্বল ভাবা, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, ধর্ষণ বা নারী নির্যাতনের শাস্তি লঘুতর ও দীর্ঘমেয়াদি বিচার-প্রক্রিয়াসহ বেশ কিছু কারণ উল্লেখ করা হয়।

এর মধ্যে নারীদের উত্তেজক পোশাক পরাটাকে অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও এই মত যখন কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি ব্যক্ত করেন, তখন তাদের নানামুখী তোপের মুখে পড়তে হয়। বিশেষ করে ভারতীয় 'আধুনিকা' নারীরা স্লোগান তোলে– 'আমাকে পোশাক সংযত করতে বলো না, পুরুষকে বলো তার দৃষ্টি সংযত করতে।' এ নিয়েও বেশ শোরগোল হয় কিছুদিন।

প্রিয় সেলিনা–

এ ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ২০১৪ সালের ১৬ জানুয়ারি হিন্দুদের অন্যতম তীর্থস্থান পুরির শঙ্করাচার্য স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী ধর্ষণের জন্য পশ্চিমা সংস্কৃতিকে দায়ী করে এক বক্তব্য রাখেন। কলকাতায় এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবেই দেশে ধর্ষণের ঘটনা বেড়ে গেছে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, পশ্চিমা দুনিয়ার প্রভাব পড়েছে সিনেমা, ক্লাবের আড্ডা, মানুষের পোশাক এবং জীবনযাত্রার ওপর। আগে ভারতীয় ঐতিহ্যে শেখানো হতো একজন নারীকে মা বা বোনের মতো করে দেখতে। সেখানে আজকের সমাজে নারীদের কোনো সম্মানই নেই। ক্লাব কালচার, মাদক সেবনের প্রবণতা, এমনকি চলচ্চিত্রে যৌনতার ব্যাপক দৃশ্যায়ন গোটা দেশে এক অপসংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। দিল্লি গণধর্ষণের মতো মারাত্মক ঘটনা কখনও একদিনে হঠাৎ করে ঘটে না। ভারতীয় সংস্কৃতিতে এখন উন্নয়নের নামে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি প্রতিটা পদক্ষেপে জড়িয়ে গেছে।

যদিও তার মতকে অনেকটা নারী স্বাধীনতা কিংবা প্রগতির পথে অন্তরায় বলে ধরে নেয়া হয়েছিলো, তবে এ কথাও ভুলে গেলে চলবে না যে, ধর্ষণের ঘটনা কিন্তু সবচেয়ে বেশি ঘটে নারী স্বাধীনতার স্বর্গরাজ্য খোদ আমেরিকাতেই। যেখানে ড্রেসকোড বলে কিছু নেই।

প্রিয় মর্জিনা–

এতো কিছুর পরও আলোচনায় যখন চলে এসেছে নিরপরাধ প্লাস্টিকের পুতুল, তখন আমাদের ভাবার প্রয়োজন আছে যে, আধুনিক সভ্যতা প্রগতির নামে আমাদের সমাজে আসলে কী সাপ্লাই করছে। আমাদের ঐতিহ্যের রঙিন শাড়ি আর বোরকার জায়গা যখন দখল করে নিচ্ছে স্কার্ট, টপস, জিন্স, লেগিংস, প্লাজো, টি-শার্টের মতো সংক্ষিপ্ত উত্তেজক পোশাক, তখন সেগুলো প্রদর্শন করতে প্লাস্টিকের উদ্ভিন্ন পুতুলের প্রয়োজন পড়ে বৈকি! কারণ নষ্ট এই সভ্যতা প্রদর্শনের সবচেয়ে দামি আইটেমই তো নারী। সেটা জলজ্যান্ত নারীই হোক কিংবা প্লাস্টিকের পুতুল।

বিনোদন-জগতে নারী

লিভ টুগেদার-বিয়ে-সংসার-ডিভোর্স

প্রিয় জুয়াইরিয়া–

যে মেয়েটি এখনো বয়ঃসন্ধিকাল পার করেনি, তারও একটা স্বপ্ন আছে। একদিন বিয়ে হবে, স্বামী হবে, সংসার হবে, স্বামীর সোহাগ, বাচ্চা-কাচ্চা– ইত্যাকার স্বপ্ন তো বয়ঃসন্ধিকাল পার হওয়ার আগেই একটা বাঙালি মেয়ের মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দেয়। তাই না?

দেখো না, মেয়েরা শিশুবয়সে যখন ছোট ছোট হাঁড়ি-পাতিল দিয়ে ঘরকন্না খেলা খেলে, তখন তারা কী সুন্দর করেই না নিজেদের ঘর-সংসার সাজায়। এখানে ঘর বানায় ওখানে বারান্দা, একটু উঠোন, রান্নার জায়গা– আরো নানা বৈষয়িক বিষয় থাকে তার গেরস্থালিতে। একটা ছেলেশিশু কিন্তু এটা পারে না। সে এক-আধটু খেলার পরই হঠাৎ ঠুনকো কারণে রাগ করে ঘরদোর সব ভেঙে ফেলে। মেয়েরা আর যা-ই করুক সাজানো ঘর-সংসার সাধারণত ভাঙে না। এটাই তাদের প্রকৃতিপ্রদত্ত গুণ। আল্লাহ তাআলা এমন মমতাময়ী করেই নারীদের সৃষ্টি করেছেন। এটাই সৃষ্টিরহস্যের অমোঘ সত্য।

কিন্তু তুমি তো জানোই, বর্তমান আধুনিক সমাজ বাস্তবতায় নারীকে মমতাময়ী বলতে মানা। নারীকে মমতাময়ী বা সংসারী বলতে নিষেধ আছে।

প্রিয় নীলা–

কিছুদিন আগে বাংলাদেশের এক বড় কমিউনিস্ট নেতার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়েছিলো। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন– 'বাংলাদেশের

জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। এই অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে যদি কাজের আওতায় আনা যায়, তাদের জন্য যদি কর্মসংস্থান তৈরি করা যায়, তবে বাংলাদেশের চেহারা পাল্টে যাবে। আমরা নারীকে কেবল ঘরের বন্দিনিবাসী করে রেখেছি। তাদের যদি ঘর থেকে বাইরে এনে কর্মক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন করা যায়, তাহলে আমরা প্রগতির পথে অনেক দূর অগ্রসর হবো।'

কমিউনিস্ট নেতার মতে, নারীদেরও কর্মে বেগবান করা উচিত। চাকরি-বাকরিতে অংশগ্রহণ করা উচিত। কিন্তু কথা হলো, এই যে প্রগতি আর উন্নয়নের কথা বলে নারীকে ঘরের বাইরে আনার প্রচেষ্টা চলছে, তার মাথার ঘোমটা-হিজাব খোলার আপ্রাণ কোশেশ চলছে, তাকে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার রিহার্সেল চলছে– এতে করে আমাদের সমাজে লাভের চেয়ে ক্ষতিটাই কি বেশি হচ্ছে না? আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন– প্রগতি, আধুনিকতা, কমিউনিজম, সমঅধিকার বিষয়গুলো কিন্তু সব সমাজে সমানভাবে ফলদায়ক হয় না। বাংলাদেশের মতো একটি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে নারীকে ঘর থেকে বাইরে এনে যতোটুকু ফায়দার কাজ হবে, তার চেয়ে ঢের বেশি হবে ক্ষতির দিকটা।

প্রিয় মুমতাজ–

তোমাকে শুধু বাংলাদেশের কথাই বলছি কেন, পৃথিবীর যে দেশেই নারীকে প্রগতির পথে আনা হয়েছে, আধুনিকতার নামে রাস্তায় নামানো হয়েছে, সেখানেই নারী হয়েছে কেবলই পুরুষের মনোরঞ্জনের ভোগ্যপণ্য।

ধরো মিডিয়ার কথা। মিডিয়া তো আধুনিক নারীর সবচেয়ে উর্বর বিচরণক্ষেত্র। কিন্তু সেই মিডিয়া বাংলাদেশের নারীদের কি মহার্ঘ্য বস্তু বিতরণ করছে? একের পর এক স্ক্যান্ডাল, গোপন ভিডিও, সংসার ভাঙা, আত্মহত্যা, মাদক গ্রহণ, প্রেম-বিয়েসহ আরো নানা অরুচিকর অপরাধে জর্জরিত আমাদের মিডিয়ার নারীরা। তারা না হতে পারছেন কারো আদর্শ আর না সমাজের জন্য দিতে পারছেন কোনো শুদ্ধতার দাওয়াই। বরং তাদের এসব অপকর্ম দিয়ে তারা সমাজকে আরো প্রকট পঙ্কিলতার বিষবাষ্পে কলুষিত করছেন প্রতিনিয়ত।

প্রিয় কাকলী–

তোমাকে বলতে পারি বর্তমান সময়ে আমাদের মিডিয়ার নারীদের ঘর-সংসার নিয়ে। যুগ যুগ ধরে লালন করা পরিবারপ্রথা, পারিবারিক বন্ধন ও সম্পর্কের দায়বদ্ধতা আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির অংশ। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের মিডিয়া-জগতের স্টারদের মধ্যে যেভাবে ডিভোর্সের হিড়িক পড়েছে, তা বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে মোটেও মানানসই নয়।

সেলিব্রেটিরা তো আমাদের সমাজের রোল-মডেল। তারা যখন বিয়ে-পরিবার-সম্পর্ক নিয়ে ছেলেখেলায় মেতে ওঠেন, অনুকরণপ্রিয় সাধারণ মানুষের মধ্যে তার প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়ে যায়। তাই এটি এখন হয়ে উঠেছে আমাদের সংস্কৃতির জন্য এক মহা বিপৎসংকেত।

আমরা এতোদিন হলিউড-বলিউডের নায়ক-নায়িকাদের বিয়ে না করেই লিভ টুগেদার, এক সঙ্গী রেখে অন্য সঙ্গীর সঙ্গে চলে যাওয়া, বিয়ের পর বছর গড়ানোর আগেই ডিভোর্স, পরকীয়া আর বহুগামিতার খবরাখবর পড়ে একধরনের কৌতুক অনুভব করতাম আর ভাবতাম, এই কি সভ্যতা! রি রি করে উঠতো আমাদের অন্তর।

কিন্তু এই একই ব্যাধি যখন আমাদের মিডিয়া-জগতের তারকাদের মধ্যেও রীতিমতো ঘটতে দেখি, তখন আমরা চমকে উঠি– তবে কি বিনোদন-তারকাদের সংসার মানেই তাসের ঘর! হলিউড-বলিউডের মতো আমাদের মিডিয়ার তারকাদেরও সম্পর্ক বা সংসার গড়া আর ভাঙা ডালভাতের মতো মামুলি ব্যাপার!

প্রিয় মাহিয়া–

একজন আধুনিক মেয়ে হিসেবে তুমি ভালো করেই জানো, যেকোনো দেশের যেকোনো মাধ্যমের শিল্পীসমাজকে বলা হয় সে দেশের তারুণ্যের রোল মডেল, সমাজের আদর্শ। তাদের প্রতি সবসময়ই সাধারণ মানুষের থাকে কৌতূহলী দৃষ্টি। মানুষ তাদের অনুকরণ করে, অনুসরণ করে। তাদের আদর্শ ও জীবনাচারকে নিজেদের জন্য মডেল হিসেবে দেখে। এ কারণে শুধু শিল্পীজীবনেই নয়, ব্যক্তিজীবনেও উচিত সংযমী হওয়া ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকা।

কিন্তু বর্তমানে এ দেশের বিনোদিনীদের সবাই যেনো অপরাধ, স্ক্যান্ডাল আর বিতর্কের দোকান খুলে বসেছেন। মাদক থেকে শুরু করে নানা অশালীন কর্মকাণ্ডে তাদের নাম উঠে আসছে। কেউ মধুকুঞ্জ সাজিয়ে গোপনে মক্ষীরানির ভূমিকা পালন করছেন, কেউবা মাদকের আবেশে ইয়াবা সম্রাজ্ঞী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন।

প্রিয় মুনতাহা–

অসামাজিক এই ঘটনাগুলো না হয় বাদ দেওয়া যাক। গত কয়েক বছরে আমাদের বিনোদিনী অভিনেত্রী-মডেলদের যে হারে ডিভোর্স-সংসার ভাঙার হিড়িক পড়েছে, তাতে তারা সমাজের জন্য আসলে কী আদর্শ বিতরণ করছেন, সেটা একটা বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিয়ে-সংসারটাকে তারা একেবারেই ছেলেখেলায় পরিণত করে ফেলেছেন। ধর্মীয় দিক থেকে ডিভোর্স-তালাককে সব থেকে ঘৃণিত জায়েজ বিষয় বললেও আমাদের মিডিয়ার নট-নটীদের কাছে তা যেনো নিছক একটা তামাশা মাত্র। যখন যাকে ইচ্ছে তার সঙ্গে থাকছেন আবার ইচ্ছে হলেই একজনকে ছেড়ে আরেকজনের সঙ্গে ভিড়ে যাচ্ছেন। বিয়ে-সংসারকে সম্মান জানানোর মতো সাধারণ সামাজিক ভব্যতাও তাদের মধ্যে লক্ষ করা যায় না।

প্রিয় রুমানা–

ভেবে দেখো, আমাদের মিডিয়ায় জনপ্রিয় তারকাদের ব্যক্তিগত জীবনে যেভাবে একটার পর একটা ডিভোর্সের ঘটনা ঘটছে, তাতে সাধারণ মানুষ মনে করতেই পারে মিডিয়াতে আসলে পারিবারিক বন্ধন, সম্পর্কের দায়বদ্ধতা আর নৈতিকতার কোনো বালাই নেই। বাস্তবতা কি এর চেয়ে খুব বেশি ভিন্ন? তুমি-আমি হয়তো অল্প কয়েকজন বিনোদিনীর খবরাখবর জানি, যাদের ব্যাপারে পত্রিকা বা মিডিয়ায় মাঝেমধ্যে খবর আসে। কিন্তু মিডিয়ার আরো অনেক রথী-মহারথী এ ধরনের সামাজিক অসঙ্গতির সঙ্গে জড়িত। তাদের অনেক খবরই মিডিয়ায় আসে না। যদিও আসে তবু তারা এসব কেয়ার করেন না এবং এইসব গর্হিত

কাজের পর তারা নিজেদের কখনোই অপরাধী ভাবেন না বা লজ্জা-সংকোচে বিব্রত বোধ করেন না।

মিডিয়ার সেলিব্রেটিরা মুখে দেশীয় সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে ফেনা তুলছেন, অথচ তারাই ব্যক্তিজীবনে অনুসরণ করছেন হুট-হাট সংসার ভাঙার পশ্চিমা সংস্কৃতি। তারকাদের যেকোনো কাজ মানুষকে প্রভাবিত করে, মানুষ তারকাকে অনুকরণ-অনুসরণ করে। মিডিয়ায় একটার পর একটা ডিভোর্সের ঘটনার মধ্য দিয়ে যে দৃষ্টান্ত তারা তৈরি করছেন, তার প্রভাব মোটেও শুভ হতে পারে না।

প্রিয় মাহমুদা–

বাংলাদেশের বিনোদন-জগতের নায়ক-নায়িকাদের আরেকটি গর্হিত ও দৃষ্টিকটু বিষয়– তাদের বিলম্বিত বিয়ে। বিয়ে নিয়েই সবচেয়ে বেশি লুকোচুরি করেন তারা। মিডিয়ায় একটা কথা আছে, 'বিয়ে হলেই নায়ক-নায়িকার জনপ্রিয়তা কমে যায়।' তাই হয়তো বিয়ের খবরটা লুকাতে চান তারকারা। কিন্তু জীবনে জনপ্রিয়তাই কি সব? মানুষের সামনে নিজেদের লোভনীয় দেহ আর কমনীয় হাসি দিয়ে তাদের যৌন বাহবা কুড়ানোর নামই কি জীবন? একেকজন নায়িকা-মডেলের বিয়ের বয়স পার হয়ে গেছে ঢের আগে, কিন্তু এখনো তাদের মুখে বিয়ের নাম-গন্ধ শোনা যায় না। সাংবাদিকরা তাদের কাছে বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করলে তারা সুফি-দরবেশের মতো উত্তর দেন, 'জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে এই তিন জিনিস ওপরওয়ালার হুকুম ছাড়া হয় না।' পঁচিশ-তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হলেও তারা কিশোরী মেয়েদের মতো ন্যাকামি করে বলেন, তাদের এখনো বিয়ের বয়স হয়নি, বিয়ে নিয়ে তারা এখন ভাবছেন না।

কী আজিব ধরনের কথাবার্তা! ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বয়সে বাংলাদেশের একজন নারী তো বিয়ে, বাচ্চা-কাচ্চার পাট চুকিয়ে নাতি-নাতনির স্বপ্ন দেখা শুরু করেন। আর আমাদের মিডিয়ার বিনোদিনীরা বলেন, তারা নাকি এসব নিয়ে ভাবছেনই না!

প্রিয় মাজিদা–

তুমি শুনেছো কি না জানি না, কয়েক দিন আগে দেশের চলচ্চিত্রের নামী পরিচালক পিএ কাজলের সঙ্গে এক উঠতি মডেলের গোপন প্রেমালাপ মিডিয়ায় ফাঁস হয়ে যায়। সেখানে পিএ কাজল ওই মডেলকে বলেন, মিডিয়ায় অবস্থান দৃঢ় করতে হলে তোমাকে পরিচালক-প্রযোজকদের সঙ্গে 'বিশেষ সম্পর্ক' তৈরি করতে হবে...। পিএ কাজলের ইঙ্গিত দেয়া 'বিশেষ সম্পর্ক' যদি থাকে, তাহলে মিডিয়ার নারীদের বিয়ে করার প্রয়োজন আসলেই থাকে কি না, তা তারাই বলতে পারেন। তা না হলে এই বয়সী একটি মেয়ে পুরুষসঙ্গ ছাড়া থাকে কী করে? সে তো আর যা-ই হোক কাম-বাসনাহীন ফেরেশতা নয়! বিয়ে, কাম-বাসনার প্রয়োজন তো আর দশজন মানুষের মতো তাদেরও হওয়ার কথা।

কিছুদিন আগে একটি অনলাইন নিউজ এজেন্সিকে জনপ্রিয় চলচ্চিত্র অভিনেত্রী পপি বলেন, 'দেখুন, বিয়ে একটা মেয়ের জীবনের আলটিমেট টার্গেট হতে পারে না। আমি এটা মানি না। একজন মেয়ের জীবনে অনেক কিছু করার আছে। আমি এখন কাজটাই করতে চাই। আজ থেকে ৪০ বা ৫০ বছর পরেও যেনো মানুষ আমাকে মনে রাখে, সে কাজটি করতে চাই। বিয়েটা আমার কাছে এতো জরুরি বিষয় না।'

পঁয়ত্রিশোর্ধ্ব পপির কথা এটা। কী এমন জরুরি কাজটা পপি এখন করছেন? বিগত পাঁচ বছরে তার বড়জোর দুটো ছবি রিলিজ হয়েছে। এছাড়া মিডিয়ায় তাকে খুঁজেই পাওয়া যায় না। তবুও তিনি বিয়ে করতে নারাজ। বিয়ে তার কাছে এতোই গুরুত্বহীন একটি বিষয়!

আরেক অভিনেত্রী স্বাগতা বলেন, 'বিয়ে নিয়ে আমি কখনোই কিছু ভাবি না। বিয়ে করতে হবে আর বাবা-মা বিয়ে দিবে তাই বিয়ে করবো। আলাদা করে আমার কোনো চিন্তা নেই। আমরা যারা মিডিয়া-জগতে কাজ করি, তারা নিজেদেরই ঠিকমতো সময় দিতে পারি না। সেক্ষেত্রে স্বামীর জন্য আলাদা করে সময় বের করা খুব কঠিন হয়ে যায়। আর একটা ব্যাপার সেটা হলো, বিয়ের পর বাচ্চা হবে। তাই বিয়ে নিয়ে আপাতত ভাবছি না।'

প্রিয় সাবা–

বেশ বেশ! এভাবেই চলছে আমাদের তারকাদের জীবনযাপন। বর্তমান সময়ের আরেক ব্যস্ত মডেল-অভিনেত্রী ভাবনা তো আরেক কাঠি সরেস। তাকে বিয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'বয়সে ছোট হলেও আমি সবসময় বড়দের চরিত্রে অভিনয় করি, তাই হয়তো দর্শকের জানার ইচ্ছা। যা-ই হোক, আমি আপনার মাধ্যমে আমার দর্শককে জানিয়ে দিতে চাই, আগামী দশ থেকে পনেরো বছর পর আমি আমার বিয়ে নিয়ে ভাববো।'

এই হলো আমাদের মিডিয়ার নারীদের হাল-হকিকত। তাদের জীবনে বিয়েটার যেমন প্রয়োজন নেই, আবার বিয়ে করলে সংসার টিকিয়ে রাখার ব্যাপারেও তারা আন্তরিক নন। তারা মনে করেন, আমার রূপ আছে, দেহভরা যৌবন আছে, জনপ্রিয়তা আছে– আমার জন্য আরেকটা স্বামী পাওয়া কোনো ব্যাপার হবে না।

ব্যস, কিসের প্রয়োজন স্বামী-সংসার আর অনাহূত সংসারজীবনের। কিন্তু তারা বুঝতে চান না যে, তারাও একটা সমাজের বাসিন্দা। সেই সমাজের একটা রীতি আছে। মান্য করার মতো সামাজিকতা আছে। এগুলো না মানলে মানুষ তাদের আর যা-ই করুক সম্মান করে না।

প্রিয় শামীমা–

এ বড় বেদনার বিষয়, যা তোমাকে বলছি। আধুনিক এ যুগে মিডিয়ার সেলিব্রেটিদের আমাদের সমাজ রোলমডেল মনে করে। সমাজের যুবক-যুবতীরা তাদের নিজেদের জীবনের আদর্শ মনে করে। অথচ তারাই এই লাখ লাখ যুবক-যুবতীকে নিজেদের সেলিব্রেটি ইমেজ ব্যবহার করে বিপথে পরিচালিত করছে। না তারা সমাজের জন্য কোনো আদর্শ স্থাপন করতে পারছে, না নিজেদের জীবনে স্বাভাবিক সুখ-শান্তির দেখা পাচ্ছে। নিজেদের জীবনের অসুস্থ আচার-আচরণ ছড়িয়ে দিচ্ছে নিজেদের ফ্যান-ভক্তদের মাঝে।

এ কারণে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি– নিজের জীবনের আদর্শ যদি কাউকে মানতেই হয়, যদি নিজের জীবনের রোলমডেল কাউকে

বানাতেই হয়, তবে রাসুলের স্ত্রীদের দেখো। তাঁদের জীবনী পড়ো। দেখো, তাঁরা কীভাবে এই সমাজকে ভালোবেসে, উম্মতকে ভালোবেসে সবচেয়ে উত্তম আদর্শ রেখে গেছেন তোমার জন্য। তাঁদের জীবনাদর্শ এমনই নিখুঁত, পৃথিবীর একজন প্রজ্ঞাবান মানুষও তাঁদের জীবনের কোনো খুঁত ধরতে পারেননি। নিজের জীবনের আদর্শ বানাও তাঁদেরই।

মরণনেশা

এইসব অনিচ্ছুক মৃত্যুরা

প্রিয় মারিয়া–

সম্প্রতি একটি উপন্যাস পড়লাম। নাম 'দ্য কোবরা'। লেখকের নাম ফ্রেডরিক ফরসাইথ। বৃটিশ এবং বেস্টসেলার লেখক। দ্য কোবরা উপন্যাসটির প্রতিপাদ্য নেশাদ্রব্য কোকেইন। কোথায় এটি উৎপাদন হয়, কোথায় ও কীভাবে বাজারজাত করা হয়, কারা বাজারজাত করে, কী পরিমাণ কোকেইন বিশ্বের কোন দেশে কীভাবে আসক্তদের হাতে পৌঁছে এবং মাদক বিষয়টির আরো বিস্তর তথ্য নিয়ে একটি মাস্টারপিসে পরিণত হয়েছে 'দ্য কোবরা' নামের থ্রিলার উপন্যাসটি।

উপন্যাসে আমেরিকায় ড্রাগ আসক্তির একটি ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে সেটিকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়, তার কোশেশ করা হয়েছে। উপন্যাসের প্রথম পর্বে আমরা দেখতে পাই, আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সরাসরি নির্দেশে সে দেশের মাদক নিয়ন্ত্রণ সংস্থার বড়কর্তা কোকেইনের ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন। সে প্রতিবেদনের উপসংহারে তিনি একটি ভয়াবহ তথ্য তুলে ধরেন– আমেরিকায় নাইন ইলেভেনে টুইন টাওয়ার হামলায় যে পরিমাণ মানুষ মারা গিয়েছিলো, ড্রাগের ছোবলে প্রতিবছর তার চেয়ে দশ গুণ বেশি মানুষ মারা যায়!

এই কথা শোনার পর ড্রাগ নিয়ে তত্ত্বমূলক আর বিশেষ কিছু বলার আছে বলে মনে করি না। বুঝতেই পারছো, এবার তোমাকে বলবো ড্রাগ আসক্তির ভয়াবহতা নিয়ে।

প্রিয় সাহারা–

ঐশীর কথা মনে আছে? যে ঐশী মরণনেশা ইয়াবার আসক্তির কারণে হত্যা করেছিলো তার পুলিশ কমিশনার বাবা ও মাকে। সে ঐশীর কথাই বলছি তোমাকে। মনে পড়ছে মাত্র ষোলো বছর বয়সী মেয়েটির কথা? বর্তমানে সে জেলহাজতে আছে, ফাঁসির আদেশ হয়েছে তার। যেকোনো দিন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হতে পারে।

এই হলো ঐশীর অতীত ও বর্তমান হাল-হাকিকত। এবার চলো খানিকটা তাত্ত্বিক আলোচনায় যাই।

ঐশীর সমস্যাটা প্রধানত মাদক, ইয়াবা। নানা মুণি-ঋষি নানা সামাজিক, পারিবারিক, ধনিক সমস্যার কথা বললেও আমি মনে করি, এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের অন্যতম কারণ মাদক। মা-বাবা হত্যা সেই সমস্যারই প্রতিফল। ঐশী যদিও ইংরেজি এবং বাংলার মিশেলে বলেছে, তার মা-বাবা তাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতো না, অকারণে তার ওপর নানা বিধি-নিষেধ জারি করতো, বাবা ছিলো 'হাড় কেপ্পন' হাতখরচের টাকা দিতো যৎসামান্য; সেই যৎসামান্যের পরিমাণ কোনো কোনো পত্রিকার বরাতমতে তার মাসকাবারি এক লাখ, কোনো কোনো পত্রিকা বলেছে তার জন্য মাসিক বরাদ্দ ছিলো পাঁচ লাখ টাকা! সেটা ঐশী যা-ই বলুক, তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। একজন মাদকাসক্ত কিশোরীর কাছ থেকে এ ধরনের অসংলগ্ন কথাবার্তা শোনাটা অনাকাঙ্ক্ষিত নয়।

মা-বাবা ষোলো বছর বয়সী মেয়ের ওপর নজরদারি করবে, অযাচিত বিধি-নিষেধ আরোপ করবে- এটা তো স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু তার মন এটা মেনে নিতে পারেনি। মেনে নেয়ার কথাও নয়। কারণ, ভালো কথা শোনার স্টেজ সে পার করে ফেলেছে। মাদক তার মন-মানসিকতার মধ্যে সামান্য অনুযোগ শোনার মতো সহনশীলতাকেও খুব দ্রুত নষ্ট করে ফেলেছে। এটাই মাদকের কাজ।

প্রিয় তারান্নুম–

তোমার মনে রাখতে হবে, ঐশীর সমস্যার শুরুটা একটা গুরুত্বপূর্ণ টার্নিং পয়েন্ট। কেন কৈশোরে পা দেয়া লাজুক মেয়েটি ধীরে ধীরে মা-

বাবার প্রতি এমন চরম বিতৃষ্ণ হয়ে উঠলো? ঐশীর টাকার অভাব ছিলো না। হাজার হাজার নয়, ঐশীর জন্য বরাদ্দ থাকতো লাখ লাখ টাকা। একমাত্র মেয়েকে টাকা দিতে পুলিশ বাবার কখনো বেগ পেতে হয়নি। এই বেগ না পাওয়াটাই একটা টার্নিং পয়েন্ট। এখানেই মনস্তাত্ত্বিকভাবে ঐশী ধরা পড়েছে নিজের কাছে।

প্রিয় আইরিন–

একটি শিশু নিষ্পাপ হয়েই পৃথিবীতে জন্ম নেয়। আট-দশ বছর পর্যন্ত একটা বাচ্চা পাপ-পুণ্যের বাস্তবতা খুব একটা বুঝতে পারে না। কিন্তু এর পর থেকে পারে। কোনটা পাপ আর পুণ্য সেই জ্ঞান সে আট-দশ বছরের পর থেকেই প্রয়োগ করতে পারে। সুতরাং, বয়স হওয়ার পর থেকেই ঐশী যখন বুঝতে পারলো তার বাবা একজন 'টাকা কামাই' করা লোক, তখন থেকেই তার মনের ভেতরে বাবার প্রতি ঘৃণা জন্ম নেয়। ঘৃণাটা জন্ম নেয় প্রকাশ্যে না, অবচেতনে। এবং সে যখন তার পুলিশ বাবার অবৈধ কামাইয়ের ব্যাপারে জানতে পারলো, তার বাবা যে ক্রমাগত পাপ করছে- সেটা জানতে পারলো, তখন সে নিজের জন্য সামান্য পাপ করাকে খুব বেশি খারাপ কাজ বলে মনে করতো না।

এটা হয়তো তার ভেতরে জমে থাকা ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে হয়ে থাকতে পারে। ছোট পাপ, মাঝারি পাপ করতে করতে একসময় সে বড় বড় পাপ করতে শিখে গেলো। তার জীবনে বন্ধু এলো, নেশা এলো, কামনা এলো এবং সবগুলো একসঙ্গেই এলো। যার কোনোটাই একজন মা-বাবার কাছে গ্রহণযোগ্য বিষয় নয়। ফলে ঘৃণা ও পাপ- উভয়টি উভয় দিক থেকেই শুরু হয়ে গেলো। সুতরাং একজন ঐশীর পিশাচ হওয়ার পেছনে অনেক কারণ-অকারণ থাকতেই পারে।

প্রিয় মিতু–

ইয়াবা জিনিসটা নিয়ে কথা বলতেই হয়। অন্য মাদক রেখে কেবল ইয়াবা নিয়ে কথা বলাটা এই মুহূর্তে অতি আবশ্যক বলে মনে করি। কারণ, ইয়াবা এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে চালু নেশাদ্রব্য। একটা সময়

হেরোইন ও ফেনসিডিল ব্যবহৃত হতো খুব, কিন্তু বিগত কয়েক বছরে বিদেশি ড্রাগ প্রস্তুতকারীরা অন্যান্য মাদকের পরিবর্তে সহজলভ্য ইয়াবা পেয়ে সেটিকেই বহুলভাবে বাজারজাত করা শুরু করে। ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় এই নতুন মাদকটি ভয়াবহভাবে বিস্তার লাভ করে।

এখানে একটুখানি ইতিহাস দেখে নেয়া যাক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অনেক বাঙালি গিয়েছিলেন যুদ্ধ করতে। যুদ্ধ শেষে যখন তারা ফিরে আসেন, তখন তাদের আচার-আচরণ পুরোপুরি বদলে গিয়েছিলো। সৈন্যদের কী কী ধরনের ট্যাবলেট নাকি খেতে দেয়া হতো, যা খেলে সারা দিনে ক্ষুধা লাগতো না, দুই-তিন দিনেও ঘুম আসতো না এবং একাই দশজনের কাজ করতে পারতো। দেশে ফিরে আসার পর তাদের অধিকাংশই মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

প্রিয় লায়লা–

খুব ভালো করে মনে রেখো, এটাই নেশাদ্রব্যের কাজ। নেশার উপকরণগুলো এভাবেই কাজ করে। এভাবেই মানুষকে অকেজো করে ফেলে। বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের আগে নেশা জিনিসটা অত্যন্ত অভিজাত শ্রেণির জন্যই বরাদ্দ ছিলো। কিন্তু যুদ্ধের পর তা ব্যাপকহারে সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। এর কারণ হলো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান বাহিনীকে অধিকতর শক্তিশালী ও কর্মক্ষম রাখতে উত্তেজক বিভিন্ন ধরনের 'দাওয়াই' আবিষ্কার করা হয়। মিত্র বাহিনীতেও এ ধরনের দাওয়াই পরিবেশন করা হতো, যাতে সৈন্যদের দিয়ে দুঃসাহসী কাজ করানো যায়। এই উত্তেজক দাওয়াই উৎপাদনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ল্যাবরেটরি খোলা হয়, যেনো আরো উন্নততর দাওয়াই প্রস্তুত করা যায়।

তো যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দেখা গেলো, এসব ল্যাবরেটরি থেকে তৈরি দাওয়াই সাধারণ মানুষের মধ্যেও বেশ ভালো উদ্দীপনা তৈরি করছে। ব্যস, আর যাবে কোথায়! যুদ্ধোত্তর মন্দার সময় বিপুল বিক্রমে শুরু হয়ে গেলো দাওয়াই উৎপাদন। বিক্রি বাড়াতে ধীরে ধীরে সেই দাওয়াইয়ের মধ্যে যোগ হলো যৌনবর্ধক নানা ধরনের কেমিক্যাল এবং

বিশ্বব্যাপী এগুলো ছড়িয়ে পড়লো। ইয়াবার জন্মও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে।

প্রিয় হাসনা–

তুমি হয়তো জানো না ইয়াবা কীভাবে সেবন করতে হয়। না জানাটাই শ্রেয়। তবে শরীরে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া কী হয়, সেগুলো তোমাকে জানাচ্ছি। ইয়াবা সেবনের নানা উপায় থাকে। সেবনের পর ক্ষণস্থায়ী আনন্দের পর বাড়তে থাকে ক্ষতিকর নানা উপসর্গ। রাত কাটে নির্ঘুম, ইয়াবা প্রতিক্রিয়ায় টানা সাত থেকে ১০ দিনও জেগে থাকতে বাধ্য হয় অনেকে। শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়তে থাকে, মেজাজ হয় খিটখিটে, গলা-মুখ শুকিয়ে আসতে থাকে অনবরত। প্রচণ্ড ঘাম আর গরমের অসহ্য অনুভূতি বাড়তে থাকে। বাড়ে নাড়ির গতি, রক্তচাপ, দেহের তাপমাত্রা আর শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি। দীর্ঘদিনের আসক্ত ব্যক্তিরা উচ্চ রক্তচাপের রোগী হয়ে পড়ে। মস্তিষ্কের ভেতরকার ছোট রক্তনালিগুলো ক্ষয় হতে থাকে, এগুলো ছিঁড়ে অনেকের রক্তক্ষরণ শুরু হয়। স্মৃতিশক্তি কমে যায়, মানসিক নানা রোগের উপসর্গ দেখা দেয়।

পড়াশোনা, কর্মক্ষেত্র বা পারিবারিক জীবনে বিরূপ প্রভাব পড়ে। সব ক্ষেত্রে ব্যর্থতা বা পিছিয়ে পড়তে থাকায় আসক্ত ব্যক্তিরা বিষণ্নতায় আক্রান্ত হয়। কারও কারও মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয়। দৃষ্টিবিভ্রম, শ্রুতিবিভ্রম আর অস্বাভাবিক সন্দেহ প্রভৃতি উপসর্গ থেকে একসময় সিজোফ্রেনিয়ার মতো জটিল মানসিক ব্যাধিও দেখা দেয়। বেশি পরিমাণে নেওয়া ইয়াবা শারীরবৃত্তীয় স্বাভাবিক কার্যক্রমের ব্যত্যয় ঘটিয়ে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনতে পারে। আর যারা সিরিঞ্জের মাধ্যমে দেহে ইয়াবা প্রবেশ করায়, তারা হেপাটাইটিস বি, সি ও এইডসের মতো মারাত্মক রক্তবাহিত রোগের জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে।

প্রিয় মাহজুবা–

আসলে ড্রাগের উত্তেজনা খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং মজার বিষয় হলো, এই ড্রাগগুলোকে প্রথমে আবিষ্কারও করা হয়েছিলো সাময়িক উত্তেজনা

সৃষ্টি করার জন্যই, যেনো এর দ্বারা সৈনিক বা শ্রমিকদের দিয়ে বেশি করে কাজ করিয়ে নেয়া যায়। কিন্তু পিশাচ চরিত্রের লোকেরা সেটাকেই একসময় বানিয়ে নেয় নেশা করার উপাদান হিসেবে। এর ফলে সাময়িক উত্তেজনা এলেও খুব তাড়াতাড়ি একজন মানুষ পঙ্গু হয়ে যায়।

তোমাকে একটি বাস্তব উদাহরণ দিলে বিষয়টি ক্লিয়ার হবে। ধরো, তুমি একটি কম্পিউটার কিনলে। কেনার সময় টেকনিশিয়ান তোমাকে বলে দিলো, এটিকে প্রতিদিন ছয় ঘণ্টা করে চালাবেন। এর বেশি চালালে এটির কর্মক্ষমতা দ্রুত শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তুমি টেকনিশিয়ানের কথা না শুনে কম্পিউটারটিকে যদি দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা চালাও, তাহলে কম্পিউটারটি কতোদিন চলবে? টেকনিশিয়ানের ওয়ারেন্টির চার ভাগের এক ভাগ সময়। তার আগে নষ্ট হওয়াটাও খুবই স্বাভাবিক।

ইয়াবার বিষয়টিও ঠিক তেমনি। তোমার ভেতরে আল্লাহ্ তাআলা পঞ্চাশ বছরের শারীরিক ক্ষমতা দিয়েছেন। কিন্তু সে শক্তি সঠিকভাবে ব্যবহার করলেই কেবল সেটি পঞ্চাশ বছর কর্মক্ষম থাকতে পারে। ইয়াবা খাওয়ার ফলে মানুষের দেহ-মনে যৌনানুভূতি, শারীরিক পুলক, মস্তিষ্ক এতোটাই ভয়ঙ্করভাবে উদ্দীপ্ত হয় যে, এই শক্তিমত্তা কয়েক বছরের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। তার শারীরিক কর্মক্ষমতা, বিশেষ করে যৌনক্ষমতা অতি দ্রুত শেষ হয়ে যায়। একটা সময় আসক্ত মানুষটা হয়ে যায় কেবলই দৈহিক মানুষ, তার ভেতরে মানবীয় কোনো শক্তিমত্তাই কাজ করে না। এর নামই মাদক, এর নামই নেশা।

প্রিয় হাফিজা–

এতো কিছু জেনে তোমার মনে নিশ্চয় প্রশ্ন ঘুরঘুর করছে– তবুও কেন মানুষ এই ড্রাগ উৎপাদন করে? এর উত্তরও খুব সহজ। কারণ এই ব্যবসায় লাভ ধারণাতীত। ধরা যাক কোকেইনের কথাই। পৃথিবীর ৭০ ভাগ কোকেইন উৎপাদন ও বাজারজাত হয় দক্ষিণ আমেরিকার দেশ কলম্বিয়া থেকে। যে গাছটি থেকে কোকেইন উৎপাদন করা হয়, সেটির নাম কোকা গাছ। দেখতে আগাছার মতোই। দক্ষিণ আমেরিকার পাহাড়

জঙ্গলে এ গাছ অহরহ জন্মে। সাধারণত এ উদ্ভিদের কোনো ফুল কিংবা ফল হয় না। এই গাছের পাতা থেকেই উৎপাদিত হয় ড্রাগ।

কলম্বিয়ার গহিন বনে বাণিজ্যিকভাবে কৃষকরা এই গাছ চাষ করে থাকে। এক হাজার কেজি কোকা পাতাকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পরিশোধন করলে মাত্র ছয় কেজি সলিড কোকেইন পাউডার পাওয়া যায়। প্রতি কেজি কোকেইনের দাম একজন কৃষক পায় এক হাজার ডলার করে। তাদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে স্থানীয় ড্রাগ ব্যবসায়ীরা আন্তর্জাতিক ড্রাগ ব্যবসায়ীদের কাছে প্রতি কেজি বিক্রি করে চার হাজার ডলারে। আর কলম্বিয়ার এই আন্তর্জাতিক ড্রাগ ব্যবসায়ীদের বলা হয় কার্টেল বা ভ্রাতৃসংঘ। তারাই সমগ্র পৃথিবীতে বিভিন্ন ড্রাগ মাফিয়া ও সিন্ডিকেটের কাছে এগুলো সাপ্লাই করে এবং মূল লাভটাও তারাই করে।

এক হিসাব অনুযায়ী দেখা যায়, কলম্বিয়ায় যে প্রতি কেজি কোকেইন কেনা হয় চার হাজার ডলারে সেটা তিন হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে আমেরিকার নিউইয়র্কে এসে হয়ে যায় ষাট হাজার ডলারের কাঙ্ক্ষিত নেশাদ্রব্য। ইউরোপে বিক্রি হয় সত্তর হাজার ডলারে। এশিয়ায় বিক্রি হয় আশি হাজার ডলারে।

প্রিয় সামিহা–

এ তো গেলো ড্রাগ উৎপাদনের ফিরিস্তি। এবার শোনো কীভাবে ড্রাগ আমাদের মতো দরিদ্র দেশে প্রবেশ করে এবং কীভাবে এটা মরণঘাতী উপাদানে পরিণত হয়।

এই সাদা ড্রাগ কলম্বিয়া থেকে সলিড কোকেইন হয়ে ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়ায় এলেও মাফিয়া-সিন্ডিকেট, ড্রাগ ডিলার আর পাইকারি বিক্রেতারা এর ওজন বাড়ানোর জন্য এই পাউডারের মধ্যে আরো নানা ধরনের জীবনঘাতী কেমিক্যাল মিশ্রণ করে। কারণ, এক কেজি পাউডারকে দুই কেজি বানালেই নগদে আশি হাজার ডলার লাভ! এভাবে হস্তান্তরের প্রায় প্রতিটি স্তরে সলিড সাদা কোকেইনের সঙ্গে মিশ্রিত হয় নানা ধরনের মিশ্রণ। ফলে দেখা যায়, দশ হাত ঘুরে একজন ড্রাগ অ্যাডিক্টের কাছে যখন এক গ্রাম কোকেইন আসে, তখন তার মধ্যে

সাত ভাগের এক ভাগ থাকে কোকেইন আর ছয় ভাগই থাকে বিভিন্ন জীবননাশী কেমিক্যাল পাউডার। যেগুলো মানবদেহের জন্য কোকেইনের চেয়েও ক্ষতিকর।

ইয়াবার বিষয়টিও প্রায় একই রকম। মিয়ানমারে উৎপাদিত ইয়াবা নানা ভেজাল মিশিয়ে বিক্রি করা হয় বাংলাদেশি বাজারে, যা খেয়ে অনেক সময়ই অনেকের মারা যাবার ঘটনা ঘটেছে। মজার বিষয় হলো, মিয়ানমারে কিন্তু ইয়াবা পাওয়া যায় না। মিয়ানমারের রাখাইন সীমান্ত এবং গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গালঘেঁষা চার দেশের সীমান্ত এলাকায় বার্মিজ সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে উৎপাদিত হয় ইয়াবা। কিন্তু মিয়ানমারের ভেতরে ইয়াবা ঢুকতে দেয় না সীমান্তে তত্ত্বাবধানে থাকা সেনাবাহিনী। এর বেশিরভাগই পাচার করা হয় বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও থাইল্যান্ডে।

প্রিয় নুজহাত–

মাদক নিয়ে শেষ কথা বলবার আগে আবার সেই ঐশীর কথায় ফিরে আসি। ঐশীকে হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ড দিলে বা কিশোরী শোধনাগারে নিলে কোনো ফায়দাই হবে না। ঐশীকে জেলে ভরলে কেবল ঐশীর ব্যাপারেই কথা হবে, মাদকের ব্যাপারে কেউ কথা বলবে না। ঐশীর এই বিষয়টিকে যদি সরকার এবং সুধী সমাজ বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে পাশ কাটিয়ে যায়, তাহলে আরো শত শত ঐশী জন্ম নেবে।

অত্যন্ত দুঃখ নিয়ে লক্ষ করলাম, ঐশীর এই ঘটনার পর সরকারের নিরাপত্তা বাহিনী মাদক নির্মূলে কোনো ধরনের অভিযানই পরিচালনা করেনি। সরকার মূল ঘটনার সুরাহা না করে ঐশী কোন জিনিস দিয়ে বাবা-মাকে আঘাত করলো, কোন মোবাইলে ছবি তুললো, ঐশীকে কোথায় রাখা হবে– এই ধরনের বেহুদা বিষয় নিয়ে সিআইডি আর র‍্যাবকে বসিয়ে রাখে, তবে সেটা হবে বোকামির চরমতম সীমা। অথচ সরকার যদি ইচ্ছে করে, তাহলে অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে মাদক নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। কেবল সৎসাহসের অভাব।

এখানে একটি উদাহরণ টানতে পারি। আমাদের সরকার অশ্লীল পর্নোসাইট বন্ধ করতে পারে না। অথচ বিটিআরসির জন্য এটা মাত্র একদিনের কয়েক ঘণ্টার কাজ। মধ্যপ্রাচ্যের অনেকগুলো দেশে পর্নোসাইট ভিজিট করা যায় না, সরকারিভাবে সেগুলোকে অকেজো করে রাখা হয়েছে। কয়েক দিন আগে পত্রিকায় দেখলাম, বৃটেনও পর্নোসাইট বন্ধে খুব শিগগির কঠোর পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে। আমাদের সরকার কি এমন কাজ করতে পারে না? সরকার অবশ্যই পারে। তবুও সরকার কেন যেনো কিছুই করে না!

ড. আফিয়া সিদ্দিকি

যে নামটি বিস্মৃত হয়ে যাবে একদিন

প্রিয় উম্মে কুলসুম–

ড. আফিয়া সিদ্দিকিকে তোমার না চেনার কথা নয়। বাংলাদেশ তো বটেই, পুরো মুসলিমবিশ্বেই তিনি বেশ পরিচিত একটি নাম।

১৯৭২ সালে জন্ম নেয়া এই পিএইচডি ডিগ্রিধারী মুসলিম নারী বর্তমানে কারাবাস করছেন আমেরিকার একটি কারাগারে। ২০০৩ সালে তিনি পাকিস্তানের করাচি থেকে নিরুদ্দেশ হন এবং ২০০৮ সালে তিনি আফগানিস্তানের গজনিতে আফগান পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। মাঝের এই পাঁচ বছর তিনি কোথায় ছিলেন? তার সমর্থকরা বলেন, পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্স তাকে অপহরণ করে আমেরিকার হাতে তুলে দেয়। কিন্তু পশ্চিমারা বলছে, এই পাঁচ বছর তিনি ওসামা বিন লাদেনের একজন সহযোগী হয়ে আফগানিস্তানে কাজ করেন।

২০০৮ সালের ১৭ জুলাই গ্রেফতার হওয়া ড. আফিয়াকে আমেরিকার একটি আদালত ২০১০ সালে ৮৬ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

২০১৩ সালে আমেরিকার বিখ্যাত ম্যাগাজিন 'নিউজউইক'-এ সাংবাদিক জেনিন ডি জিওভান্নি তাকে নিয়ে অনুসন্ধানধর্মী একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। সেই প্রতিবেদনের ভাষান্তর তুলে ধরছি তোমার জন্য।

প্রিয় আঁখি–

জিওভান্নি লেখেন–

এখনকার যেটা 'ইসলামিক স্টেট', এই গ্রুপটিরই আগের নাম এবং পরিচিতি ছিলো ISIS বলে। আমেরিকান সাংবাদিক জেমস ফয়লেকে

হত্যা করার পর আইসিসযোদ্ধারা তার পরিবারের কাছে একটি ইমেইল বার্তা পাঠায়। যেখানে লেখা ছিলো- 'অনেক মুসলিম এখনো তোমাদের বন্দিশালায়।'

ইমেইল বার্তাটিতে একজন নারীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। তিনি ড. আফিয়া সিদ্দিকি। ফয়লের শিরশ্ছেদের দুই সপ্তাহ পর আইসিস স্টিভেন সটলোফ নামের আরেকজন আমেরিকান সাংবাদিককে অপহরণ করে। তবে তারা কোনো বন্দিবিনিময়ের প্রস্তাব দেয়নি বলে অনেকে ধারণা করেন। দুঃখজনক সত্য হলো, সটলোফেরও শিরশ্ছেদ করে হত্যা করা হয়।

এ সময় আফিয়া সিদ্দিকির নামটি গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ সাইটে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয় এবং তিনি বিনিময়ের বস্তু হিসেবে বিবেচিত হন। শুধু আইসিস নয়, তালেবানসহ অন্য আরও কয়েকটি জিহাদি গ্রুপ তার মুক্তির জন্য বন্দিবিনিময়ের প্রস্তাব দেয়। সুতরাং, বিষয়টি আমাদের জানা দরকার, কে এই আফিয়া সিদ্দিকি এবং কীভাবে তিনি আমেরিকার 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' আয়োজনের ঘেরাটোপে পড়ে গেলেন।

প্রিয় হানিফা–

সাংবাদিক জিওভান্নি আফিয়া সিদ্দিকির বিচার নিয়ে লেখেন–

আফিয়া সিদ্দিকি কিংবা 'লেডি আল-কায়েদা', এ নামেই তিনি 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' আয়োজকদের কাছে পরিচিত। ২০১০ সালে আমেরিকার ম্যানহাটন ফেডারেল কোর্ট তাকে হত্যাচেষ্টা মামলায় দোষী সাব্যস্ত করেন এবং ৮৬ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ২০০৮ সালে তাকে আফগানিস্তানে আমেরিকান সৈন্যদের হত্যাপ্রচেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় বলে আদালতে জানানো হয়।

এমআইটি ও ব্র্যান্ডিস ইউনিভার্সিটি থেকে উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্ত ৪২ বছর বয়সী এ নিউরোসায়েন্টিস্ট বর্তমানে তার ৮৬ বছর কারাদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার অপেক্ষায় আছেন। টেক্সাসের কার্সওয়েল কারাগারে বন্দি এ সায়েন্টিস্টকে বিশেষ মেডিকেল সাপোর্টের মাধ্যমে আটকে রাখা হয়েছে।

ড. আফিয়া সিদ্দিকির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, তিনি আল-কায়েদার একজন সমর্থক এবং ওসামা বিন লাদেনের হয়ে কাজ করতেন। আহমদ, মারিয়াম ও সুলায়মান নামের তিন সন্তানের জননী আফিয়া অবশ্য তার বিরুদ্ধে আনীত সব অভিযোগ অস্বীকার করেন। তার বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত দুটি অভিযোগের রায় ঘোষণা করা হয়েছে– অবৈধ অস্ত্র বহন এবং সশস্ত্র অবস্থায় আমেরিকান সৈন্যদের ওপর আক্রমণ করা।

মার্কিন সরকারের প্রসিকিউটর নিজের দাবির সত্যতার দোহাই দিয়ে প্রমাণ পেশ করেন, ২০০৮ সালের জুলাই মাসে আফগানিস্তানের গজনিতে আফিয়া সিদ্দিকিকে ইন্টারোগেশনের সময় তিনি এক সামরিক অফিসারের এম-৪ রাইফেল ছিনিয়ে নেন এবং এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শী তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে বলেন, তিনি সে সময় বলছিলেন, 'আমি তোদের সবাইকে খুন করবো হারামির বাচ্চা!' এবং 'আমেরিকার মরণ আসছে!'

অবশ্য ড. আফিয়ার পক্ষের আইনজীবী টিনা এম ফস্টার দাবি করেন, তারা তার বিরুদ্ধে কোনো ধরনের ফরেনসিক প্রমাণাদি পেশ করতে পারেননি। তিনি নিজের দাবির পক্ষে জোর দিয়ে বলেন, রাইফেলের গায়ে কোনো ধরনের ফিঙ্গারপ্রিন্টও পাওয়া যায়নি।

সরকারি প্রসিকিউটর তার স্টেটমেন্টে দাবি করেন, সৌভাগ্যক্রমে তার গুলিবর্ষণে কেউ আহত হননি। তবে তাকে নিবৃত করতে একজন অফিসার তার তলপেটে প্রচণ্ড রকম আঘাত করেন। এতে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে হেলিকপ্টারযোগে তাকে কাবুলের নিকটবর্তী বারগাম ইউএস এয়ারফিল্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে অবস্থার উন্নতি না হলে ২০০৮ সালের ৪ আগস্ট আফগান সরকারের অনুমোদনক্রমে তাকে যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়। এর এক মাসের মধ্যেই তার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ গঠন করা হয়।

প্রিয় মুনিয়া–

জিওভান্নি আরও লেখেন–

২০১০ সালে প্রথম তাকে ম্যানহাটন আদালতে বিচারের সম্মুখীন করা হয়। সেখানে তাকে দৃঢ় এবং যথেষ্ট মানবিক বলে বলীয়ান মনে হচ্ছিলো। তিনি এতোটাই স্পষ্টবাদী ছিলেন তখন, আদালতকক্ষে সবার সামনে কামনা করেন- বিচারকদের মধ্যে কোনো ইহুদি যেনো না থাকেন। তিনি বলেন, 'যদি ইসরাইলি বংশোদ্ভূত কোনো ইহুদি এখানে থাকে, তবে তারা অবশ্যই আমার প্রতি অবিচার করবে।' তিনি বিচারক রিচার্ড বারম্যানকে বলেন, 'আপনি যদি ন্যায্য বিচার কামনা করেন, তবে তাদের এখান থেকে বের হয়ে যেতে বলুন। এই রায় সরাসরি ইসরায়েল থেকে আসছে, আমেরিকা থেকে নয়। আমাকে সুযোগ দেয়া হলে আমি তা প্রমাণ করে দেখাতে পারবো।' অবশ্য তার এমন স্পষ্টবাদী বক্তব্যের কারণে রিচার্ড বারম্যান তাকে আদালতকক্ষ থেকে বের হয়ে যাওয়ার সুপারিশ করেন।

আদালত চলাকালীন একজন আর্মি ক্যাপ্টেন যখন তাকে দোষী বলে শনাক্ত করেন, তখন তিনি চিৎকার করে বলেন, 'এটা পুরোপুরি হাস্যকর। আপনি মিথ্যা বলছেন।'

তার আইনজীবীরা প্রমাণের অপ্রতুলতার বিষয়টি তুলে ধরে মামলাটির দুর্বলতা ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু বিচারক সেসব বিষয়ে তোয়াক্কা না করে তড়িঘড়ি করেই রায় দিয়ে দেন। ড. আফিয়ার আইনি লড়াইয়ে নিযুক্ত আইনজীবীদের একজন ইলেন শার্প বলেন, 'আমার মতে, এই রায় সম্পূর্ণ অন্যায় রায়। এখানে না আছে কোনো ফরেনসিক প্রমাণ আর সাক্ষীরাও সত্যপ্রকাশে একনিষ্ঠ নয়। তারা সাক্ষ্য দেয় ভয়ে, সত্যপ্রকাশের জন্য নয়।'

প্রিয় লুবনা–

বিশ্বব্যাপী ড. আফিয়ার পক্ষে জনমতের কথা বলতে গিয়ে জিওভান্নি লেখেন–

লর্ড আহমাদ, লর্ড শাইখ, লর্ড প্যাটেল এবং এমপি মোহাম্মদ সরওয়ার নামের চারজন বৃটিশ পার্লামেন্টারিয়ান এই বিচারকে

‘ন্যায়বিচারের গর্ভপাত’ বলে আখ্যায়িত করে সিদ্দিকির মুক্তি দাবি করেন। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার কাছে পাঠানো এক চিঠিতে তারা উল্লেখ করেন, যে রাইফেল দিয়ে আফিয়া সিদ্দিকি গুলি করেছিলেন, সত্য হলে সেই রাইফেলের সায়েন্টিফিক ও ফরেনসিক প্রমাণ পেশ করার। পাকিস্তানের বিখ্যাত ক্রিকেটার এবং বর্তমানে রাজনীতিবিদ ইমরান খানও তার মুক্তির জন্য র‍্যালি করেছেন। আমেরিকার একজন সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল সিদ্দিকির মামলাটির ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, ‘আমেরিকার অন্ধকার সাম্রাজ্যের আরেকটি বলি হলেন তিনি।’

‘ইরান টিভি’র বরাত দিয়ে একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ড. আফিয়া সিদ্দিকির বিষয়ে বন্দিবিনিময় করতে রাজি হয়েছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের কোনো অফিশিয়াল এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে রাজি হননি। ড. সিদ্দিকির বোন ড. ফওজিয়া, যিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিউরোলোজি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভ করেছেন, তিনি তার বোনের মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি জানান, তার ব্যাপারে তারা এখনো আশাবাদী। মামলা পরিচালনাকারী একজন আইনজীবীও এমনই আশা করেন। সিদ্দিকি মুক্ত হয়ে যদি কখনো পাকিস্তানে চলেও যান, তবু তার রহস্যকাহিনি হয়তো কখনোই সত্যের মুখোমুখি হবে না।

প্রিয় নাহিদা–

সাংবাদিক জিওভান্নি আফিয়া সিদ্দিকির পরিচয় দিতে গিয়ে লেখেন–

ড. আফিয়া সিদ্দিকির বেড়ে ওঠা করাচির এক উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারে। আরব সাগর ও পারস্য সাগরের তীরবর্তী এবং আফগান সীমান্তের কাছাকাছি এ শহরটি সবসময়ই ‘সন্ত্রাসবাদের’ কারণে পরিচিত। বোগেনভিলিয়া ফুলের ঝাড়ঘেরা এক ভিলায় তার শৈশব ও কৈশোর কেটেছে। বাবা ডাক্তার গুলশান ইকবাল ফিজিশিয়ান আর মা সাধারণ গৃহিণী। এখানেই ড. আফিয়া সিদ্দিকির বোন ফওজিয়ার সঙ্গে কথা হয় নিউজউইকের প্রতিবেদকের সঙ্গে। এ বাড়িতেই তিনি এখন বসবাস করেন আফিয়া সিদ্দিকির বড় ছেলে আহমাদ ও কন্যা

মারিয়ামকে নিয়ে। আফিয়ার ছোট ছেলে সুলায়মান, ধারণা করা হয় সে শহিদ হয়ে গেছে। ২০০৩ সালে ড. আফিয়া যখন পাকিস্তানি ইন্টেলিজেন্স দ্বারা অপহৃত হন, তখন সে হারিয়ে যায়। তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

দেয়ালে টাঙানো আছে এমআইটি থেকে ড. আফিয়া সিদ্দিকির হাস্যোজ্জ্বল গ্র্যাজুয়েশনের ছবি। একটি প্ল্যাকার্ডও টাঙানো আছে সেখানে। তাতে লেখা- 'লিঙ্কনের স্বপ্ন : সবার জন্য ন্যায়বিচার'। নিচে লেখা- 'তাহলে আফিয়া কেন পাবে না?'

ফওজিয়া তার বোনের স্মৃতিচারণা করে বলেন, 'সে জীবনে কখনো একটা পিঁপড়াকেও আঘাত করতো না। সে এতোটাই সংবেদনশীল ছিলো– কোনো প্রাণীর কষ্টও সহ্য করতে পারতো না। এসব দেখলে তার মুখ মলিন হয়ে যেতো। যদি তার পাশে কোথাও একটা বেলুনও ফুটতো, তবে সে চিৎকার করে উঠতো। এ কারণে আমার মা তাকে বেলুনের জায়গায় ফুটবল খেলতে দিতো।'

১৯৯০ সালে আফিয়ার শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ভাই মুহাম্মদ যখন আমেরিকার টেক্সাসে চলে যান, আফিয়াও হোস্টন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করার জন্য তার সঙ্গে যান। সেখান থেকে তিনি এমআইটিতে ভর্তি হন এবং পিএইচডির আগ পর্যন্ত এখানেই পড়াশোনা করেন। এরপর ব্র্যান্ডিস ইউনিভার্সিটিতে তিনি কগন্যাটিভ নিউরোসায়েন্সের ওপর পিএইচডি করেন। সেখানকার তার সহপাঠী এবং শিক্ষকরা তাকে একজন অধ্যয়নপ্রিয় ও মৃদুভাষী বলেই স্বীকার করেন।

আফিয়ার শিক্ষক ড. পল ডি জিও তার গ্রেফতারের পর বোস্টন ম্যাগাজিনকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমি এটা ভাবতেই পারি না যে এমন কিছু ঘটতে পারে। 'তাকে একজন গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি মনে হয়েছে সবসময়। এর ব্যত্যয় আমি দেখিনি কখনো।'

পিএইচডি সম্পন্ন করার পর ড. আফিয়া করাচিরই আরেক ডাক্তার মুহাম্মদ আমজাদ খানকে বিয়ে করেন, তিনিও বোস্টনে পড়াশোনা করেছেন। ডা. আমজাদের কর্মস্থল বোস্টন হাসপাতালের কাছে বিশতলার অ্যাপার্টমেন্টে এই দম্পতি তাদের দুই বাচ্চা নিয়ে বসবাস

করতেন। তার প্রতিবেশীরা তার ব্যাপারে কখনোই খারাপ কিছু দেখেনি। তিনি ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম গৃহিণী এবং একজন যত্নশীল মা। তাদের অ্যাপার্টমেন্টের পাশে অবস্থিত মসজিদের ইমাম আবদুল্লাহ ফারুক বলেন, 'সে ছিলো একজন পারফেক্ট আমেরিকান মেয়ে এবং বোনের মতো স্নেহশীল।'

আফিয়া সিদ্দিকি বসনিয়া যুদ্ধের সময় এবং পরে যুদ্ধাহতদের সাহায্য করার জন্য মুসলিম কমিউনিটিতে তহবিল সংগ্রহ করতেন। তার বোন বলেন, 'পৃথিবীর সব দরিদ্র লোকদের জন্যই তার ছিলো সীমাহীন দরদ। সে বৃদ্ধ মহিলাদের বাসস্থান, পাবলিক পার্ক এবং বসনিয়ার উদ্বাস্তুদের জন্য তহবিল সংগ্রহ করতো।'

প্রিয় সুরাইয়া–

যেভাবে ঘটনা হয়ে উঠলেন ড. আফিয়া সিদ্দিকি–

কিন্তু এখানে ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিয়ে যায়। ২০০১ সাল থেকে এফবিআই তাকে এবং তার স্বামীকে গোপনে গভীর পর্যবেক্ষণ করতে থাকে তাদের তহবিল সংগ্রহে সন্দেহজনক কিছু পাওয়ার আশায়। তারা তার ইন্টারনেট হিস্ট্রি চেক করে ১০,০০০ ডলারের ক্রয়-সম্বলিত কিছু তথ্য পায়। যেগুলো ব্যয় করা হয়েছিলো আর্মার জ্যাকেট, নাইট গগলস এবং মিলিটারি বই ক্রয় বাবদ। ফস্টারের মতে, আমজাদ খান এগুলো ক্রয় করেছিলেন পাকিস্তানে শিকার করার জন্য।

৯/১১-এর পর আমেরিকায় পাকিস্তানিদের বসবাস কঠিন হয়ে পড়লে এই দম্পতি করাচি চলে আসেন। এখানে তাদের তৃতীয় সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু এর কয়েক সপ্তাহ পর দুঃখজনকভাবে আফিয়া ও আমজাদ খানের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। পরবর্তী সময়ে ডা. খান দ্য গার্ডিয়ানকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আফিয়া দিন দিন র‍্যাডিক্যাল ইসলামে প্রভাবিত হচ্ছিলো এবং জিহাদের প্রতিও উদ্বুদ্ধ হচ্ছিলো।'

নিউজউইক প্রতিবেদক করাচিতে ডা. আমজাদ খানের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি একজন শ্মশ্রুধারী ধার্মিক ব্যক্তি এবং এখনো ডাক্তারি পেশায় আছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, তিনি মোটেও চরমপন্থী নন। তার সাবেক স্ত্রী তাকে জোর করে আমেরিকা থেকে আফগানিস্তানে

যাওয়ার ব্যাপারে জোর দিচ্ছিলেন, যেখানে ততোদিনে যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিলো। তিনি সেখানে যেতে অস্বীকৃতি জানালে তাদের মধ্যে মনোমালিন্য হয় এবং একপর্যায়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। তিনি মনে করেন, তার স্ত্রীর সঙ্গে আল-কায়েদা বা এ ধরনের জঙ্গি গোষ্ঠীর যোগাযোগ ছিলো।

আফিয়া সিদ্দিকির পরিবার এবং আইনি সহায়তা প্রদানকারী দল আমজাদ খানের এই অভিযোগকে উড়িয়ে দিয়ে তাকে প্রতিহিংসাপরায়ণ স্বামী বলে উল্লেখ করে। তারা বলে, সে তার সন্তানদের চায়। সুতরাং, সে যা ইচ্ছা তা-ই বলতে পারে।

প্রিয় কামরুন্নাহার–

যেভাবে নিরুদ্দেশ হন ড. আফিয়া সিদ্দিকি–

করাচিতে ফিরে আসার পর আফিয়া সিদ্দিকি তার সন্তানদের নিয়ে নিজের বাড়িতে মা ও বোনের সঙ্গে বসবাস করতে থাকেন। ২০০৩ সালের বসন্তে পরিবারের সঙ্গে আফিয়ার শেষ সাক্ষাৎ হয়। তিনি তার সাত বছর বয়সী বড় ছেলে, পাঁচ বছর বয়সী মেয়ে এবং ছয় মাস বয়সী কোলের শিশুকে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। বাড়িতে বলে যান, তিনি এক আত্মীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্লেনে ইসলামাবাদ যাচ্ছেন। কিন্তু তিনি ইসলামাবাদ না গিয়ে অন্য কোথাও পাড়ি জমান, যার হদিস আজ পর্যন্ত রহস্যাবৃত রয়ে গেছে।

তার সমর্থকরা বলেন, তার অন্তর্ধানের বিষয়টি সম্পৃক্ত পাকিস্তানি ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে। তারা আল-কায়েদা নেতা খালিদ শেখ মুহাম্মদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য তাকে অপহরণ করে, যাকে ২০০৩ সালের ১ মার্চ গ্রেফতার করা হয়েছিলো।

খালিদ শেখ মুহাম্মদের জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়টি এখন পর্যন্ত গোপন রাখা হয়েছে। তবে দ্য গার্ডিয়ান পরবর্তী সময়ে এক রিপোর্টে দাবি করে, খালিদ শেখ সিআইএর ওয়াটারবোর্ডিং নামের নির্মম নির্যাতনের সময় আফিয়া সিদ্দিকির নাম বলেন। অবশ্য ফস্টার এটাকে অস্বীকার করেছেন।

ফওজিয়া তার বোনের অন্তর্ধানের বিষয়টি বলতে গিয়ে বেদনাহত হন। তিনি বলেন, 'আফিয়া এয়ারপোর্টে যাবার জন্য বাড়ি থেকে তার তিন সন্তানকে নিয়ে বের হয়। কিন্তু পথিমধ্যে দুজন মোটরসাইকেল আরোহী তাকে থামিয়ে বলে, তোমার মা অসুস্থ, এখনই বাড়ি যেতে হবে। এই বলে তারা তাকে তুলে নেয়।'

এই শেষ! এরপর ২০০৮ সাল পর্যন্ত তার আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। তার সমর্থকরা মনে করেন, আইএসআই আমেরিকাকে তুষ্ট করতে আফিয়াকে তাদের হাতে তুলে দেয়। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে আইএসআইয়ের অনেক গোপন কারাগার এবং সেফহাউস রয়েছে, যার কোনো একটায় তাকে এই পাঁচ বছর বন্দি করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং নির্যাতন করা হয়। এরপর তুলে দেয়া হয় ওয়াশিংটনের হাতে। তখনই ড. আফিয়ার খবর মিডিয়ায় প্রচারিত হয়।

প্রিয় ইয়াসমিন–

জিওভান্নি লেখেন–

আফিয়ার পরিবার তখন আইনজীবী ফস্টারকে আফিয়ার মামলাটি গ্রহণ করতে অনুরোধ করে। ফস্টার সেই লোক, যিনি বাগরাম কারাগারে বন্দি আরও অনেক কয়েদির মামলা লড়ছেন এবং তিনি জানেন যে কীভাবে আইএসআই কাজ করে। কয়েকজন রিপোর্টার অভিযোগ করেন, আফিয়া সিদ্দিকির মূল আইনজীবীকে বাদ দেয়া হয়েছিলো, কারণ তিনি ইহুদি ছিলেন। কিন্তু ফস্টার বলেন, তিনি পাকিস্তান সরকারের পেইড আইনজীবী ছিলেন। ফস্টার আরও বলেন, তার মক্কেলকে ২০০৩ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত কয়েকটি সেফহাউসে আবদ্ধ রাখা হয় এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরের সময় তাকে ড্রাগ দিয়ে অচেতন করে রাখা হতো।

২০০৮ সালের ১৭ জুলাই আফিয়াকে গজনি থেকে গ্রেফতার করা হয়। এটাই দেখানো হয় যে, তিনি ২০০৮ সালের ১৭ জুলাই আফগান পুলিশের হাতে ধরা পড়েন, যখন তিনি হাতে বহন করছিলেন বিপজ্জনক বোমা এবং নিউ ইয়র্ক ল্যান্ডমার্কের একটি তালিকা, যেখানে 'সোডিয়াম সায়ানাইডে'র মতো বিধ্বংসী কেমিক্যালের নাম লেখা ছিলো।

এফবিআই এজেন্ট যখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে আসে, তখন তিনি একটি হলুদ রুমালে আবৃত ছিলেন। সেখানে উপস্থিত ক্যাপ্টেন রবার্ট স্নাইডার পরে বলেন, 'তিনি একজন অফিসারের রাইফেল ছিনিয়ে নেন এবং এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়তে শুরু করেন।'

তার আইনজীবী ফস্টার বলেন, তিনি একজন আমেরিকান অফিসারের রাইফেল নিয়ে গুলি শুরু করলেন, অথচ কেউ আহত বা নিহত হলো না, এটা খুবই আশ্চর্যজনক। তাকে কেনইবা গজনি থেকে বাগরাম নিয়ে আসা হলো এবং সেখান থেকে সোজা আমেরিকা! অবশ্যই রহস্যময়!

ইউএস গভর্নমেন্ট এবং প্রসিকিউটররা অবশ্য ভিন্ন এক কাহিনি শুনিয়েছেন। তারা বলেন, ড. আফিয়া ২০০৩ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত 'হারানো বছর'গুলোতে আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেনের পক্ষে বিভিন্ন হামলার পরিকল্পনা করতেন। ২০০৪ সালে ইউএস অ্যাটর্নি জেনারেল জন অ্যাশক্রফট তার নাম আল-কায়েদার মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকাভুক্ত করেন। তার ব্যাপারে লেখা হয়- 'সশস্ত্র এবং বিপজ্জনক।'

প্রিয় সোনিয়া–

ড. আফিয়ার রহস্যময় বিয়ে নিয়ে জিওভান্নি লেখেন–

ড. আফিয়া সিদ্দিকির দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে কথা রয়েই গেছে। তিনি কি খালিদ শেখ মুহাম্মদকে বিয়ে করেছিলেন, যিনি বর্তমানে গুয়েনতানামো বে কারাগারে বন্দি আছেন? দ্য গার্ডিয়ানের ভাষ্য অনুযায়ী, তার ডিভোর্সের ৬ মাস পর তিনি খালিদ শেখ মুহাম্মদের ভাগনে আম্মান আল বালুচিকে বিয়ে করেন। দ্য গার্ডিয়ান আরও অভিযোগ করে, এই বিয়ে আইএসআই এবং ইউএস গোয়েন্দা সংস্থা অ্যারেঞ্জ করেছিলো। অবশ্য তার পরিবার ও সমর্থকরা তার দ্বিতীয় বিয়ের কথা অস্বীকার করেন।

প্রিয় ঝর্ণা–

তার জনপ্রিয়তার বিষয়ে সাংবাদিক জিওভান্নি লেখেন–

তার বিচারের রায় হওয়ার পর তিনি একজন আইকনে পরিণত হয়ে গেছেন। বৃটিশ অ্যাক্টিভিস্ট ইভন রাইডলি, সাবেক এই সাংবাদিক

আফগানযুদ্ধে তালেবানের হাতে বন্দি হন এবং পরবর্তী সময়ে ইসলামে দীক্ষিত হন, তিনি সিদ্দিকির কেসটি হ্যান্ডল করছেন। রাইডলি দ্য গার্ডিয়ানকে বলেন, মানুষ আসলে আমেরিকার প্রতি চরমভাবে ক্ষুব্ধ। এখন তারা আমেরিকার বিরুদ্ধবাদী যে কাউকেই তাদের আইকন ভাববে এবং এটাই সত্য।

ম্যারিল্যান্ডভিত্তিক 'থ্রো জাস্টিস ফাউন্ডেশন'-এর সদস্য মাওরি সালা খানকে প্রশ্ন করা হলো, তিনি যদি সত্যিকার অর্থেই নির্দোষ হয়ে থাকেন, তাহলে বিশ্বের চরমপন্থী দলগুলো কেন তার মুক্তি দাবি করছে? তিনি বলেন, এটা খুবই সহজ একটা উত্তর। তিনি অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীর কাছে একজন সিম্বলে পরিণত হয়েছেন এবং মুসলিম হওয়ার কারণে মুসলিমদের কাছে তিনি অবশ্যই হিরো হিসেবে গণ্য হবেন। কেবল মুসলিমরাই নন, আমেরিকার সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেলও তার মুক্তি দাবি করেছেন। আর আইসিস তার মুক্তি দাবি করেছে, কারণ তারা জানে পাকিস্তানে তিনি কতোটা জনপ্রিয়।

প্রিয় জেসমিন–

জিওভান্নি লেখেন–

ওবামা প্রশাসন এই মুক্তিপণের ব্যাপারটি নাকচ করে দিয়েছে। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র কেইটলিন হাইডেন ব্যাপারটি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, 'আফিয়া সিদ্দিকি বিভিন্ন মামলায় ৮৬ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। ইউনাইটেড স্টেটস গভর্নমেন্ট তার ব্যাপারে কোনো ধরনের বন্দিবিনিময়ে রাজি নয়।'

অবশ্য আফিয়ার বোন ফওজিয়া ক্ষুব্ধ মতামত ব্যক্ত করেন এ ব্যাপারে। তিনি বলেন, 'অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং অদ্ভুত ব্যাপার। তারা বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলছে। তারা তখন কোথায় ছিলো, যখন আমার বোন নিরুদ্দেশ ছিলো? তারা আমার বোনের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা যুক্ত করে বিষয়টিকে আরও ঘোলাটে করছে।'

প্রিয় শবনম–

নিউজউইক-এর সাংবাদিক জেনিন জিওভান্নি তার প্রতিবেদনের উপসংহার টেনে বলেন–

জেলখানায় কেমন কাটছে ড. আফিয়া সিদ্দিকির দিনকাল? এ ব্যাপারে তার আইনজীবী ফস্টার জানান, তিনি দিনের ২৩ ঘণ্টাই বন্দি অবস্থায় কাটান। তার পরিবারের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের কোনো সুযোগ তার নেই। অন্য বন্দিদের দ্বারাও তিনি অনেক সময় আক্রান্ত হন। শারীরিকভাবে তিনি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছেন। একদম ছোট একটা ইঁদুরের মতো। তাকে রাখা হয়েছে কয়েকজন জঘন্য চরিত্রের মহিলার সঙ্গে।

২০১৩ সালের ১ ডিসেম্বরের পর থেকে তার পরিবারের কেউ তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি। শেষ যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন তারা মামলার রায়ের ব্যাপারে আপিল করার কথা বলেন তাকে। তিনি তখন শুধু বলেছিলেন, 'তোমরা কি ভাবো তাতে কোনো পরিবর্তন আসবে?'

প্রিয় নিপা–

[পাদটীকা : কুরআনের হাফেজা ড. আফিয়া সিদ্দিকির মৃত্যু নিয়ে কিছুদিন আগে একটি ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়। কিছু কিছু সংবাদমাধ্যম দাবি করে– আফিয়া সিদ্দিকি মারা গেছেন। তবে কোনো নির্ভরযোগ্য সংবাদ সংস্থা এ তথ্যের সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। তার মৃত্যু নিয়ে আমেরিকান কোনো সরকারি সংস্থাও কোনো দায় স্বীকার করেনি। একমাত্র আল্লাহ ভালো জানেন– তিনি বেঁচে আছেন নাকি মারা গেছেন।]

নাজনীন আক্তার হ্যাপী

ক্যামেরার ঝলসানো অন্ধকার থেকে আলোকিত আঁধারের পৃথিবীতে

প্রিয় আমিনা–

আজ তোমাকে শোনাবো অন্য রকম এক গল্প। যদিও বাস্তব কাহিনি, আমাদের বাংলাদেশেরই এক তরুণীর জীবনকাহিনি, তবু সে কাহিনি যেনো গল্পের মতোই। গল্পকেও হার মানায় তার জীবনের পরিবর্তিত রূপ। কীভাবে আল্লাহর হেদায়েত মানুষের হৃদয়কে অকস্মাৎ আলোকিত করে, তার বাস্তব উদাহরণই এবার তোমার সামনে তুলে ধরছি।

১৩ ডিসেম্বর ২০১৪।

দুপুরে একটি বড়সড় বোমা ফাটালো বাংলাদেশের অনলাইন সংবাদমাধ্যমগুলো। বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের অন্যতম পেস বোলার রুবেল হোসেনের বিরুদ্ধে ঢাকার মিরপুর থানায় মামলা করলেন অখ্যাত এক মডেল ও অভিনেত্রী– হ্যাপী। নাজনীন আক্তার হ্যাপী।

মামলায় অভিযোগ করা হয়, জাতীয় দলের ক্রিকেটার রুবেল হোসেন বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে একাধিকবার হ্যাপীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং এ-সংক্রান্ত আরও কিছু গুরুতর অভিযোগ। তিনি জানান, রুবেলের সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক ছিলো। রুবেল তাকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে তার সঙ্গে শারীরিক

সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং একপর্যায়ে রুবেলকে বিয়ের ব্যাপারে চাপ দিলে তিনি বিয়ে করতে অস্বীকার করেন। নিজেকে প্রতারিত ভেবে হ্যাপী আইনের আশ্রয় নিয়েছেন বলে পুলিশ এবং মিডিয়ার সামনে বিষয়টি তুলে ধরেন।

প্রিয় সাবরিনা–

তোমার মনে থাকার কথা, পেসার রুবেল তখন বাংলাদেশের নতুন বোলিং সেনসেশান। কিছুদিন আগেই নিউজিল্যান্ড এবং আরও কয়েকটি দেশের বিপক্ষে মাঠে নেমে তিনি তার পেস অ্যাটাকের নৈপুণ্য দেখান। ধরাশায়ী করেন বিপক্ষ দলের বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানকে এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ জিততে মাঠে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশ জাতীয় দলের জন্য তিনি তখন অপরিহার্য পেসার। সামনেই আসছে ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০১৫। বিশ্বকাপ স্কোয়াডে তার অন্তর্ভুক্তি চূড়ান্তপ্রায়। সারাদেশের ক্রিকেটপ্রেমী মানুষ পেশিবহুল ড্যাশিং এই পেসারকে তাদের ক্রিকেটীয় ভালোবাসায় নতুন করে স্থান দিতে শুরু করেছে। দেশের তরুণ-তরুণীদের কাছে রুবেল নতুন ক্রিকেট সেনসেশান।

ঠিক এ সময় নাজনীন আক্তার হ্যাপী নামের অখ্যাত এক সুন্দরী মডেল যখন তার বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ করেন, তখন মিডিয়া স্বাভাবিকভাবেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে। পরদিন বাংলাদেশের সবগুলো নিউজপেপার, টিভি চ্যানেল এবং বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় রুবেল-হ্যাপী বিষয়ে আলোচনার ঝড় বয়ে যায়। চলতে থাকে রুবেল-হ্যাপীর ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে রগরগে অরুচিকর আলোচনা।

বিষয়টি কেবল মিডিয়া আর সোশ্যাল মিডিয়াতেই সীমাবদ্ধ না থেকে পরিণত হয় টক অব দ্য কান্ট্রিতে। দুদলে ভাগ হয়ে যায় বাংলাদেশের মানুষ। একদল বলতে থাকেন– রুবেলের মতো একজন উঠতি পেসারের ক্যারিয়ার নষ্ট করতেই হ্যাপী নামের এই মডেল এমন কাণ্ড করেছেন, এতে রুবেলের কিছুই হবে না। নিজেকে লাইমলাইটে আনতেই এই মডেল এমন হীন পদক্ষেপ নিয়েছেন। অপর দল হ্যাপীর প্রতি সহমর্মিতা পোষণ করে মন্তব্য করেন– রুবেল নিজের তারকা ইমেজ ব্যবহার করে একটি মেয়ের জীবন এভাবে নষ্ট করতে পারেন না।

এর সঠিক তদন্ত ও সে অনুযায়ী বিচার হওয়া জরুরি। হ্যাপী রুবেলের প্রতারণার শিকার হয়েছেন।

প্রিয় অহনা–

যা-ই হোক, এরপর যমুনা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। কয়েক মাসেই রুবেল-হ্যাপী বিষয়টি ধীরে ধীরে থিতিয়ে আসে। অনেক ঘটনার পরও রুবেল যথারীতি তার ক্রিকেট ক্যারিয়ারকে আরও চৌকস করতে সমর্থ হন। বিশ্বকাপ এবং পরবর্তী কয়েকটি হোম ম্যাচে তিনি বল হাতে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। হ্যাপীও বসে থাকেননি। তিনি রুবেলকে একদিকে সরিয়ে নতুন করে মডেলিং ও অভিনয়ে জড়িয়ে পড়েন। বিনোদন-জগতে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার স্বপ্নে দর্শকদের সামনে খোলামেলাভাবে নিজেকে প্রদর্শন করতে শুরু করেন। সাধারণ মানুষ হ্যাপীর এহেন কর্মকাণ্ডে যারপরনাই নাখোশ হন।

প্রিয় অনন্যা–

এবার আমরা কথা বলবো সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক নিয়ে।

হ্যাপী-রুবেলের বিষয়টি এখন আর মানুষকে ততোটা আকর্ষণ করে না। দুজন নিজেদের মতো দুই মেরুতে বসবাস করছেন। রুবেল তার ক্রিকেট ক্যারিয়ার নিয়ে ব্যস্ত। হ্যাপীও হয়তো ব্যস্ত তার মডেলিং নিয়ে।

এরই মাঝে ২০১৫ সালের ২০ আগস্ট নাজনীন আক্তার হ্যাপী আবার নতুন করে আলোচনায় আসেন। তবে এবার নেগেটিভ কোনো খবর নিয়ে নয়, অন্য রকম একটি ঘোষণা দিয়ে, যা কেউ কোনোদিন হয়তো কল্পনাও করতে পারেনি, তিনি তেমনই একটি ঘোষণা দেন তার ফেসবুকের স্ট্যাটাসে।

তোমার পাঠের সুবিধার্থে আমি ফেসবুক থেকে নাজনীন আক্তার হ্যাপীর সেই ঘোষণা এবং তৎ-পরবর্তী তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও অনুভূতির কিছু অংশ এখানে তুলে ধরবো, যা তিনি গত কিছুদিন ধরে তার ফেসবুক ওয়ালের মাধ্যমে দেশবাসীকে জানিয়েছেন। এতে করে তুমি বুঝতে সক্ষম হবে আল্লাহ তাআলার হেদায়েতের ক্যারিশমা ও তাঁর অলৌকিক শক্তির বর্ণচ্ছটা কীভাবে মানুষকে একজন সত্যিকারের আলোকিত মানুষে পরিণত করে।

প্রিয় রেণু–

নাজনীন আক্তার হ্যাপীর ফেসবুক স্ট্যাটাসগুলো সম্পাদনার সময় সামান্য সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত করা হয়েছে মাত্র। তার বক্তব্যের মূলভাব প্রকাশ করার জন্য তার কিছু স্ট্যাটাসের শুধু সে অংশগুলোই পত্রস্থ করা হয়েছে, যেটুকু পাঠমাত্র হ্যাপীর হেদায়েতের পথে আসার পরিবর্তনগুলো তুমি বুঝতে পারবে। তবে তার বক্তব্যে কোনো ধরনের সংযোজন-বিয়োজন করা হয়নি, হুবহু তুলে ধরা হয়েছে।

প্রিয় মালা–

হ্যাপী লিখেছেন–

[আসসালামু আলাইকুম। আমি আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছি আরও বেশ কিছুদিন আগে। আমি চলচ্চিত্র, মিডিয়া ওই সকল রঙিন দুনিয়া থেকে একেবারের জন্য বিদায় নিয়েছি। জীবনটাকেই বদলে ফেলেছি এবং আল্লাহর কাছে তওবা করে এখন শুধু নামাজ আর ভালো মানুষ হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় দিন কাটাচ্ছি। এর মধ্যে অদ্ভুত এক শান্তি, যে শান্তি দুনিয়ার সব সম্পদ নিজের থাকলেও সম্ভব নয়।

আমাদের প্রত্যেকের এটাই চিন্তা করা উচিত যে, দুনিয়া খুব কম সময়ের। এই সময়টা শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য, আর কোনো কিছুর জন্য নয়। আমরা যদি সবাই একবার চিন্তা করি– দুনিয়া কী? কিসের জন্য? মৃত্যুর পর কী হবে? তাহলে আমরা সব উত্তর পেয়ে যাবো।

আমি খুব ভাগ্যবতী যে, আমি নিজের ভুল বুঝে এখন শুধু আল্লাহর ভালোবাসায় মগ্ন। দুনিয়ার কোনো শক্তি নেই আমাকে অসৎপথে নিয়ে যাওয়ার বা আল্লাহর পথ থেকে সরানোর। আমার সাথে যে বা যারা অন্যায় করেছে আমি সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আর চাই আল্লাহ তাদের সঠিক পথে আসার তওফিক দান করুক এবং তাদের ক্ষমা করুক।

বিশ্বাস করুন, ইসলামের পথে চলা আর ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করার মধ্যে বেহেশতের যে সুখ, তা আপনি আর কোনোভাবে অনুভব করতে পারবেন না। দুনিয়াতে যে যতো বেশি কষ্টে থাকে সে ততো

ভাগ্যবান/ভাগ্যবতী। কারণ আল্লাহ তার যে বান্দাদের বেশি ভালোবাসেন তাদেরকে দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করেন। আর এই পরীক্ষায় পাস করতে পারলে আল্লাহ তার জন্য আখেরাতে অনেক বড় পুরস্কারের ব্যবস্থা করবেন। যে মানুষ অন্য একজন মানুষকে নিয়ে হাসি-তামাশা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অপমান করে তাদেরকে আল্লাহ দুনিয়াতে আরও সুযোগ দেন এবং মৃত্যুর পর তাদের কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

আমি বেপর্দা চলতাম, ইসলাম মেনে চলতাম না, রঙিন দুনিয়ায় চলতাম। আমি যদি আল্লাহকে ভয় করে ও আল্লাহকে ভালোবেসে ইসলামের পথে আসতে পারি তাহলে আপনি/আপনারা কেন পারবেন না? আল্লাহ সবসময় অপেক্ষা করেন তার বান্দা কখন তার কাছে ক্ষমা চায় এবং আল্লাহর দেখানো পথে চলে! আমি আল্লাহকে ভালোবেসে যে সুখ পাচ্ছি যা জীবনে আর কখনো পাইনি।

সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আমি যেনো আমার ঈমান ঠিক রেখে বাকি জীবন আল্লাহর দেখানো পথ অনুসরণ করে চলতে পারি। মানুষ চাইলেই বদলাতে পারে আর আল্লাহর পথে চলতে চাইলে তিনি নিজে পথ দেখিয়ে দেন।

এই মুহূর্তে যদি মারা যাই তাহলে আল্লাহর কাছে কিভাবে পাপের জবাবদিহি করবো? দুনিয়া থেকে পরকালের জন্য কী নিয়ে যাবো? এসব একবার ভাবুন, তাহলেই একজন ভালো ও পবিত্র মানুষ হতে পারবেন। আমিন।]

২০ আগস্ট ২০১৫, রাত ১০:১২

প্রিয় মুবাশশিরা–

তুমি হয়তো 'সেই' হ্যাপীর এমন সত্য জবানবন্দি শুনে যারপরনাই বিস্মিত হয়েছো। বিস্মিত হওয়ারই কথা! কেননা যে মেয়েটি মাত্র কয়েক মাস আগেই তার সঙ্গে একজন ক্রিকেটারের অবৈধ সম্পর্কের কথা দেশবাসীর সামনে অকপটে লজ্জাহীন হয়ে বলেছিলেন, যিনি তার সতীত্বের পরীক্ষা দিতে ডিএনএ টেস্ট করিয়েছিলেন, যিনি তার সঙ্গে ওই ক্রিকেটারের একান্ত ফোনালাপ অনলাইনে অবমুক্ত করে দিয়েছিলেন– সেই মেয়েটির মুখেই এমন কথা! বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। কিন্তু

আল্লাহর যদি ইচ্ছা হয় কাউকে হেদায়েত দান করার, তাহলে পৃথিবীর সবচেয়ে পাপী বান্দাকেও তিনি হেদায়েতের আলোকবিভায় স্নাত করতে পারেন। এ কারণেই মূর্তিপূজক আজরের ঔরসে জন্ম নিতে পারেন ইবরাহিম (আ.), মক্কার পাপিষ্ঠ উমর হতে পারেন আশআরায়ে মুবাশশারার একজন।

কীভাবে নাজনীন আক্তার হ্যাপী পঙ্কিলতার কুৎসিত রঙিন দুনিয়া ছেড়ে ইসলামের আলোকিত রাজপথে এলেন, তা আমরা জানতে পারবো তার লেখা পরবর্তী একটা স্ট্যাটাস থেকে।

চলো, তোমাকে শোনাই সে কাহিনি।

[আজকে প্রথমবার তাবলিগে গিয়েছিলাম মুফতি উসামা ইসলাম ভাই-এর বাসায়। পরিবেশটাই আলাদা ছিলো। সেখানে অনেক অনেক মানুষ, যারা শুধু আল্লাহকে ভালোবেসে আল্লাহর পথে চলার সুবিধার্থে ইসলামের আলোচনায় শামিল হয়। সেই সাথে সেখানে যারা ছিলো সবার মন নিশ্চয় আল্লাহর নুরে আলোকিত। এমন একটি জায়গা হাজারো সুন্দর জায়গা থেকে অনেক বেশি সুন্দর ও পবিত্র। কারণ সেখানে সবার ধ্যানে শুধু মহান আল্লাহ।

সেখান থেকে আসতে ইচ্ছা করছিলো না। মনে হচ্ছিলো সারা রাত বসে কোরআনের ব্যাখ্যা আর হাদিস শুনি, আর সবার সাথে আল্লাহকে প্রাণভরে ডাকি।

উসামা ভাই চমৎকার বয়ান করেন। যার কারণে কথাগুলো মনে নাড়া দিতে বাধ্য এবং তিনি অসম্ভব ভালো একজন মানুষ। ইসলামের পথে চলার আশায় এমন একটি পরিবেশে যেতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত।

আমাদের সবারই উচিত আল্লাহর কথা মেনে চলা ও তার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা। যে পারে সে পরকালের জান্নাতবাসী নিঃসন্দেহে! সুবহানআল্লাহ!

আমরা সবসময়ই পবিত্র আর সুন্দর থাকতে পারি, শুধু চিন্তা-ভাবনায় যদি আল্লাহকে খুশি করার উদ্দেশ্য থাকে। কী হবে পরনিন্দা, মিথ্যা, অন্যায়, হিংসা-অহংকারের মধ্যে থেকে? তার বিপরীতে যদি

নামাজ, রোজা, আখলাক, পরোপকারিতা, কোরআন পাঠ ও নবিদের দেখানো পথে চলি তাহলেই জীবন সুন্দর, ইহকাল ও পরকাল উভয় সময়ের জন্য।]

২৯ আগস্ট ২০১৬, রাত ৯:১৪

প্রিয় হাদিয়া–

এ লেখা থেকে তুমি জানতে পারলে, নাজনীন আক্তার হ্যাপী তাবলিগের সংস্পর্শে এসে তার জীবনকে আমূল বদলে নেয়ার প্রেরণা পান। নিজেকে শুধরে নেয়ার আশায় বুক বাঁধেন। এরই প্রতিফল আমরা দেখতে পাই তার পরবর্তী কর্মকাণ্ডে। হ্যাপী তার ফেসবুক ওয়ালে এ পর্যন্ত যতো ছবি আপলোড করেছিলেন, তিনি পূর্বেকার সে সমস্ত ছবি মুছে ফেলেন। তার বদলে তিনি কভারফটো এবং প্রোফাইল পিকচার হিসেবে কুরআনের দুটো ছবি সংযুক্ত করেন।

হ্যাপীর এই বদলে যাওয়া ক্ষণিকের মোহ বা কিছু সময়ের ভালো লাগা নয়। পরবর্তী সময়ে তিনি যে লেখাগুলো লিখেছেন, তার সে কথাগুলোর মধ্যে যথেষ্ট ম্যাচুউরিটি লক্ষ করা যায়। ধর্ম সম্পর্কে তিনি যে বেশ ভালোভাবেই অধ্যয়ন করছেন এবং দাওয়াতি কাজের প্রভাব যে তার ভেতরে প্রস্ফুটিত হচ্ছে- সেটা খুব ভালোভাবে অনুধাবন করা যায়।

[মানুষ হয়ে জন্মে যদি মানুষই হতে না পারলাম তাহলে পরের জন্মে (মৃত্যুর পর) কিভাবে কিয়ামতের ময়দানে দাঁড়াবো? সেখানে তো মানুষের বিচার হবে! কোন মানুষ হয়ে নিজের কর্মের জবাবদিহি করবো? মানুষ (যে প্রকৃত অর্থেই মানুষ) নাকি মানুষ (যে শুধু দেখতেই মানুষ কিন্তু মনুষ্যত্ব নেই)?

আমরা এমনই মানুষ যে, সাবলীলভাবেই আমরা সেই মানুষের (যে মানুষ তাকে ভালোবাসে, সম্মান করে এবং গুরুত্ব দেয়) মনে আঘাত করতে পারি, কাঁদাতে পারি, গালি দিতে পারি কিন্তু মন থেকে ভালোবাসতে পারি না, সম্মান করতে পারি না, গুরুত্ব দিতে পারি না বা ইচ্ছাকৃতভাবেই করি না। একবারও কি চিন্তা করি যে, আমাদের কাছে এইরকম তুচ্ছ বিষয়টা আল্লাহ কতো বড়ভাবে বিচার করবেন?...

একজন মায়ের সামনে যদি তার সন্তানকে কেউ কষ্ট দেয় তাহলে সেই মা অনেক কষ্ট পায়। তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট পায় আল্লাহ, যখন তার কোনো বান্দাকে কেউ কষ্ট দেয়! এটা আল্লাহ সহ্য করতে পারেন না। যেমন আল্লাহ আমাদের ভালোবেসে তার কাজের জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন কিন্তু আমরা সেই সৃষ্টিকর্তাকেই ভুলে বসে আছি! তাকে আমরা ভালোবাসতে পারি না।...

...আমরা কিছু সময়ের জন্য দুনিয়ার অতিথি হয়ে এসে এই দুনিয়ার জীবন নিয়েই মরিয়া হয়ে উঠেছি। এমন করি যেনো আমাদের এই দুনিয়ার জীবনই সবকিছু! কে কার উপরে উঠবো, কে কাকে ঠকাবো, কয়টা বাড়ি-গাড়ি করবো, মানুষকে কিভাবে কষ্ট দেবো– শুধু এসবই ভাবি! এটা ভাবি না যে, আল্লাহর জন্য কী করব? কী করার জন্য দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন? কী করলে তিনি খুশি হবেন? নবি-রাসুলগণ কোন পথে চলেছেন?

এই দুনিয়া কিছুই না। এই দুনিয়ার কথা যতো ভাববো ততো পরকালের জীবন কঠিন হয়ে যাবে। এই দুনিয়া খুব কম সময়ের জন্য। আর এটা ভুলে গেলে সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাবে, আল্লাহর কাছে কোনো প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবো না। সব অন্ধকার হয়ে যাবে।

আল্লাহর পথেই সব সমাধান। চোখের সামনে এই দুনিয়ার সামান্য চকচক করা সুখের পেছনে না ছুটে পরকালের কথা ভাবি আর মানুষ হওয়ার চেষ্টা করি, এতেই মুক্তি। কাউকে কষ্ট না দেই। আসুন সবাইকে ভালোবাসি, আল্লাহকে খুশি রাখি। আমিন!]

২ সেপ্টেম্বর ২০১৬, রাত ৯:৩০

প্রিয় জ্যোৎস্না–

সেপ্টেম্বরের ২ তারিখে দেশের বহুল প্রচারিত দৈনিক 'বাংলাদেশ প্রতিদিন'-এ নাজনীন আক্তার হ্যাপীর একটি সাক্ষাৎকার ছাপা হয়। সে সাক্ষাৎকারেও হ্যাপী অকপটে এবং সাহসিকতার সঙ্গে তার ইসলামের পথে জীবন পরিচালনার বিষয়টি খোলাখুলিভাবে বলেন। ইসলাম নিয়ে তার অনুভূতি এবং ভালো লাগার কথা ব্যক্ত করেন। তোমার জন্য পুরো সাক্ষাৎকারটি এখানে পত্রস্থ করে দিলাম।

['কে কী বললো সেটা নিয়ে এখন আর মাথা ঘামাই না। অতীতকে ভুলে গিয়ে নতুনভাবে পথচলা শুরু করেছি। আর এই পথ হলো ইসলামের পথ। যে পথে সবাইকে একদিন আসতে হবে। আমি না হয় একটু আগেই চলে এলাম। ভাগ্যবতী বলেই এই বয়সে ইসলামের স্বাদ পেয়ে গেলাম।'

'বাংলাদেশ প্রতিদিন'-এর সঙ্গে একান্ত আলাপকালে এমনটাই বললেন সাম্প্রতিককালের বেশ আলোচিত ও অতি উচ্চারিত নাম নাজনীন আক্তার হ্যাপী।

বেশ কিছুদিন আলোচনার বাইরে ছিলেন হ্যাপী। গত সপ্তাহ থেকে ফের ভাইরালে পরিণত হয়েছে তার কয়েকটি ফেসবুক স্ট্যাটাস। এমনকি এসব ঘিরে বেশ কয়েকটি অনলাইন পোর্টালে খবরের শিরোনাম হন এই অভিনেত্রী। মূলত মিডিয়া-জগৎ থেকে ফিরে এসে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করায় অনেকের মনেই নানা প্রশ্ন জেগেছে। কেউ কেউ এটাকে হ্যাপীর স্ট্যান্টবাজি বা ভেল্কিবাজি বলে আখ্যা দিচ্ছেন। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই হ্যাপীর সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করা হয়।

এটা হ্যাপীর নতুন কোনো স্ট্যান্টবাজি কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'দেখুন সবার জীবনেই কিছু ব্যক্তিগত বিষয় রয়েছে। এটাও আমার সেই বিষয়ের অংশ। যেহেতু প্রশ্ন উঠেছে তাই সবাইকে বলতে চাই- এটা কোনো ভেল্কিবাজি নয়। মুসলমান হিসেবে যে দায়িত্ব রয়েছে তা পালন করছি। আদায় করছি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। এক নামাজের পর পরবর্তী নামাজের আজানের জন্য অপেক্ষা করি। এছাড়া তিলাওয়াত করি কুরআন। অথচ এইগুলো নিয়েও কটাক্ষ করা হচ্ছে। আমার সঙ্গে কথা না বলেই অনেকে উল্টাপাল্টা নিউজ করছে। তাদের কাছে অনুরোধ– অন্তত আমার সঙ্গে কথা বলে মন্তব্য শুনে খবর প্রকাশ করুক। অন্তত এই অনুরোধটা তাদের রাখা উচিত।'

আমরা কি তাহলে সেই আগের হ্যাপীকে পাবো না? এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি তো সেই আগের মানুষটিই রয়ে গেছি। পরিবর্তন শুধু হয়েছে চালচলনে। এখন আমি বোরকা পরি, করি পর্দা। এই তো বেশ ভালো আছি। ইসলামের প্রকৃত স্বাদ পাচ্ছি এখন। মিডিয়ায় আর ফিরবো না।'

অনেকে তো আছেন যারা নামাজ-রোজা করেও মিডিয়াপাড়ায় কাজ করছেন। আপনি কি সেটাও করবেন না?

'নারে ভাই, সেটাও আর হয়ে উঠবে না। কারণ পর্দা করে তো আর সিনেমা করা যাবে না। ক্যারিয়ার নিয়ে এখন আর চিন্তিত নই। বাকি জীবন এভাবেই কাটিয়ে দিতে চাই।'

হ্যাপীকে আমরা সংসারজীবনে কবে দেখবো, এমন প্রশ্নের উত্তরে কিছুটা সময় নিয়ে তিনি বলেন, 'এ বিষয়ে কোনো কথা বলতে চাচ্ছি না। বিয়ে নিয়ে কোনো ভাবনা নেই। এখন একটাই লক্ষ্য– ইসলামের রীতিনীতিগুলো আয়ত্ত করা।']

প্রিয় জেবুন্নেসা–

তুমি শুনে খুশি হবে, হ্যাপীর এই পরিবর্তনের যুদ্ধে তিনি একা নন। যদিও নিজেকে এভাবে বদলে নেবার কারণে সারাদিনই নানাজনের নানা গঞ্জনা সহ্য করতে হয় তাকে, অনেকে তাকে হয়তো তামাশার পাত্রীও বানান। তবু তার পাশে দাঁড়িয়েছেন অনেক মানুষ। তারা তার একান্ত আপনজন যেমন তেমনি অনলাইনের অনেক অ্যাক্টিভিস্টও তার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে সাহস জুগিয়েছেন। এখানে তেমনই দুজন ব্যক্তির ফেসবুক স্ট্যাটাসের কিছু অংশ পত্রস্থ করছি।

'বৃষ্টিলোকের চন্দ্রকথা' নামের একজন ফেসবুক ব্যবহারকারী হ্যাপীকে সমর্থন দিয়ে লিখেছেন–

কমন রুমে দাদুরা কয়েক ধরনের পেপার রাখে। সবসময় পড়া হয় না। বান্ধবী একটা বিশেষ খবরে আমার নজর দিতে বললে দেখলাম নাজনীন আক্তার হ্যাপীর সংবাদ– হ্যাপী তাবলিগ জামাতে! লেখার শেষে আবার একটা আশ্চর্যবোধক চিহ্নও দিয়ে দিয়েছে! আর যে মেয়েটার আসল আইডিতে কোনো ছবি রাখেনি, মেয়েটির প্রো-পিকে একটা কুরআনের ছবি দেওয়া সেই মেয়ের খবর বেচে পেট চালানোর জন্য সংবাদের উপরে ছবি দিয়েছে নায়িকা মার্কা ছবিগুলার একটা।

তার কতো খবর লিড নিউজ বানিয়েই তো পেট বেচলেন! মেয়েটার আন্তরিকভাবে ধর্মে ফিরে আসার খবরটা তো কেউ লিড নিউজ বানালেন না! (এইখানে আমি একটা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দেই?)

জামাত, তাবলিগ, তালিম এসব শব্দ শুনলে কিছু মানুষের এতো খুশ-খুশ লাগে কেন? কই কোয়ান্টাম, মেডিটেশন, সেমিনার, মিটিং এসব শব্দের পরে তো আশ্চর্যবোধক দেন না!

...আল্লাহ আমাকে সঠিক বুঝ দিন আর সবসময় দীনি পরিবেশেই রাখুন, সেই দোয়াই করি। আর এই বোনের জন্যও দোয়া করি, সে যেনো এই ইসলামের পথেই সহিহভাবে পথের দিশা পান আর তার সাথেই মৃত্যুবরণ করে যেতে পারেন।

'জুয়েল আইচ' নামের একজন ফেসবুক ব্যবহারকারীও হ্যাপীকে সমর্থন দিয়ে লিখেছেন–

কেউ কোনো ভালো কিছু করার চেষ্টা করলে আমরা তাকে অনুপ্রাণিত না করে থামিয়ে দিতেই যেনো বেশি পছন্দ করি! গত কিছুদিন থেকে কয়েকটি দৈনিক পত্রিকার অনলাইন সংস্করণে চোখ রাখলেই বিষয়টি খুব পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়।

যেমন প্রথমেই আসি একটি মেয়ের কথায়। আর কেউ নয়, সবার পরিচিত মুখ হ্যাপী। নাজনীন আক্তার হ্যাপী। কয়দিন আগেও যাকে শুটিং স্পটে ব্যস্ততা নিয়েই কোনো না কোনো বিজ্ঞাপন/ছবি/মিউজিক ভিডিওর শুটিং করতে দেখা গেছে। ছোটখাটো কিংবা আপত্তিকর পোশাকে ক্যামেরার সামনে পোজ দিতে দেখা গেছে এই মেয়েটিকে।

আবার নিজের ফেসবুক টাইমলাইনেও নিজের ছবি দিয়ে মাতিয়ে রাখতো হ্যাপী নামের যে মেয়েটি, সেই হ্যাপীর ফেসবুকে আজ কোনো ছবি নেই। নতুন কোনো শুটিং-এ দেখা যায় না তাকে।

হ্যাঁ, কুরআনকে আঁকড়ে ধরে, আল্লাহর প্রেমে, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার কাজে মগ্ন এখন হ্যাপী। নামাজ, কুরআন পাঠ, ধর্মীয় কাজেই এখন নিজেকে বেশি ব্যস্ত রাখে সে।

একটি মেয়ে যখন নিজের জীবনকে পাল্টে ফেলে নিজেকে ইসলামের রঙে রাঙানোয় ব্যস্ত, তখন মিডিয়া ব্যস্ত তাকে উস্কে দিয়ে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। প্রতিদিন কিছু পত্রিকার নিউজ দেখলেই তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

প্রিয় সুরমা–

এর কদিন পরই হ্যাপী লেখেন–

[গতকাল তাবলিগে গিয়ে এই কুরআন শরিফ উপহার পেলাম। খুবই সুন্দর। দেখলেই মনে শান্তি লাগে। এই পবিত্র কুরআন এখন দুর্লভ। কয়েক বছর আগে মক্কা-মদিনায় বাংলাদেশি হজযাত্রীদের সুবিধার্থে বাংলা ভাষায় অর্থ ও অনুবাদ করে ছাপানো হতো, এখন হয় না। এই উপহার আমার কাছে সবচেয়ে দামি। সবাই বেশি বেশি কুরআন পাঠ করুন এবং কুরআন যে পথে চলতে বলেছে ওই পথেই চলুন। মানবতার সব সমাধান একমাত্র পবিত্র কুরআনে।]

৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬, রাত ৯:৪৮

প্রিয় রিয়া–

২০১৬ সালের জানুয়ারিতে হ্যাপী লেখেন–

[এটাই আমি!

আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই– আমি কি আগের সেই মেয়েটি? কোনোদিন কল্পনাও করতে পারিনি যে, আজকের আমি কোনোদিন হতে পারবো।

আগে ভাবতাম, জীবন তো একটাই, সো যা খুশি তাই করা উচিত। নতুন নতুন ডিজাইনের অল্প কাপড় দিয়ে তৈরি পোশাক কিনে আলমিরাতে সাজাতে হবে, আর নতুন কোনো মডেলের মোবাইল এলো সেটা তো কিনতেই হবে, পার্লারে মাসে অন্তত চারবার না গেলে হবেই না, বান্ধবীদের সাথে ঘন ঘন দামি দামি রেস্টুরেন্টে আড্ডা দেওয়া, কেউ নোংরা কথা বললে অন্তত একটা গালি দেওয়া, অনেক জোরে জোরে গান শোনা– এগুলোকেই মনে হতো জীবনের সব (আমি না শুধু, সব আধুনিক মেয়েই এরকমভাবে জীবনকে ভাবে বা এর চেয়ে আরও উন্নতভাবে)।

কিন্তু এখন মনে হয়, জীবন একটাই এবং জীবনের এই সময়টা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদতের সময়। এখন আমার পছন্দের পোশাক শুধুই বোরকা আর সালোয়ার কামিজ (হিজাবও) এবং কামিজের হাতাটা ফুলহাতা হতে হবে। আমার শখের আইফোন সিক্স+ চার্জ

দেওয়ার অবহেলায় অনেকদিন ধরেই নিস্তেজ হয়ে আছে অথচ চালু করার প্রয়োজন বোধ হচ্ছে না। আর পার্লার? আল্লাহ নিজহাতে যে রূপ দিয়েছেন, এতে কেন খুশি হতে পারবো না? আল্লাহ আমাকে মাশাল্লাহ অনেক সৌন্দর্য দিয়ে বানিয়েছেন। তাহলে এতো ঘষামাজার কী দরকার আছে? বরং ভেতরের সৌন্দর্য বাড়াতে হবে ইসলামের আলোতে। আর আড্ডা দেওয়া? আড্ডার ছলে থাকলে যদি আমার নামাজ কাজা হয়ে যায়, আমার এত বড় ক্ষতির ভার তো আমাকেই নিতে হবে এবং এর সাজাও আমাকে পেতে হবে। এখন আমাকে কেউ মেরে ফেললেও আমার মুখ থেকে গালি কেন, কোনো বাজে কথাও বের করতে পারবে না।

এখন গানও শুনি না, আজানই শুধু মধুর লাগে এবং আজান শুনে যতোক্ষণ নামাজে না দাঁড়াবো ততোক্ষণ খুব অস্থির লাগে। কোনো দুঃখই আমাকে ছুঁতে পারে না, সবকিছুতেই আমি আল্লাহ তাআলার রহমত অনুভব করি।

জ্বি, এটাই এখনকার আমি! এবং আগের জীবনটা আমার কাছে খুব অচেনা লাগে। মনে হয় ওই জাহান্নামি জীবন কখনোই আমার ছিলো না।

গল্পের মত মনে হলেও এটাই বাস্তব। এটাই আমি।

একটু ভাবুন তো, ইসলামের পথে না চলে কী ফায়দা আছে? কিচ্ছু নেই, জাহান্নামের আগুন ছাড়া। আল্লাহর পথেই শান্তি ও সমাধান। আমাদের এই দুনিয়াতে যা করবো তার সব যেনো আল্লাহকে খুশি করার আশায় হয়। আমিন!]

জানুয়ারি ২০১৬

প্রিয় মুস্তাহসিনা–

[পাদটীকা : সর্বশেষ যা জানা যায়, তা তোমাকে বলছি। নিজেকে আমূল বদলে নেয়ার লক্ষ্যে নাজনীন আক্তার হ্যাপী ২০১৬ সালের জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকার কোনো একটি মহিলা মাদরাসায় ভর্তি হন। মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার পর তিনি তার ফেসবুক অ্যাক্টিভিটি কমিয়ে দেন। সপ্তাহে একটি বা দুটি পোস্ট দিতেন। তার মাদরাসার দিন-কাল কেমন যাচ্ছে, কীভাবে পরিবারের শত বাধা সত্ত্বেও তিনি

নিজের সাহসে বলীয়ান হয়ে মাদরাসায় নিয়মিত কুরআন শিখে যাচ্ছেন, মাদরাসার অম্ল-মধুর অভিজ্ঞতা অল্প হলেও শেয়ার করতেন।

২০১৬ সালের জুলাই-আগস্ট মাসের দিকে হ্যাপী ফেসবুকে জানান– তার ধর্মপালনে প্রতিবন্ধকতা হওয়ার আশঙ্কা থাকায় তিনি তার ফেসবুক আইডিটিও বন্ধ করে দিতে পারেন। এ পোস্টের কয়েক দিন পরই হ্যাপীর আইডিটি ডিঅ্যাক্টিভ (বন্ধ) হয়ে যায়। তাকে অনলাইনে বা বাস্তব পৃথিবীতেও আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

হ্যাপী ঢাকারই কোনো একটি মহিলা মাদরাসায় পড়ছেন হয়তো। তবে সেটা কোন মাদরাসা– হ্যাপী তা কখনো বলেননি। তিনি নিজেকে পরিপূর্ণ বদলে নেয়ার বাসনায় পরিচিত পৃথিবী থেকে অতীতের হ্যাপীকে আড়াল করে ফেলেন। পৃথিবীতে তিনি বাঁচতে চান এমন এক সাধারণ মুসলিম নারী হয়ে, যাতে কেউ জানতেই না পারে– হ্যাপী নামের কোনো মেয়ে ছিলো কোনোদিন। সবার অন্তরালে অনুশোচনায় দগ্ধ এক নারী তৈরি হচ্ছে আল্লাহর রাহে বিলীন হওয়ার চেতনা নিয়ে।

২০১৬ সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে নাজনীন আক্তার হ্যাপী কোনো এক তাবলিগওয়ালা যুবকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন বলে তিনি সংক্ষিপ্ত এক ফেসবুক স্ট্যাটাসের মাধ্যমে জানান। এরপর তার ব্যাপারে আলো ঝলমলে পৃথিবী আর কোনো খবর দিতে পারেনি।

হয়তো তিনি সুখেই আছেন, দীনের পথে সগৌরবে নিজের ভালোবাসা বিলিয়ে যাচ্ছেন।

আল্লাহ তাকে এবং আমাদেরকেও কবুল করুন! আমিন!
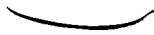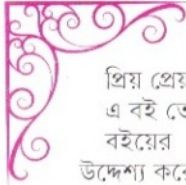
প্রিয় প্রেয়সী–

এ বই তোমার জন্য।

বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তোমাকে উদ্দেশ্য করে লেখা। তোমার জীবনযাপন, তোমার প্রেম, তোমার যৌবন, তোমার বেদনা, তোমার মুক্তি, তোমার সৌন্দর্য, তোমার সংসার, তোমার পরিবার, তোমার সমাজ, তোমার পৃথিবীর অজস্র ভালোবাসার সম্বোধন নিয়ে লেখা এ বই।

আধুনিকতা আর আলো ঝলমলে পৃথিবী যখন তোমাকে ক্রমশই তলিয়ে দেবে অন্ধকারের নগ্ন অতলে, তখন এ বই তোমাকে ডাক দেবে এক আলোকিত আঁধারের সামিয়ানা তলে।

চলে এসো।

এ বই তোমার হৃদয়ে জমে ওঠা বেদনা নিমিষেই শূন্যে মিলিয়ে দিতে ধারণ করে আছে এক আশ্চর্য পরশ পাথর।

তোমাকে অভিবাদন প্রিয় প্রেয়সী নারী!
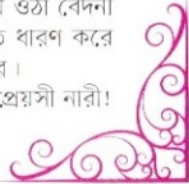
e-store:
rokomari.com/noboprokash

নবপ্রকাশ

PRIYO PREYOSHI NARI
by Salahuddin Jahangir
Price : 220.00 Tk

noboprokash.com | noboprokash@gmail.com | fb/noboprokash | 01974 888441